বিভীষণ

ডঃ দীপক চন্দ্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট

অঙ্কণ - অনুপ রায়

মুদ্রণ - চয়ণিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও যোগাযোগ অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস, [illegible] নং কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা- ৫০ হইতে লেসার কম্পোজ করিয়া পি.এম. বাগচী প্রেস ১৯ নং গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা- ৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত।

কল্যানীয়াসু

মিষ্টি, কুহু ও কেকা

জ্যেঠু

সূর্যাস্ত হচ্ছে।

একটু আগে রাবণের মৃত্যু হয়েছে। তার নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কাযুদ্ধের উপর যবনিকা পড়ল।

আকাশ তো নয় রক্তের সমুদ্র যেন। একসারি সাদা বক লাল মেঘের আভা গায়ে মেখে কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে লঙ্কার দিকে।

চরাচর জুড়ে অন্ধকার নামছে নিবিড় হয়ে। বিধুর সান্ধ্য পরিবেশে খোলা প্রান্তরের মাঝখানে দাউ দাউ করে নিহত রাবণের চিতা জ্বলছে। বিভীষণ চেয়ে আছে নিবিষ্ট হয়ে। চিতার আগুনে রাবণ পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। রাবণ মুছে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। মন্দোদরী আর লঙ্কার সিংহাসন এখন বাস্তব সত্য।

মন্দোদরীও এসেছে স্বামীর মুখাগ্নি করতে। সে ছাড়া তো রাবণের আর কেউ বেঁচে নেই। তাকে ঘিরে বসে আছে শূর্পণখা এবং সরমা। মন্দোদরীর শুষ্ক দুটি চোখ রাবণের চিতার উপর জ্বলজ্বল করছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাবণের নিজের বলে কিছু থাকল না আর। এমন কি সে নিজেও রাবণের মহিষী বলে আর পরিচয় দিতে পারবে না। রাবণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরেই লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসনে বিভীষণের অভিষেক হবে। সেই সময় বিভীষণের মহিষী সেজে তাকেও বসতে হবে তার পাশে। নতুন রাজার সঙ্গে নতুন মহিষী বরণ হলো রাক্ষস বংশের পুরনো প্রথা। পুরনো রাজমহিষী হবে নতুন রাজার রাজমহিষী। অনিচ্ছা কিংবা আপত্তি প্রকাশের কোন স্থান নেই সেখানে।

কথাগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল মন্দোদরীর ভেতরটা। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বুকভাঙা একটা আর্ত কান্নার স্বর তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল উ-উ-উ। গুমরে গুমরে ওঠা কান্নাটা চাপতে গিয়ে মুখ বিকৃত করল মন্দোদরী। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হলোঃ স্বামী!

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো মন্দোদরী বিড় বিড় করে আপন মনে বললঃ বড় কষ্ট গো! বাস্তব কী নিষ্ঠুর! মৃত্যু কী জীবনের পরিসমাপ্তি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব হারিয়ে যায় কি? আমি তো হারিয়ে গেলাম আমার জীবন থেকে। তোমার কুসুমগন্ধী স্মৃতিটুকুও থাকল না আর। হায় অদৃষ্ট! আবার নতুন অঙ্গীকার, নতুন অভিযোজন, সমীকরণ জীবনের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে চিরচেনা মন্দোদরী অচেনা হয়ে যাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক অন্য মন্দোদরী হয়ে যাব আমি। স্বামী, যতক্ষণ চিতার আগুনটুকু না নিভছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার। তারপরেই আমার অবস্থায় হবে বাজ পড়া ঝলসানো গাছের মতো হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার মতো। শিকড় যার নেই, তার কিছুই নেই। সত্যিই একজন হেরে যাওয়া মানুষ, মানুষই নয়। তাকে কেউ মনে রাখে না। রাক্ষসজাতির জন্য তুমি যে এত করলে সেজন্য কারো বুকে একটুও গর্ববোধ থাকবে

না। জাতিকে দিয়ে-থুয়ে একেবারে ফতুর হয়ে চলে গেলে। সাধের লঙ্কায় তোমার নিজের বলে কিছু থাকল না। একটি সন্তানও নয়।

বুকখানা মন্দোদরীর হু-হু করে উঠল। কী যেন গলে গলে পড়তে লাগল। বুকের মধ্যে কী যেন নয়, পুরো বুকখানা তার অশ্রুতে ভাসতে লাগল।

নিজের শোকে বিভোর হয়ে ছিল মন্দোদরী। তাই জানতে পারল না বিভীষণ কখন তার কাছে এসে দাঁড়াল। নরম চোখে মেলে বিভীষণ মন্দোদরীর দিকে চেয়ে ছিল ; যেমন করে ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে স্থলপদ্ম। মন্দোদরীর বয়স হয়েছে চুলে পাক ধরেছে, তবু দেহের বাঁধন একটুও শিথিল হয়নি। বরং বয়সেরও একটা আলাদা রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে যা যৌবনেরও চেয়েও মনোহর এবং শ্রীময়। কেমন একটা অদ্ভুত ভালোলাগার আবেশে তার চাহনিতে অনুরাগ এবং করুণা ফুটে উঠল। মোহাবিষ্টের মতো বিভীষণ চেয়ে রইল মন্দোদরীর দিকে। ইচ্ছে করে না মন্দোদরীর মুখের উপর থেকে অন্য দিকে চোখ ফেরাতে। গভীর বিষাদের প্রতিমার মতো মন্দোদরী পুত্তলীবৎ বসে আছে তার খুব কাছে। উদাস চোখ দুটো নিভন্ত চিতার দিকে নিবদ্ধ রেখে নিজের স্বপ্নের ভেতর মগ্ন হয়ে ছিল বিভীষণ। অনেকক্ষণ কোনো কথা হয়নি তাদের। মন্দোদরীর নিরাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্যের দিকে চোখ দুটো স্থির রেখে বলল দেবী, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত। এবার রাজপ্রাসাদে ফিরতে হবে আমাদের।

দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল মন্দোদরী। হু হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। নিজের মনের ভেতর ডুবে গিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলে বিভীষণের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে বললঃ মৃত্যুর পরে পরবর্তী জীবনের রহস্য কেমন দেখতে তুমি জান ? মানুষ মরে গিয়ে নিজে মুক্তি পায়, না অন্যকে মুক্ত করে দিয়ে যায় ?

বিভীষণ কেমন উদভ্রান্ত আর শূন্য দৃষ্টিতে মন্দোদরীর দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর স্খলিত ভেজা গলায় বললঃ কোন মানুষের আত্মাই ইহলোকের নয়, যার যখন কাজ শেষ হবে তার আত্মা বিলীন হয়ে যাবে অনন্তলোকে। তারপর বেঁচে থাকার জন্য যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা তার নিজেকে। এই কারণেই অল্পদিনের ভেতর মানুষ সব ভুলে যায়। কারণ জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে সে আছে বলেই অন্য সব সম্পর্ক আছে। সেই সব সম্পর্কের ভেতর সে দিব্যি সুখে ও আনন্দে থাকে। মানুষের ভিতরের অনেকখানি মানুষই চিরদিন দুর্জ্ঞেয়। হয়তো সেই কারণেই সে মানুষ।

চুপ করে শুনল, মন্দোদরী। কথা বলার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না। তাল তাল কাদার মতো ঘৃণার ধিক্কার জমে উঠল মনে। আর অসহ্য একটা যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। সেই কান্নাভরা শোকার্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে শূর্পণখা

এবং সরমার চোখেও জল এল। মন্দোদরীকে ধরাধরি করে সবাই মিলে শিবিকায় তুলে দিল।

অন্ধকারের বুক চিরে শিবিকা বাহকেরা নিঃশব্দে যাচ্ছিল। আগে পিছে বিষণ্ন মানুষের মিছিল। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছিল। মশালের আলো পড়ে মানুষগুলোকে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল।

শিবিকার মধ্যে মন্দোদরী এখন একা। একেবারেই একা। একা হয়ে গেলে মানুষ নিজের মনের সঙ্গে অবিরাম কথা বলে। একাকীত্ব মানুষের ভালো লাগে না বলেই হয়তো মনই তার সঙ্গী হয়ে সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গ দেয়। অতীতে যা কিছু ঘটে তা তো শুধু স্মৃতি নয়, বাস্তব অনুভূতি। সেই অনুভূতি সম্বল করে একা আমির মুখোমুখে বসে আলাপ করে। দৃশ্য ঘটনা সংলাপ সবই তার চোখের আয়নায় বিম্বিত হয়।

বাইরে নিবিড় ঘন কালো অন্ধকার হলেও চোখের আলোয় রাবণকে তার কক্ষেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অন্ধকারের ভিতর থেকে সুসজ্জিত কক্ষের মনোরম ছবিটি ফুটে উঠেছিল। কোথাও কোন অস্পষ্টতা ছিল না। রাবণের মাথায় মুকুট ছিল না, গায়ে রাজকীয় পরিচ্ছদও ছিল না। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলগুলো অবিন্যস্ত। চোখে মুখে কেমন একটা বিপয়ভাব। কক্ষে ঢোকা মাত্র মন্দোদরী হাত ধরে তাকে পালঙ্কে এনে বসাল। চোখে কটাক্ষ, মুখে কৌতুক, অধরে স্মিত হাসি তার। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুখ টিপে থাকল। বললঃ তবু ভালো ; দাসীকে ভোলনি তা-হলে ?

রাবণ সঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে চটজলদি জবাব দিলঃ হাঁ তাই, ভুলতে পারি কৈ ? ঐ একজন রমণীই আমার চিত্তাকাশ জুড়ে বিরাজ করছেন। সে আমার মুখে কথা দিচ্ছে, আমার মনে ভালোবাসা দিচ্ছে, সে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় মনে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মন্দোদরী রাবণের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। লম্বা নাকের অগ্রভাগ ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে বললঃ মন ভোলানো, মন ভেজানো কথা বলে চিরকাল ভুলিয়ে রাখলে। একশত মহিষী যার তাকে তো কথার যাদুকর, মালাকার হতেই হবে। ভীষণ মিথ্যে জেনেও কথাগুলোকে সত্যি বলে আঁকড়ে থাকি। কারণ, একটা বিশ্বাস নিয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে। তোমার ঐ কথাগুলো আমার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটি লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করে, থামে না তার আবর্ত। ছোট থেকে ক্রমেই বড় হতে হতে যে মিলিয়ে যায় অনন্তে। চোখ বুজে যায় শান্তিতে।

রাবণ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বিশাল বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে হঠাৎ মন্দোদরীকে রাবণ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললঃ আকাশে কত নক্ষত্র কিন্তু ধ্রুবতারা একটাই। সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্বক্ষণ সে আকাশের সাথে। মধ্যরাতের তারা-ভরা আকাশের

মাঝখানে প্রাণের আনন্দে আকাশ যখন খুশি হয়ে ভরে উঠে তখনও তার সব আনন্দের মাঝখানে ধ্রুবতারা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে তার বুকের মধ্যিখানে।

সেই তো আমার প্রেমের গর্ব। আচ্ছা, এরপরেও কি তোমার মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে কথা বললাম তোমাকে? একি আমার মন ভোলানো, মন ভেজানোর যাদুকরী কথা? সত্যিকারে প্রেম ছাড়া এ উপলব্ধি হয় কারো? তারপর হাসি হাসি মুখ করে কানের কাছে মুখ এনে এবং চোখে চোখ রেখে বললঃ যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যে বাক্য নয়।

মন্দোদরী কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাবণের অনাবৃত লোমশ বুকের উপর মুখ ডুবিয়ে সে তার গায়ের ঘ্রাণ নিল। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে এল। সারা শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। দেহের সুগন্ধে, লোমের সুবাসে তার নিশ্বাস ভরে গেল। রাবণের একটা হাত তার কটি বেষ্টন করে আছে। অন্য একটি হাতে তার সুডৌল স্তনটি ধরা অবস্থায় আছে। ঐ স্পর্শে তার শরীর জুড়ে ঋতুর মহোৎসব চলেছে যেন। আর সে ধীরে ধীরে তার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে বলছে, 'ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।' কিন্তু মুখ ফুটে একবারও রাবণকে কথাগুলো বলতে পারল না। আবার এরকম একটা ভালো লাগার অভিজ্ঞতা চেপে রেখে তার সুস্থ থাকাও মুশকিল হলো। তার ভিতরটা এতই অধীর ও অশান্ত হলো যে একটু একটু করে রাবণের দেহের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। মুখে বলছিল 'ছাড়ো, কিন্তু ইচ্ছুক মুখখানি রাবণের আগ্রাসী ঠোঁটের উপর চেপে ধরে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগল।

মন খারাপ করা আর্তি লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। শোকের মধ্যে গভীর দুঃখের মধ্যে প্রেমের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে নিজেকে কষ্ট দিয়ে স্বর্গ থেকে কোন সুখ পেড়ে আনবে? তবু মানুষের মন তো! রাবণের প্রেমের তাপটুকু লেগে আছে তার সর্বাঙ্গে। স্বামীদের অনেক কিছুই স্ত্রীদের শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পরে কি সব শেষ হয়ে যায় তার? শরীর মন আত্মা যখন কিছুই থাকে না তখন রাবণ কি এই মুহূর্তে টের পাচ্ছে যে প্রিয়তম মহিষী তার শোকে মুহ্যমান, তাকে ভুলতে বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে! একাকীত্বের গভীরে খুব গভীরে জন্মান্তরের মতো বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত জীবনতন্ত্রীর আশ্চর্য সুরটা ছেঁড়া তারের মতো ঝঙ্কারে বাজছিল। তাতেই মনটা আরো আর্ত হলো। অথচ মনই সুখ দেয়। সুখ বাইরের কোন বস্তুতে বা অবস্থায় নেই। অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ থাকলে তবেই বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে। বিবেকের দহনে মন যদি ছিন্নভিন্ন হতে থাকে তা হলে বিভীষণের কণ্ঠলগ্ন হলেই কি সে সুখী হবে? আবার বিভীষণের দুঃখের কারণ হয়েও সে সুখী হতে পারবে না। কাউকে বঞ্চনা করে কিংবা দুঃখ দিয়েও সুখী হওয়া যায় না তাহলে এই মুহূর্তে তার কী করা কর্তব্য?

নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করেই বা তার সুখ কি? কিছু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। সেগুলো সমাধান হয় না বলেই মন শূন্যতায় ভরে থাকে। শিবিকায় যেতে যেতে এইসব প্রশ্ন করল নিজেকে। অবশেষে নাভি থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এক বুক হাহাকারের সঙ্গে নিরুচ্চারে বলল- 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ-পথে পথে...।

শিবিকা থামল একেবারে অন্দরমহলের দ্বারে। রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে বিভীষণ মাথা হেঁট করে ডাকলঃ নেমে এস।

শিবিকা থেকে পা দুটো মেঝের উপর আস্তে আস্তে রাখল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল মন্দোদরী। নম্র স্নিগ্ধ আলোয় বিভীষণকে দেখে বয়ঃসন্ধির মেয়ের মতো চমকে উঠল। বুকটা কেঁপে গেল দুরন্ত আবেগে। ক্রোধে, লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্তিতে গলা শুকিয়ে গেল। অপলক চোখে তাকে দেখল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য! বিভীষণ তার সমবয়সী এবং বন্ধু। তবু আজ প্রথম মনে হলো কত দূরের মানুষ সে। কত অচেনা। মন্দোদরীর চোখ নত হয়ে এল। দীন ভিখারিণীর মতো সংকুচিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল অন্দর মহলের দিকে।

মন্দোদরী আধো ঘুম ও আধো জাগরণের মধ্যে রাবণকে দেখতে লাগল। সে তার কথার পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছে। তার অভিযোগের প্রত্যুত্তরে রাবণ বললঃ মানুষ তো ত্রুটিহীন নয়। সকলের কিছু না কিছু দোষ থাকে। ঈশ্বরেরও দোষ থাকে।

মন্দোদরী বললঃ জীবনে তুমি সব পেয়েছ। এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি তুমি। সর্বত্র তোমার সফল অভিযান। ব্যর্থতা কাকে বলে তুমি জান না। দেশ-দেশান্তরে তোমার রাজনৈতিক আধিপত্য। তুমি দেশপ্রাণ, স্বজাতি বৎসল তোমার কাজে ও কর্মে সততা ও নিষ্ঠার খ্যাতি। তুমি একজন বড় মাপের মানুষ শুধু নয়, একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। আমারও ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু নারী হরণের মতো এক জঘন্য কাজ করে নিজের গৌরব ও মর্যাদাকে ধুলো-মাটির মধ্যে টেনে এনেছ। সীতা হরণ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক কলঙ্ক। এক ভুল রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তোমার অস্তিত্বটাই বিপন্ন করে তুলেছ।

রাবণের অধরে মলিন হাসি ফুটল। এক গভীর অপরাধবোধ থেকে বললঃ তোমার মনের গভীরে একটা দুঃখ আছে জানি। আমার নারী হরণের ঘটনায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু নারী হরণ তো নতুন কোন ঘটনা নয়। নরপতিরা পৌরুষ দেখাবার জন্য বীর্য বলে নারী হরণ করে। ভয়ানক আবর্তের মধ্যে বীর অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দিতে ভয় পায় না। যুদ্ধের তাণ্ডবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও তার ভয় নেই। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রায়সই বীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে সার্থক করতে চায় বীরধর্ম পালন করে। এজন্য অনুতাপ, অনুশোচনা করব কেন? বিশেষ করে সে যখন সত্যিকারের সীতা নয়। ছায়া সীতার পিছনে রাম না দৌড়লে

তো কোন সমস্যাই হতো না। রামচন্দ্রই মিথ্যে সীতা সাজিয়ে আমাকে প্রতারণা করে একটা রাজনীতি করেছে আমার সঙ্গে। রামচন্দ্রই একটা ন্যায্য ব্যাপারকে রাজনৈতিক মর্যাদায় লড়াই করে তুলেছে।

মন্দোদরী আধো ঘুমের মধ্যে বললঃ দোষ তোমারও হয়েছে। রামচন্দ্র তো অনেককাল ধরে তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। জেনেশুনে তার ফাঁদে তুমি পা দিলে কেন ?

আমি তো তেরো বছর ধরে মুখ বুজে রামের ষড়যন্ত্র মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। পাছে কোন সংঘর্ষ হয় তাই তার কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে গেছি। কিন্তু শূর্পনখার অপমান মুখ বুজে সহ্য করলে লোকে আমার নিন্দে করত, ভীরু এবং কাপুরুষ বলতো। আমার প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধা চলে যেত। আমি শুধু ঘটনাস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি নিজেকে। কিংবা ঘটনাস্রোতই আমাকে তার গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে গেছে ভান, ভণ্ডামি, লোকভয় সব ছিঁড়ে ফেলে প্রচণ্ডভাবে বাঁচবার জন্য।

কিন্তু একবার কিছু করে সাধারণ মানুষ পিছু হঠতে পারে, কিন্তু লঙ্কেশ্বর রাবণের পেছনে হাঁটা যায় না। তাই যতটুকু বাকি ছিল আমার এ জীবনে সেইটুকুই হাতে নিয়ে আলগা করে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলাম রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে— দেখিই না, কী হয় ? এই বলে। নিজের স্বার্থ নিজে দেখার মধ্যে লজ্জা, আমি অন্তত দেখি না। আত্মসমর্পণ করে হা-হুতাশ করার চেয়ে সময় থাকতে নোঙর ছেঁড়াকে ভালো বলে মনে করেছি আমি।

পৃথিবীতে তোমার মতো অনেক যোগ্য মানুষ ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে ডানা ভাঙা পাখির মতো মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরায়।

সেই মুহূর্তে এক দারুণ দীপ্তিতে রাবণের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। হেসে বললঃ ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। তবে রামের সঙ্গে বিবাদের পথে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার বাধা যেটুকু ছিল তা শূর্পনখা এসে দূর করে দিল।

ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে মন্দোদরী বলল যেন ; ঐ বিশ্বাসঘাতিনীর নাম তুমি মুখে উচ্চারণ কর না। তোমার সর্বনাশের জন্য, লঙ্কার ধ্বংসের জন্য, আমার প্রিয়পুত্রদের বিয়োগের জন্য, সর্বোপরি আমার দুর্ভাগ্যের জন্য ঐ কালনাগিনী দায়ী। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলতে দেখল গাছের মাথায় ভোরের সূর্য জ্বলজ্বল করছে। পাখিরা ডাকছে। শিশির ভেজা ঘাসেতে চুপিসারে পা পা করে হাঁটছে জোড়া-শালিক।

* মৎ-লিখিত 'রামের অজ্ঞাতবাস' কৌতূহলী পাঠকদের অবশ্য পড়তে হবে।

॥ দুই ॥

সূর্যোদয়ের এক প্রহর পরে মন্দোদরীর কক্ষে প্রবেশ করল সরমা। কিংশুক রেশমী কাপড়ের উপর নানারকম রত্নের কারুকার্য-করা, নানারকম রঙের সুতো বুনে আঁকা হয়েছে লঙ্কা-যুদ্ধের নানা চিত্র। প্রশান্ত পরিপূর্ণতায় চিত্রময়ী হয়ে মন্দোদরীর সামনে এসে দাঁড়াল। রাবণ মহিষী মন্দোদরীর হাত ধরে চোখে কটাক্ষ হেনে, সপত্নীগত বিদ্বেষে অধর যুগল কৌতুকে বর্তুল করে বললঃ চল, অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে অভিষেক শুরু হবে। এখনও তৈরি হওনি! সাজ-গোছ করতে তো সময় লাগবে। আমার তো সম্রাজ্ঞী হওয়া হলো না। তুমি থাকতে হতেও পারব না। সবই ভাগ্য। সম্রাজ্ঞী হওয়ার ভাগ্য তোমার। লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সরমার।

জলভরা দু'চোখে মন্দোদরী তার দু'খানা হাত ধরে বললঃ সরমা, তুমি যাকে ভাগ্য বলছ সে আমার দুর্ভাগ্য, আমার জীবনের অভিশাপ। প্রথার নামে এ এক নির্দয় কঠিন শাস্তি। এই শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পার বোন? আমি তো মরতে চেয়েছিলাম। তোমার স্বামী আমাকে সহমরণে যেতে দিল না। রাজবংশের প্রথা নিয়মের বজ্র আটুনির ফাঁসে আমাকে শক্ত করে বাঁধলে তার বহুকালের লোভ, লালসা চরিতার্থ করার জন্য। আমার মতো এক সামান্য নারীর জন্য লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল। এই নিদারুণ আত্মগ্লানি নিয়ে সম্রাজ্ঞী সেজে সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার বিড়ম্বনা থেকে আমাকে অব্যহতি দিতে পার বোন? মন্দোদরী চোখ বুজল। দুকোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটি কেঁপে বাঁকা হয়ে গেল।

সরমা কোন কথা বলতে পারল না। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল মন্দোদরীকে। শান্ত করুণ একখানি মুখ—কোন দাবি নেই, চাহিদা নেই, শুধু একটু অনুগ্রহ পেলেই বর্তে যায় যেন। কোনো কিছুই জোর দিয়ে বলল না; অথচ ভেতরে ভেতরে নিজের জায়গায় সে শক্ত এবং সহজ হয়ে থাকল। সরমার বুকের ভেতরটা মন্দোদরীর জন্য কী এক মধুর ব্যথায় ভরে উঠল। আস্তে আস্তে বললঃ মুক্তি চাইলেই কী মুক্তি মেলে? তুমি তো বল কার যে কীসে মুক্তি সে নিজেও ভালো করে জানে না। যাকে বন্ধন বলে মনে হচ্ছে— তার মধ্যে হয়তো সবচেয়ে বড় মুক্তি লুকিয়ে আছে। আজ যে জীবন ফুরিয়ে এলো মনে হচ্ছে, কাল তা আবার শুরু করার ইচ্ছেও তো জাগতে পারে।

এমন সময় একজন সৈরিন্ধ্রী পোশাক পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনী সামগ্রী নিয়ে পরিচারিকা সহ মন্দোদরীর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা হেঁট করে প্রণাম করে বললঃ নতুন মহারাজ, তাঁর প্রিয় রঙের বসন এবং বিবিধ অলঙ্কার ও প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে আপনাকে অভিষেক অনুষ্ঠানে যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

* মৎ-লিখিত 'উপেক্ষিতা শূর্পনখা' কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পাঠক-পাঠিকদের অবশ্যই পড়তে হবে।

মন্দোদরীর অধরে অবজ্ঞার হাসি বঙ্কিম হলো। বলল: তোমাদের মহারাজের সব দিকে নজর। কোন অনুষ্ঠানে কী পোশাক পরলে কাকে মানায় এবং অর্থপূর্ণ হয় তা অঙ্কের মতোই হিসেব করে আগে ভাগে বস্ত্রশিল্পীকে দিয়ে তৈরি করে রাখেন।

কথাগুলোর ভেতর কোথায় একটা লুকোন ব্যথা ছিল। ব্যঙ্গটা সরমার বুকে তীরের মতো বিঁধল। বিভীষণের জন্য বুকটা কেমন একটু করল। স্বামীর নামে এই হীন অভিযোগ কেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। খোলা জানলা দিয়ে মাথার চুলে এলোমেলো হাওয়া এসে লাগল। চোখ জ্বালা করে। জল আসে। তবু তার ভেতরটা তেতে উঠল না। কিংবা রোষে ক্রোধে ফেটে পড়ল না। মিন্ মিন্ করে সরমা বলল: আগুন রঙ ওর প্রিয় রঙ। আগুনকে দিয়ে কখন কারো মুখোশ হয় না।

মন্দোদরীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ ব্যথিত চোখের দুর্বল পাতা অতি কষ্টে তুলে সরমাকে বলল: আগুন আর আগুন রঙ কখনও এক হয়। আগুন রঙ দিয়ে মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলে বলেই আমি আগুন রঙ পছন্দ করি না। আমার ভালো লাগে সাদা আর গৈরিক— মনটা আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে উঠে। আমার মধ্যে যে সৎ ও মহৎ মানুষ আছে তাকে অনুভব করি।

সরমা একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্দোদরীর দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লজ্জায় চোখ নত করল। মাথা হেঁট করে বলল: আজকের দিনে প্রশ্ন করতে নেই। কাপড়টা পরলে তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগবে।

বেশ একটু বিষণ্ণ চিত্তে মন্দোদরী বলল: সরমা সুন্দর কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। তবে, ভয়ঙ্কর একটা কুৎসিত ব্যাপার আছে।

মন্দোদরীকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। প্রায় রূদ্ধস্বরে বলল: এই বস্ত্রটি পাঠিয়ে বিভীষণ প্রমাণ করতে চেয়েছে যে ক্ষমতাবান লোকেরা যা খুশি করতে পারে। তারা ডুগডুগি বাজালেও আমাদের নাচতে হবে। আমাদের কোন ইচ্ছে নেই। পছন্দ নেই। স্বামীর ঘরে স্ত্রীরা পুতুলের ঘর-সংসার করে। তোতাপাখির মতো শেখা বোল বলে।

সরমা রেগে যেতে গিয়েও পারল না। মন্দোদরীর কথাগুলোর ভেতর সত্যটুকু তাকে স্পর্শ করে রইল। কারণ ভিতরে ভিতরে তারও কিছু ক্ষোভ দুঃখ, বেদনা যন্ত্রণার ভূমিকম্প হচ্ছিল। তথাপি, স্বামী-নিন্দায় সরমা রাগে ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল: একটা দেশের প্রথা, লোকাচার, সংস্কার, অভ্যাসের মধ্যেই একটা জাতির জাতীয় সত্তা। কার কী পছন্দ অপছন্দ তাতে কিছু যায় আসে না।

মন্দোদরী চোখের জল মুছে থমথমে মুখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সৈরিন্ধ্রী বিস্রস্ত চুলের জট ছাড়াচ্ছিল চিরুণী চালিয়ে। মন্দোদরী মুখ বিকৃত করে ঘাড়টা শক্ত করে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। লম্বা বিনুনিটা সাপের মতো পিঠে পড়ে রইল।

পরনের কাপড় বদলাবার জন্য আগুন-রঙা কারুকার্যকরা রেশমবস্ত্রটি মন্দোদরীর চোখের সামনে মেলে ধরল। মন্দোদরীর মনে হলো কাপড় তো নয় আগুন যেন। খুব অল্প পরিশ্রমে চিত্রকর লঙ্কার যুদ্ধের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গোটা লঙ্কায় যেন আগুন লেগেছে। একজন রমণী, মেঘের মতো তার চুল, তারার মতো চোখ, লতার মতো বাহু, গিরিচূড়ার মতো স্তন। তার রূপের কোন রঙ নেই, রেখা নেই। তবু আগুনের মতো তার রঙ, ত্বক ও তনুতে আগুন রঙ লেগে আছে। একজন পুরুষ তার হাত ধরে আছে। দু'একটি রেখায় আগুনের লেলিহান শিখা তাকে ঘিরে আছে। আর নির্ভয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে স্ত্রীলোককে সে আগলাচ্ছে। বস্ত্রের অন্য একপ্রান্তে হনুমান কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ লঙ্কা নগরীর দৃশ্য। আঁচলে একজন মানুষ রমণীর আঁচল ধরে আছে। শাড়ীর পাড়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে তাড়কার যুদ্ধ, বালী বধের দৃশ্য, সুগ্রীবের অভিষেক, বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্য। মন্দোদরী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। কষ্টে চোখ বুজল। অপমানে তার বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। মুখখানা গমগম করছিল। বললঃ সরমা, এ কাপড় পরলে মনে হবে সারা গায় আগুন, তার মধ্যে আমিও পুড়ছি। সর্বাঙ্গে আমার আগুনের জ্বালা।

বুকের মধ্যে মন্দোদরীর অভিমানের তুফান উঠতে চাইছিল। তবু জোর করে সেটা চাপা দিল। মুখে থমথমিয়ে উঠল কান্না। বললঃ এই চিত্রিত বস্ত্র তো একদিনে তৈরি হয়নি। অনেককাল ধরে হয়েছে এইদিনে উপঢৌকন দেবার জন্য। আমাকে অপমান করার জন্য। আমার অপমানে কারো কিছু যায় আসে না জানি, তবু যে অপমান হলো সারাজীবনে তা ভুলবার নয়।

সরমার দু'চোখে হাসি ঝিলিক দিল। মন্দোদরীর গা ছুঁয়ে বললঃ আজ রাগ করতে নেই। মন খারাপেরও কিছু নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে। তৈরি হয়ে নাও। আমার উপর তোমার অনেক রাগ অভিমান জমা হয়ে আছে। কিন্তু আমি রাগ করলে যে ভূমিকম্প হয়ে যাবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিষ সন্দেহের দৃষ্টিতে মন্দোদরী দেখতে লাগল সরমাকে। চমৎকার একটা খোঁপা করে তাতে চিরুনি পরিয়ে দিল সরমা। আঙুলের চাপে খোঁপাটাকে ঠিক করে দিতে দিতে সরমা ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললঃ তোমাদের মধ্যে আমি নেই। মিছিমিছি নিমিত্তের ভাগী হব কেন? আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি ও তোমাকে ভালোবাসে। তোমরা দুজনা ভালোবাস দু'জনকে। তুমি একটু চাইলেই ও রামচন্দ্রের সঙ্গে আঁতাত করতে পারত না। শুধু তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার জন্য রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। হয়তো মনে মনে তুমিও চেয়েছিলে। মনের সব চাওয়া তো বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। মনের মনই জানে না কি চায় সে?

মন্দোদরী মাথা নিচু করে রইল। সরমার অভিযোগের জবাব দেবার মতো রুচি ছিল না। তবু অসহায়ভাবে সরমার বুকে মুখ লুকোল। হয়তো লজ্জা ঢাকার জন্য

জায়গা সে আর খুঁজে পেল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিল। কয়েকটা মুহূর্ত সে একা-আমির মুখোমুখি হয়ে সরমার কটাক্ষ এবং সন্দেহের একটা জবাব খুঁজল। এখন বয়স হয়েছে। ছেলে-মেয়েরাও সব বড় হয়ে গেছে উভয়ের। যৌবনের সে টান আর নেই। দেহে মনে এখন ভাঁটা লেগেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বুড়িয়ে গেছে। সরমার সন্দেহ তার ভাগ্যেরই এক অদ্ভুত রসিকতা। তবু দারুণ দুঃখের মধ্যে সরমার মুখে সে কথা শুনতে ভালো লেগেছিল মন্দোদরীর। একজন তার জন্য সারা জীবন প্রতীক্ষা করেছে আর সে তা জেনে ও বুঝেও শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। একথাগুলো যখন একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে, তখন তা কানে শুনলেও জীবনটা মিষ্টি হয়ে ওঠে। মনে মনে সরমাকে সে ধন্যবাদ দিয়ে বলল: তোমার রসিকতা যত নির্দয় এবং নির্মম হোক অন্তত এক মুহূর্তের জন্য হলেও তুমি তার মিষ্টতাটুকু আস্বাদন করতে দিয়েছ।

দুঃখের হাসি হেসে মন্দোদরী বলল: তোমার ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করতে পারলে এই বুড়ো বয়সে আমিই সবচাইতে খুশি হব। কথাগুলো বলার সময় মন্দোদরীর কণ্ঠস্বর অপমানে, লজ্জায় দুঃখে এবং অভিমানে কাঁপছিল।

সরমা কী ভাবল কে জানে? খোলা উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল: ঝগড়া করতে আসিনি। তোমাকে সাজিয়ে দেব বলে এসেছিলাম। কিন্তু খোলা মনে পারলাম কৈ? দোষ আমার। গোঁসা করে থেকো না। অভিষেকের সময় হয়েছে। রাজপুরোহিত এসেছেন তোমাকে নিতে। তোমার জন্য সব আটকে আছে। চল, পৌঁছে দিই তোমাকে। এটুকু পারব।

অভিমানে চোখ ফেটে জল এলো মন্দোদরীর।

॥ তিন ॥

খুব সংক্ষেপে বিভীষণের অভিষেক হয়ে গেল। লঙ্কার শূন্য সিংহাসনে বিভীষণকে বসিয়ে দিল রামচন্দ্র। মহারানীর আসনে মন্দোদরীকে বসাল সরমা। চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী বেজে উঠল। পুরোহিতের হাত থেকে রাজতিলক গ্রহণ করার পরে রামচন্দ্র বিভীষণের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিল। উপস্থিত সভাসদবর্গের সম্মুখে বলল: আমার অধিকৃত লঙ্কা রাজ্যের উপর বন্ধুবর বিভীষেণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। আজ থেকে বিভীষণই এরাজ্যের রাজা। নবীন রাজা আমার প্রতিনিধি হয়ে লঙ্কাশাসন করবে। এদেশের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের একজন অংশীদার আমিও। যখনই লঙ্কাবাসী সঙ্কটে পড়বে তখনই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াতে ত্রুটি করব না।

করতালিতে মুখরিত হলো রাজসভা। সাধু-সাধু রব উঠল চতুর্দিকে।

বিভীষণের অধরে প্রস্ফুটিত হাসি ধীরে ধীরে বিকশিত হলো। সে হাসির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। হাসতে হয় তাই হাসছিল। প্রাণহীন হাসির মধ্যে তাই কেমন

একটা বোকা বোকা ভাব ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল কী যেন একটা বুকের ভেতর খচ খচ করে বিঁধছে, তাই স্বাভাবিক হতে পারছিল না কিছুতে। কানের পর্দায় সাধুবাদ উপহাসের মতো বিঁধছিল। চোখের সামনে করতালি দিয়ে কারা তাকে সম্বর্ধিত করছে এবং সাধুবাদ দিচ্ছে? ওরা কেউ স্বজন নয় তার। ওরা বিদেশী। এদেশের মাটি মানুষের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি তার পাশে নিজের পুত্রেরাও নেই। লঙ্কাযুদ্ধে অগণিত স্বদেশভক্ত বীর যোদ্ধাদের মতো তারাও বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের সত্তার অস্তিত্বের স্পন্দন এবং স্মৃতি এখানে বিরাজ করছে যেন।

অনুভূতিটা আচমকাই হলো। আর তাতেই বিভীষণ একটু আনমনা হয়ে গেল। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মুখখানা নিমেষে মলিন হলো। খুব অল্পক্ষণের মধ্যে সামনে নিল নিজেকে। যে মানুষ রাজনীতি করে তার ভেতরের গৃহী মানুষটা তার দৈন্য দেখিয়ে শূন্যতার যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। পরিজন পরিবৃত গৃহীমন যখন কী পেল, আর পেল না হিসেবে মগ্ন হয়ে পড়ে তখন রাজনীতিক ব্যক্তিত্বটা পিঠে দারুণ কশাঘাত হেনে চাঙ্গা করে তোলে। বিভীষণেরও মনে হলো, সে একা নয়। একাকীত্ববোধটা একটা মনের অসুখ। মনে করলেই মানুষ নিঃসঙ্গ ও একা হয়ে যায়। পরদেশী বন্ধু ও সহকর্মী ছাড়াও তার সঙ্গে আছে মন্দোদরী, সরমা। আর আছে লঙ্কাবাসী এবং রাক্ষসবংশের অনল, অনিল, হর, পবন, প্রমতি এবং সম্পাতি। এদের অনুরাগী ও অনুগামী রাক্ষসেরা। সংখ্যায় খুব একটা নগণ্য নয় তার নিজস্ব সমর্থক ও অনুগামী বান্ধব। কথাগুলো মনে হওয়ার পর এক অনধিগম্য অনুভূতি সৃষ্টি হলো তার মনের অভ্যন্তরে। এই প্রথম মনে হলো সে রাজা বিভীষণ-লঙ্কেশ্বর। এই অনুভূতিতে বুকখানা ভরে উঠল গর্বে, আনন্দে। এই মুহূর্ত থেকে লঙ্কেশ্বররূপে সর্বত্র তার সমাদর। রাজ্যে তার ইচ্ছে এবং নির্দেশই শেষ কথা। একটা রাজা রাজা বোধ জন্মাল মনে। লঙ্কার রাজ্য, সিংহাসন এখন তার নিজের। এমন দম্ভভরে নিজের বলে ভাবতে, তার ভেতরটা পুলকিত হলো।

অনেকক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে কাটল বিভীষণের। মুখে বোকা বোকা হাসির ফাঁকে দাঁতগুলো তেমনি বেরিয়েছিল। বানররাজ সুগ্রীব সহসা বলল: এক নিরানন্দ পরিবেশের ভেতর নতুন রাজার অভিষেক করার মতো অবস্থা নয়। কিন্তু সিংহাসন তো আর শূন্য থাকতে পারে না। তাই চলতি প্রবাদ হলো রাজা মারা গেছেন কিন্তু রাজা দীর্ঘজীবী হউন। এর অর্থ রাজার মৃত্যু নেই। রাজা যায় রাজা আসে। এক রাজার শূন্য জায়গা অন্য রাজা এসে পূর্ণ করে। আজও তেমনি লঙ্কার শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করতে বিভীষণের অভিষেক হলো। জাতীয় জীবনের দুঃসহ শূন্যতা ও সংকটের সময় কেবল বিভীষণই পারে জাতির কষ্ট ও দুঃখের জায়গায়, তার ক্ষত-বিক্ষত আহত মনের উপর সমব্যথীর হাতখানা বুলিয়ে দিতে। মহারাজ রামচন্দ্র বান্ধব বিভীষণের উপর দায়িত্ব অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অভিষেকের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হলো।

উৎসবের পরিবেশ নেই লঙ্কায়, তবু নতুন রাজাকে নগর পরিভ্রমণ করতে হবে। দুঃখী মানুষের কোথায় কতরকমের দুঃখ, জাতির অন্তরে কোথায় ব্যথা, তাদের কত ধরনের অভাব-অভিযোগ, কী করলে দ্রুত প্রতিকার হয়— নতুন রাজার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রানীও তা দর্শন করবেন। স্বচক্ষে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। আপনারা তাঁর শুভ সংকল্পের জয়ধ্বনি করুন।

বিভীষণ নিজের ভাবনার ভেতর চমকে উঠল। চমকে উঠে অস্ফুটস্বরে বলল: এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল?

বিভীষণের জন্য এক আশ্চর্য চমক অপেক্ষা করছিল। নগর পরিদর্শনের সময় সত্যই স্বপ্নের পৃথিবী থেকে রূঢ় বাস্তবের কঠিন কর্কশ মাটিতে পা রাখল। আর তাতেই বিভীষণের এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

নগরের রাজপথের দু'ধারে যে সব গৃহ ও অট্টালিকা আছে তাদের বাসিন্দাদের কেউ কৌতূহলী হয়ে নতুন রাজাকে দেখার জন্য ছুটে এল না। পরিবর্তে সশব্দে কপাটগুলো দুম দাম করে বন্ধ করে দিল। রাজা-রানীর কণ্ঠের ফুলমালা দেবার কোন লোক ছিল না পথে। এমন কি একটা ভিখেরীকেও দেখা গেল না। গুটিকয়েক যুবক একস্থানে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজার রথ দেখে তারা সরে গেল না। বানর সৈন্যেরা টেনে হিঁচড়ে তাদের রাস্তার বাইরে টেনে আনল। রাজার রথ সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিল এক যুবক বানর সৈন্যদের হাতে বন্দী অবস্থাতে বিভীষণকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলল: ওই লোকটা লঙ্কার কেউ নয়। দেশের শত্রু। জাতির কলঙ্ক। সঙ সাজিয়ে ওকে বাইরে বের করার কোন দরকার ছিল? সঙ দেখতে রাস্তায় লোক জড় হয় কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে দেখার কোন কৌতূহল নেই লোকের।

আরো একজন বেয়াদব তরুণের চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আনছিল নতুন কোটাল। যুবকটি রসিকতা করে তাকে বলল: কোটালদাদা চুলের মুঠোটা একটু আলতো করে ধরো। চুলগুলো ছিঁড়ে গেলে আমার দুর্দশা বাড়বে। কিন্তু তোমার দেশের দুর্দশা কিছুমাত্র হালকা হবে না। দেশের ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। যার আছে সে হলো আমাদের পেয়ারের নতুন রাজা। এরকম চুল টানাটানি করলে তার সঙ্গে পেয়ারটা থাকে কী করে? রাজদর্শনের প্রথম দিনে এই স্মৃতিটা যতকাল মনে থাকবে ততকাল নতুন রাজার মুখ দর্শন করা পাপ মনে হবে।

কথাগুলো বিভীষণও স্পষ্ট শুনল। তরুণদ্বয় অন্তরের রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা উগরে দেবার এক নাটক করল। এই নাটক না করলে মানুষের অসহিষ্ণুতা তার জানা হবে না। তাদের অসংখ্য কথাবার্তায় বিভীষণ খুব অপমানবোধ করল। মুখখানা অপমানে তাম্রাভ প্রাপ্ত হলো। কানের লতি রি-রি করে জ্বালা করতে লাগল তার।

প্রশ্নভরা তিরস্কারে দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে বিভীষণ রথে বসে লোক দুটিকে

দেখার চেষ্টা করছিল। ছেলে দুটি মানুষ নয়, জোয়ান বাঘ যেন। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো গায়ের জোরে ওদের দাবিয়ে রাখা যায়। কিন্তু লাভ কী? বরং, পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল শাবাশ বেটা। মরদের মতো বাঁচ এ জীবনে। কিন্তু হঠকারিতা করে আত্মহত্যা যদি করবি, তবে অনেক পথ আছে। অকালে জীবন কেউ নষ্ট করে? কতবড় জীবন পড়ে আছে তোর সামনে। কী দারুণভাবে বাঁচা যায় সেখানে এক জীবনেই। তখন জীবনে নীতি-দুর্নীতি, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ এ সব নিয়ে দুহাতে ছিনিমিনি খেলতে তোদের বিবেক একটুও কষ্ট বোধ করবে না। কষ্ট পায় বোকারা। যাদের বিবেক মরে যায় তাদের কোন মরণেই কষ্ট হয় না।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় বিভীষণের। ইশারায় কাছে আসতে বলল তাদের। পনস দুহাতে দুজনকে টানতে টানতে বিভীষণের দিকে নিয়ে চলল। বিভীষণ বলল : নতুন রাজা, দেশের কাজের জন্য তোদের ডেকে পাঠিয়েছে।

ওদের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল বিভীষণ। বলল : এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তোমাদের মাথাটাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এ সব করে লাভ হবে কিছু ভেবেছ? অথচ, তোমাদের মতো ভাবপ্রবণ আত্মমুগ্ধ যুবকদের পেলে আমি সারা দেশে একটা ওলোট-পালোট আনতে পারি।

যুবকদ্বয় এ ওর মুখের দিকে তাকাল। দু চোখে রাগ। একটা চাপা অস্থিরতায় ঠোঁট দুটি কাঁপে। প্রথমজন ক্ষুন্নকণ্ঠে বলল : উলোট-পালট যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাকি আছে কী আর?

বিভীষণ গম্ভীর হয়ে বলল : তোমরা কুয়োর ব্যাঙ। তোমাদের চারপাশে যারা আছেন তাদের মধ্যে ভালোমানুষ, স্বার্থহীন মানুষ কমই আছে। এটাই দুর্ভাগ্য! তোমাদের যা বোঝাচ্ছে তারা, তাই বুঝছ।

ছেলেটি অসংকোচে বলল : কী জানি? চোখের দেখাকেও মিথ্যে বলব?

কোটাল পনস বলল : কখনও কখনও চোখের দেখাও মিথ্যে হয় যায়। রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করে কেন?

পনসের কথাটা এত নির্ভেজাল এবং সম্পূর্ণ সত্য যে তরুণের মুখে কোন কথা যোগাল না। চুপ করে রইল। বিভীষণ তার নীরব অসহায়তার উপর চোখ রেখে একটার পর একটা কথা বসাল। বললঃ যুবক দেশের আর দেশের মানুষদের অবস্থার খবর রাখে কে? রাখে না বলেই রঙিন কাচের প্রাসাদে তারা বন্দী। রঙিন কাচের দেয়াল ভেঙে মানুষগুলোকে বাইরে বের করে আনার জন্য, তাদের মুক্তির জন্য প্রয়োজন একজন সৎ পরিশ্রমী, সাহসী বিবেকবান ধর্মপ্রাণ মানুষ। ভণ্ডামি করে বুজরুকি দিয়ে রঙিন কাচের প্রাসাদে মানুষের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা আমি বন্দী করে রাখিনি। দেশের মানুষকে ভালোবাসি বলেই আমার বিবেক দেশের মানুষের জন্য ভাবতে বসল। দেশের মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন হতে না পারা কি অপরাধ? কাচের দেয়াল

ভেঙে মানুষগুলোক নীল আকাশের নিচে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যে চেয়ে খুব দোষ করেছি কি? একে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা বলে কি? দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে আমার মতো পুরো খবর সবাই যদি রাখত এবং জানত তা-হলে লঙ্কার এই দুর্দশা হতো না আজ। দুর্ভাগ্য, এত ভাবনা ভাবার পরে ও লোকে আমার কথা শুনল কে? আমার পাশে এসে দাঁড়াল কোথায়? শ্মশানভূমি লঙ্কার চারপাশে একদল নির্লজ্জ, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর, ক্ষমতাপিপাসু চক্ষুচর্মহীন রাজনৈতিক কাক শকুনের ভিড়। ভাবলেও গা রি-রি করে।

দ্বিতীয় ছেলেটি মজা করে বলল, দেশটা যখন ভণ্ড আর বুজরুকির হাত থেকে উদ্ধার করলেন তখন বেছে বেছে ঐ রাজনৈতিক কাক-শকুনদের কেন যে মারেননি সেকথা ভেবে বড়ই ক্ষোভ হচ্ছে।

ছেলেটির কথার ভেতর এমন একটা সরস বিদ্রূপ ছিল যে বিভীষণ অপমান বোধ করল। কিন্তু বিচলিত হলো না। বিরক্ত হয়ে বলল : তোমার সঙ্গে বাজে বকার সময় আমার নেই। নিজেকে নিয়ে যা খুশি করা কিংবা ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকারও তোমার নেই। দেশের শান্তি, কিংবা অন্যদের জীবনে বিঘ্ন ও উৎপাত সৃষ্টি হয় এমন কোন চেষ্টা নতুন রাজা বরদাস্ত করবে না। তোমাদের খেপামিতে দেশের অন্য ছেলে মেয়ের জীবন নষ্ট হতে দেবো না। তোমরা চাইলেই এই মরা দেশটাকে আবার সোনার লঙ্কা করে তুলতে পার। দেশের যুবশক্তিকে লঙ্কার আজ সবচেয়ে প্রয়োজন। তোমরা দেশের শক্তি, এবং ভবিষ্যৎ। জনগণই দেশের শক্তির উৎস। আমার অগ্রজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বলেই বাহুবলকে একমাত্র রাজশক্তি ভেবে ভুল করেছিল। সেই ভুল পুনর্বার করে দেশের সর্বনাশ হয় এমন কোন কাজ কর না।

কী হলো কে জানে, কিন্তু ছেলে দুটি চুপ করে গেল। ওদের থামাতে পেরে বিভীষণের খুব আনন্দ হলো। ওদের মুখে লঙ্কাবাসীর মুখ দেখল। অনুরূপ এক নীরব বিদ্রোহে তাদের ভেতরটা ফুঁসছিল। বিভীষণ সেজন্য উদ্বিগ্ন নয়, এই সাধারণ মানুষগুলো যেমন সহজে খেপে যায়, তেমনি সহজে ঠাণ্ডাও হয়। একটু নতুন করে নতুনভাবে বাঁচার প্রতিশ্রুতি পেলেই ওরা ধন্য হয়ে যায়। সুখের কাঙাল। সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যেই খুশি হয়।

আত্মপ্রসন্নতায় দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে নিবে গেল। তার দুই চোখে একটু বিব্রতভাবও খেলে গেল। লঙ্কার মানুষ সমাদর করতে তাকে ছুটি এল না— এই অপমানটা কিছুতে ভুলতে পারছিল না বিভীষণ। এরা জোটবদ্ধ হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করল কি? পথে কৌতূহলী একজন শিশুর মুখও চোখে পড়ল না কেন? যে দিকে তাকাই সেদিকেই সারবদ্ধ নিরাপত্তা রক্ষীর সারি। কী হলো পুরবাসীর? একি তাদের ঘৃণা? অভিমান? অসহযোগিতা? — না, সব মিলিয়ে মৌন প্রতিবাদ? প্রশ্নয় ভরা বিস্ময়ে নিজেকে শুধাল— তবে কী পুরবাসী প্রত্যাখ্যান করছে তার নেতৃত্ব? তাকে যে

পরোয়া করে না তারা; একথাটা জানান দেবার জন্য কি নগরদর্শনের শরিক হয় নি।

এক অন্যমনস্ক ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়ে তার মনে হলো, নিজের দেশ, সমাজ ও পরিবারের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট যে থাকল, সে থাকল। লোকের সমাদরও সে পায়। কিন্তু কোন কারণে সেই গাড়ি থেকে ছিটকে গেলে সে বৃত্তের বাইরে থেকে গেল। নিজের গন্ডীতে আর ফিরল না। কচুরিপানার মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে সারাটা জীবন তাকে ভেসে বেড়াতে হয়। কথাগুলো মনে হতে একটা ভীষণ কষ্ট হলো বুকের ভেতর। লোকে যাই ভাবুক, সে কিন্তু সকলের মঙ্গল চেয়েছিল। তবু তার কথা কেউ শুনল না বলে দুঃখ হয়। এসব ভেবে মন খারাপের কোন মানে হয় না বিভীষণ জানে। মানুষ হলেই তার মন বলে একটা ব্যাপার থাকেই। মন থাকলেই সে ভাবে। ভাবলেই মনের মধ্যে ঝড় উঠে। ঝড় উঠলেই উথাল-পাথাল দরিয়াতে বড় অসহায় বোধ করে।

বিশালাকায় গাছের ছায়া দিয়ে মন্থরগতিতে রথ চলেছিল। ঐ গাছগুলো যুগ যুগ ধরে এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও ঠায় একা একা দাঁড়িয়ে চারিদিকে সবুজ ডাল পালা মেলে নিজেকে নিঃশব্দে মেলে ধরে, নড়েচড়ে সরতে থাকে। অনন্তকাল ঐ ভাবে একজায়গায় দাঁড়িয়ে বড় থেকে বড়, তার থেকেও বড় হতে হতে একদিন সবার আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। কথাগুলোর ভেতর এমন কিছু ছিল যা বুকের গভীরে স্পন্দিত হতে থাকে সর্বক্ষণ।

একটা ঘোরের মধ্যে প্রাসাদে ফিরল বিভীষণ। মনটাও বিস্বাদ এবং তেতো। থমথমে গম্ভীর মুখে রথ থেকে নামল। মন্দোদরীর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। অলিন্দ অতিক্রম করে দু'জন ঘুরলো। নিজেকে তেমনভাবে প্রকাশ করতে যে ভাষার দরকার সেই মুহূর্তে তাদের উভয়ের ছিল না। বিষাক্ত দৃষ্টিতে মন্দোদরী বিভীষণের গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু বিভীষণ কোনদিকে না চেয়ে বিষণ্ন মন নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। ভিতরকার লজ্জা, অপমান উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা পাছে মন্দোদরী দেখে ফেলে তাই নিজেকে তার কাছ থেকে লুকোনোর জন্য বিভীষণ মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকল। কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল না। একা মনের আয়নার সামনে বসে নিজের অভ্যন্তরে গভীর দুঃখ আর অপমানের কথাগুলো ভাবতে ইচ্ছে হলো।

সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না বিভীষণ। পুরবাসীদের অশোভন দুঃখ অপমানটা সে ভুলতে পারছিল না। প্রত্যাশা ছিল যেখানে সবচেয়ে বেশি সেখানে থেকে প্রত্যাখ্যানের অপমান নিয়ে ফিরতে হলো তাকে। সর্বক্ষণ ঐ কষ্টটা কাঁটার মতো বুকে বিঁধে থেকে যন্ত্রণা ছড়ায়। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত হয় তার ভেতরটা। দামামার শব্দ তুলে দেয় রক্তে। ইচ্ছে করে মুক্ত কৃপান নিয়ে জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে

দিতে। হুঙ্কার, গর্জন, তিরস্কার আর বুকের মধ্যে নানারকম বিস্ফোরণ ঘটায়। কোনো কোনো সংকল্প বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মতো আমূল গেঁথে যায়। নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল: রাজত্ব করতে গিয়ে বিদ্রোহী জনতাকে শায়েস্তা করতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে বীরগতি লাভ হবে। যদি জেতে ভোগ করবে গোটা লঙ্কাকে। মন্দোদরীকে।

জীবনে প্রথম মন্দোদরীর সঙ্গে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটালো বিভীষণ। ওর পাশে শুয়ে থাকতে এত অদ্ভুত লেগেছিল যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বলতে পারল না। প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে যাওয়ার পর মনে হলো মন্দোদরীর নিরুত্তাপ দেহটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। নিজেকে বোঝাল বিভীষণ; ক'টা দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বেসামাল মনটা সামলে নেবে সব। তবু মানুষের মন তো। অস্থির হয়। চিরকাল যাকে কামনা করল, যে ছিল তার স্বপ্নের-সে এখন বাস্তব সত্য। সে আছে একেবারে তার লাগামের মধ্যে। হৃদয়ের খুব কাছে তার। উষ্ণ শ্বাস লাগছে গায়ে। তবু হাত দিয়ে ছুঁতে পারছে না তাকে। বিয়ের প্রথম রাতে অপরিচিতা সব রমণীই বুকে আনন্দ, উৎকণ্ঠা, লজ্জা এবং বিস্ময়ে মেশানো এক অদ্ভুত সুখের দপদপানি নিয়ে প্রতীক্ষা করে। ছেলেদের বুকের স্পন্দনের উঠা পড়ার সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠে দেহের যত উত্তেজনা। পরস্পরের কাছে মেলে ধরার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা ভরে থাকে ভালোলাগার আবেগে, জীবনকে মধুর করার-উচ্ছ্বাসে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে শরীর মন চমকে উঠে। হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভেতর এমন ধুক ধুক করতে থাকে যে শরীরের মধ্যে তখন ঘুঙুর বাজে। সমস্ত সত্তা, অনুভূতি তখন আকাশজোড়া বিদ্যুৎ লেখার মতো চমকিত হতে থাকে।

কিন্তু মন্দোদরী একেবারে অন্যরকম। তার দু'চোখ বোজা। পাশে শুয়ে আছে পুতুলের মতো টানটান হয়ে। তার কোন কৌতূহল নেই, প্রতীক্ষা নেই, বিহ্বলতা নেই। তার বুকে ভালোবাসা নেই, যা জমে আছে তা হয়তো তার প্রতি ঘৃণা, রাগ, বিদ্বেষ, ধিক্কার। বুকটা বিভীষণের থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

মন্দোদরীকে অদ্ভুত অপরিচিত মনে হচ্ছিল। নতুন বধূর চেয়েও সে অপরিচিতা। তবু তাকে ঘিরে বিস্ময়ের অন্ত নেই তার। ওর নিকট সান্নিধ্যটা বিভীষণের সমস্ত সত্তার গায়ে, অনুভূতির গায়ে লেগে রইল। এ রকম একটা অভিজ্ঞতা চেপে সুস্থ থাকা তার মুশকিল হলো। তাই কি তার ভিতরটা অধীর? মন্দোদরীর পাশে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে প্রশ্ন করল বিভীষণ। না, অন্য কোন প্রত্যাশা আছে? এই প্রত্যাশার উৎস কোথায়-শরীরে না মনে? অস্পষ্ট আলোর মধ্যে সে চোখ মেলে মন্দোদরীকে দেখছে। কী ভালো লাগছে। বুক থেকে আঁচলটা সরে গেছে। বয়সের ভারে বুক একটু নুয়ে পড়েনি কিংবা শিথিল হয়নি তার সুডৌল গঠন। কিছুটা

কোমল অংশ তার দেখতে পাচ্ছে। অনুভব করতে পারছে। অনুরাগের আভাসে বিভীষণের বিভোর চোখ দুটো গভীর আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। ইচ্ছে করল, তার কর্কশ হাত দিয়ে সুডৌল বুকটা স্পর্শ করে। তার বুকের উপর মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে। বিচিত্র এক শিহরনে তার দেহ মন প্লাবিত হয়ে গেল, তবু কিছুই করা হলো না।

বারংবার মনে হতে লাগল ঐ সুন্দর মুখ আর মসৃণ দেহের আড়ালে কোন ঝড় লুকোনো আছে কে জানে? কোনদিনই মন্দোদরীর মনের কথাটা সে জানতে পারেনি। এখন কাছে পেয়েও তাকে জানা বাকি রয়ে গেল। এই মুহূর্তে তার ভেতর আর কোন অস্থিরতা নেই। মন্দোদরীর দেহ স্পর্শ করতে তার আর মন নেই। বিভীষণ এখন শুধু তার কথা শুনতে চায়। অপেক্ষা করতে থাকে তার জন্য। কিন্তু মন্দোদরী নীরব।

অনেকক্ষণ মন্দোদরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মন্দোদরীও অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু চোখ মেলে দেখল না। তীব্র একটা যন্ত্রণা যেন তার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে যাচ্ছিল। নিঃশব্দে সময় বয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে শুকনো গলার বিভীষণ জিগ্যেস করল: তুমি কিছু বলবে না! আমার উপর রাগ করেছ?

বোবা হয়ে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। বড় বড় ডাগর দুই চোখ মেলে বিভীষণের দিকে তাকাল। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটেছিল তার চাহনিতে। বিভীষণের কালো চোখে কেমন একটা মুগ্ধ বিহ্বলতা। উৎসুক হয়ে কাকে যেন খুঁজছে বিভীষণ। মন্দোদরী বিভীষণকে দেখছিল না। এক অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার দিকে ফেরাল সে চোখ বিরক্ত ও অনুসন্ধিৎসু।

বিভীষণ উঠে বসল বিছানার উপর। পা দুটো টেনে বাবু হয়ে বসল। মন্দোদরীর একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরল। সে কোন আপত্তি করল না, হাতটা সরিয়ে নিল, ছাড়িয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করল না। বিভীষণের হাতের স্পর্শে ওর হাত কাঁপছিল, ভয়ে নয়, উত্তেজনায় নয়, একধরনের অপ্রকাশ্য অনুশোচনায়।

মন্দোদরীর নরম হাতখানা বুকে চেপে ধরে ব্যস্ত গলায় বলল: সোহাগ রাতের গুমরে গুমরে কান্না আমি সহ্য করতে পারছি না। কেন বোঝ না, ভালোবাসায় কোন পাপ নেই, পাপ হবে কেন? এই ভালোবাসা তো ঈশ্বর দিয়েছে। ভালোবাসাই ঈশ্বর। মন থেকে সংস্কার মুছে ফেলে অন্য মানুষ হয়ে উঠতে একটু সময় লাগেই। কিন্তু সেজন্য অনুশোচনা থাকবে কেন? রাগ করে প্রিয় ভালোবাসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে কেন? এমন সুন্দর সোহাগ রাতে পাশাপাশি থেকেও বিরহ বোধ করছি। মন্দোদরী, তুমি কথা বল। একবার আরম্ভ করলে মন আপনিই হালকা হয়ে যাবে। তখন স্বচ্ছন্দবোধ করবে।

মুখ বিকৃত করল মন্দোদরী। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হলো: দেবর! সত্য যা, তা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রথার বন্ধনে বাঁধা আমি। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ জানলার

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, খোঁটায় বাঁধা, নিয়মবদ্ধ, মায়াবদ্ধ নরম মনের গো জাতীয় প্রাণীর মতো বেঁচে থাকতে হবে। এই বাঁধন কেটে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা আমার বন্ধ। এ আমার নিয়তি। আমার অদৃষ্ট।

মন্দোদরী! নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বিভীষণ চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল।

মানুষের নিজের হাতে গড়া পৃথিবীটা অটুট থাকে শুধু মানুষই থাকে না। এই পৃথিবীতে তার ভূমিকাটা সংক্ষিপ্ততম। সেই জায়গাটুকু শূন্য হয়ে নেই। এক ঢেউ চলে গেলে আর এক ঢেউ এসে তার শূন্য জায়গা ভরে দেয়। তেমনি জীবন প্রবাহও থেমে নেই। এ জীবনে যে ছিল পরপুরুষ আর পরস্ত্রী; এই সংসারের গোয়ালে যার যার খোঁটায় তাদের বেঁধে দেওয়া হলো। মুখের সামনের জাবনাতে মুখ ডুবিয়ে জীবনের জাবনা চিবিয়ে যাচ্ছে অভ্যাসবশে। এই তো আমাদের জীবন। যে জীবন তুমি চেয়েছিলে হয়তো তার মধ্যে ভুল ছিল। হয়তো আমারও কিছু দোষ ছিল। সেই ভুল বোঝাবুঝির রন্ধ্রপথ ধরে নিয়তি তোমার আমার জীবনে প্রবেশ করে একটা সুন্দর সমৃদ্ধ দেশকে ধ্বংস করল। আমার জন্যই লঙ্কার এই দুরবস্থা। এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছি না নিজেকে প্রতিমুহূর্ত অপরাধী আর পাপী মনে হচ্ছে।

বিভীষণ হাসল। খুশির হাসি। একটু সরে এসে মন্দোদরীর গা ঘেঁসে বসল। গালের উপর তার নরম হাতখানা চেপে ধরে বলল: এই কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ। কী বোকা তুমি? এই নিয়ে কি সর্বক্ষণ তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে।

মন্দোদরী হাতখানা বিভীষণের আলতো মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: থাক ওসব কথা। তোমার যা জানার ইচ্ছে জিগ্যেস কর।

কোথা থেকে শুরু করব, ভেবে পাচ্ছি না। তবে সব কিছুর তো একটা আরম্ভ থাকে।

মন্দোদরী নিস্পৃহভাবে বলল: সব আরম্ভের শেষ থাকে। এখানেই আমাদের ব্যাপারটা ইতি হোক।

সহসা কথা বলতে পারল না বিভীষণ। সব চিন্তার সূত্র মন্দোদরী ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল যেন। হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুল মন্দোদরী। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: আমার মন ভালো নেই। একটু চুপ করে থাকতে দাও। যতই তুমি কথা বল না আমার সঙ্গে, আমার একই উত্তর ভালো লাগছে না। একটু একা থাকতে দাও।

বিভীষণের সব আবেগ, উৎসাহ, বিস্ময় বেলুনের মতো হঠাৎই চুপসে যায়। খুব রাগ হয়, অভিমান হয় নিজের উপর। বড় অপমান লাগে। সব মানুষের একটা গর্ব থাকে, আত্মসম্মানবোধ থাকে। সেই আত্মসম্মানবোধটা গভীরভাবে অপমানিত হলে বুকের ভেতরটা তেতে উঠে। ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে বিভীষণ। অপলক দুই চোখ নিবিড় ব্যথায় থমথম করে। নিবিড় অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়া রাতের মতো আকাঙ্ক্ষাগুলো

হঠাৎই ঝিমিয়ে পড়ে। মনের ঘরে ঘরে প্রেমের যে আলো জ্বলে উঠেছিল, পুজোর ঘণ্টা বাজছিল, সারা তনু জুড়ে মৃদঙ্গের মিঠে আওয়াজ মুগ্ধ করা মন্ত্র নিয়ে ধন্য করে দিচ্ছিল হঠাৎ সব নিঝুম হয়ে গেল এক এক করে। জীবনের একটা বিরাট প্রাপ্তিকে এক লহমায় অপ্রাপ্তিতে গড়িয়ে দিল যেন। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও মননশীলতা দিয়ে তিল তিল করে বুকের ভেতর যে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছিল, স্বপ্নের নীড় গড়েছিল তার সব কিছুই মন্দোদরী হঠাৎ মূল্যহীন করে দিল।

ব্যর্থ প্রেমের অভিমান, অপমান বুকে করে ভাঙাভাঙা স্বর বলল : যাকে মানুষ গভীর করে ভালোবাসে তাকে সম্পূর্ণ করে না পেলে তার জীবনটা এবং তার আমিত্বই অনস্তিত্বে পৌঁছয়। হুঁশ থাকলে এমন মূর্খামি কেউ করে ? বল ? মানুষের যা কিছু চাওয়া বা পাওয়া তাকে অর্থহীন করে তোলে প্রেম। প্রেমের জন্য মানুষ সব কিছু করে। এই যে উদয় অস্ত একজন মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে, পরিবার ও সংসারকে ভালেবেসেই সে করছে। এর নাম ভালোবাসা। যে ভালোবাসেনি নিজেকে এবং অন্যকে, তার জীবন বৃথা।

মন্দোদরী বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় দাঁতে দাঁত টিপে বলল : তুমি চুপ করবে, না আমি উঠে যাব ? তোমার এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে ন।

মুখ বুজে থাকলে কি খুব ভালো লাগবে ? একটা কথাও তুমি বলছ না। তোমার মনের মধ্যে কী এত তোলপাড় করে আমাকে বল।

কী বলবে মন্দোদরী ? যে দু'জন পুরুষ একজন মেয়েকে ভালোবাসে তাদের দু'জনের মধ্যে সদ্ভাবের বদলে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা হয় কেন ? তারা যদি সহোদরও হয় তা-হলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভিতরে ভিতরে তাদের এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। নীরব যুদ্ধ সর্বক্ষণ ধরে চলে। ঝগড়া বোধ হয় অধিকার নিয়ে, সম্পূর্ণ নিজের বলে দাবি নিয়ে। এখানে মায়ের পেটে ভাই হলেও নারীর উপর দাবি ও অধিকার ছাড়ে না। সব পুরুষ সব জিনিসের ভাগ দিতে পারে কেবল তার বাঞ্ছিতা নারীর ভাগ দিতে পারে না। বিভীষণের মতো নরম মনের ভীরু পুরুষও একজন নারীর জন্য লঙ্কা ধ্বংস করেছে, ভাইকে হত্যা করেছে। সে নারী মন্দোদরী নিজে। একদিন সে নারীও চিতার আগুনে ছাই হয়ে যাবে। সব আনন্দ, সাফল্য, দুঃখ, অনুভূতির স্মৃতিও হারিয়ে যাবে। কিন্তু লঙ্কার মানুষ মন্দোদরীকে ভুলবে না। তাই তো দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে বুক ভরে যায়।

শ্রান্ত, বিষণ্ন গলায় মন্দোদরী বলল : মাটি আর নারীকে প্রত্যেক পুরুষ চিরদিনই নিজের একার মালিকানায় পেতে চেয়েছে গায়ের জোরে। অস্ত্রের জোরে। অর্থের জোরে। কখনই ভালোবাসার জোরে তাকে দখল করেনি। তুমিও না দেবর। সেই কারণে মন্দোদরীর ভালোবাসার দাবিদার হতে পার না। আমার উপর মালিকানা জাহির করার জন্য দেবতুল্য অগ্রজকে হত্যা করে দেশীয় প্রথার তকমা এঁটে দিয়ে অগ্রজের

স্ত্রীকে বধূ করে তোমার একার সম্পত্তি করে নিয়ে ভাবলে জয় হয়েছে তোমার। এখনও রানী মন্দোদরী আমি। তোমার সোহাগ রাতে তৃষ্ণা মেটানোর রমণী নই।

ঘাড় ফিরিয়ে আগুনের চোখে তাকিয়ে ছিল মন্দোদরী। চমকানো বিস্ময়ে থমকে তাকিয়েছিল বিভীষণ। এ কোন মন্দোদরীকে দেখছে? চেনা মন্দোদরী এমন অচেনা হয়ে গেল কী করে? মন্দোদরীর বুকে এ কোন আগুনের স্ফুলিঙ্গ? খুবই অবাক হয়ে গেছিল বিভীষণ। একেই হয়তো বলে ব্যক্তিত্ব।

মন্দোদরীর চেহারাও বটে একখানা। বয়স হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। তবু যুবতীর মতো আঁটসাঁট গড়ন। কোথাও মেদ শিথিল হয়নি, চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি, ত্বকে মসৃণতা, কোমলতা এখনও তরতাজা ফুলের মতো। গায়ের রঙ আগুনের মতো। গড়ন, চোখ, মুখ, চিবুক ভুরু সব সুন্দর। ভীষণ সুন্দর। বয়সটা তার কিছু নয়। বড়ত্ব দিয়ে বয়স মাপা যায় না। তার রূপও সৌন্দর্যকে সে অনুভব করে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যাতারার নীলাভ দ্যুতিতে, লাজুক নম্রতায়, ফুলের সুবাসে, দৃপ্ত সূর্যালোকে-লোভীর মতো তাকিয়ে থেকেছে বিভীষণ তার দিকে,। দুরন্ত প্রমত্ততার হঠাৎ আবেগে আশ্চর্য হয়ে একদিন আবিষ্কার করল — মন্দোদরীকে সে ভালোবাসে। মন্দোদরীও ভালোবাসে তাকে। কিন্তু সে ধারণাটা হঠাৎ বদলে গেল। মনে হলো, মন্দোদরীর ভালোবাসা — বন নদী পাহাড়, আকাশের তারারা যেমন পৃথিবীকে ভালোবাসে অনেকটা সেরকম। সেই ভালোবাসায় দাহ নেই। সবটুকু নিঃশর্তে, মমতা নিঙড়ে পেশ করে। অনন্ত প্রাপ্তিকে ভরে থাকে বুক। দিনের পর দিন। মনের ভেতর এক সুখের দপদপানির সঙ্গে একধরনের ব্যথা বাজে। সেই ব্যথাটাই বিশ্বাসঘাতকতা করল তার নিজের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে, ভাইয়ের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে। গভীর এক অপরাধবোধে মনটা নুয়ে আসে। একোন উপাচার সাজিয়ে প্রেমের নৈবেদ্য দিল সে। উপাচার ছাপিয়ে উঠে উপাসিতের কাছে তার হৃদয়ের পূজো পৌঁছল না। নৈবেদ্যের ডালি পড়ে আছে পায়ের কাছে সকালের ঝরা ফুলের মতো। স্বপ্নগুলো মৃতের চেয়েও মৃত। অভিমানের সাগর উথলে উঠল বিভীষণের বুকে। মন খারাপ করা বিষণ্ণতা বুকে নিয়ে বলল: এই মাটি মানুষকে আমি কি ভালোবাসি না? এই মাটি কি আমার দেশ নয়? এই দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি বলেই তো একজনের গোঁয়ারতুমিতে দেশ যখন বিপন্ন, দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে, দেশের সম্পদ একটা অহেতু যুদ্ধের জন্য জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের কথা ভেবেই নিজের মত, আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে সকলের মধ্যে থেকে সকলের বাইরে থেকেছি। এদেশের মানুষ রাজার রক্তচক্ষুর ভয়ে মনের কথাটা খুলে বলেনি। আবার বিদ্রোহী রাজভ্রাতার পাশে দাঁড়াতেও ভয় পেয়েছে। তাদের মনের কথা অগ্রজ ভাবেনি। দেশের মাটিতে বসে বিপন্ন দেশের জন্য কিছু করে দেশকে ভালোবাসার কোন নজির সৃষ্টি করতে পারলাম না আমি। অগ্রজের সুমতি ফেরাতে তুমিও পারনি দেবী। অবশ্য চেষ্টার কসুর করনি। কিন্তু

লাভ হয়নি। তার জেদের মূল্য দিতে হয়েছে লঙ্কাকে। এই লঙ্কাপুরীতে একা আমিই তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অকপটে তার দোষের কথা, পাপের কথা, স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলেছি। প্রয়োজন হলে দেশের স্বার্থে তার বিপক্ষে দাঁড়াতে ভয় করব না। দেবী, এই লঙ্কাপুরীতে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ তাকে ধর্মপথে ফেরার কথা বলেনি। কিন্তু আমাদের সব আবেদন নিবেদন অরণ্যে রোদন হয়েছে। দেশকে ভালোবাসি বলেই শত্রুপক্ষের সহায়তায় এ দেশকে একজন স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী নরপতির হাত থেকে উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করা কী অপরাধ? একে কি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা বলবে? আজ শ্রীরামের পক্ষে ছিলাম বলেই পরাধীনতা মেনে নিতে হয়নি। বানর সৈন্যেরা দেশজুড়ে অবাধ লুটপাট করত। অনেক প্রাণহানি হতো। লঙ্কাপুরীর সব সম্পদ অযোধ্যায় চলে যেত। আগণিত মানুষ বন্দী হয়ে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করত। শুধু আমার জন্যই লঙ্কাকে কিছু হারাতে হলো না। তুমিই বল দেবী, নিজেকে কোরবানি করে দেশকে এর চেয়ে বেশি কেউ ভালোবাসতে পরত? আমার দুর্ভাগ্য! এই কথাগুলো কাউকে বোঝাতে পারলাম না। তুমিও বুঝতে চাইলে না দেবী। হাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভাবলেও ভালো লাগে সে কথা। কিন্তু একজন প্রেমিকের ভালোবাসা তো কখনই শরীর-সর্বস্ব হতে পারে না। শ্রদ্ধা, মমতা, দরদ, সহানুভূতি ছাড়া প্রেম হয় না। যেখানে এসব কিছু নেই সেখানে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু নিষ্ঠুর বিবেকহীন রিরংসা।

চমকে উঠে মন্দোদরী বিভীষণের দিকে চাইল। সম্মোহিতের মতো বিছানার উপর উঠে বসল। চুপ করে বিভীষণের দু'চোখে চেয়ে রইল। কথা বলতে পারল না। বিভীষণের কষ্টটা হঠাৎ তার বুকে বিঁধে যে এতখানি কষ্ট দেবে ভাবতে পারেনি। দু'চোখের কোণে তার জল টলটল করতে লাগল। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল বিভীষণের। কী হয়েছে মন্দোদরীর কে জানে? বিভীষণের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে সে হাসল। প্রিয় বন্ধুকে আনন্দের মুহূর্তে দেখে, সুখ-দুখের সময় দেখে যেমন হাসি হাসে-কষ্টের হাসি, সহমর্মিতার হাসি, বিশ্বস্ততার হাসি তেমন এক হাসিতে ঠোঁট দুটি প্রসারিত হলো। বিভীষণের মুখও অনির্বচনীয় হাসিতে সুন্দর দেখাল। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে রইল একজন আর একজনের দিকে।

নরনারী কথা না বলে যখন চুপ করে থাকে তখনই হলো প্রেমের সুন্দর মুহূর্ত।

॥ চার ॥

রামচন্দ্রের আহ্বানে বিভীষণের মন্ত্রণাকক্ষে একে একে হাজির হলো সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, নীল, অঙ্গদ। সবশেষে, সম্পাতি, অনিল, অনল, পনসের সঙ্গে প্রবেশ করল বিভীষণ। রামচন্দ্রের পাশে রাজার আসনে বসল সে। তার সঙ্গীরা যে যার

নির্দিষ্ট আসনে বসল।

সভার সূত্রপাত করে বিভীষণ বলল : মিত্রবর দাশরথি রামচন্দ্র দুর্দশাগ্রস্ত লঙ্কার সার্বিক উন্নতির জন্য এবং দেশে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করলে ভালো হয়, লঙ্কার উন্নয়ন দ্রুত হয় সেজন্যই সভা এই ডেকেছেন। আমি অনুরোধ করব, তিনিই বলুন বর্তমান রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমার কী করা উচিত। আপনারা সকলেই আমার বন্ধু আপনাদের সহযোগিতা এবং সৎপরামর্শ সর্বদা আমার কাম্য।

বিভীষণের সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হওয়ার পরে রামচন্দ্র সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন : বিভীষণ আমার বন্ধু। তার সাহায্য না পেলে এই লঙ্কা নগরী জয় করা সহজ হতো না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লঙ্কার ক্ষত ভেতরে-বাইরে। এই ক্ষতগুলির আরোগ্য সর্বাগ্রে দরকার। মিত্র বিভীষণের পাশে দাঁড়িয়ে কাজটা আমাদের সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে করতে হবে। এ কথা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে গতকাল নগর পরিক্রমণের অভিজ্ঞতা বিভীষণের সুখের হয়নি। তার মনেও গ্লানি জমে আছে। লঙ্কার পুরবাসীদের মনে বিরূপতার যে হাওয়া বইছে তার পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীদের হাতের অস্ত্র যে জনগণ; তাদের অকেজো করে দিতে হবে। এই কাজটা কীভাবে করলে সুসম্পন্ন হয় তার ভার আমি প্রাজ্ঞ হনুমানের উপর অর্পণ করলাম। একদিন লঙ্কায় হনুমান পুরবাসীর মনে রাবণ-বিদ্বেষের যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তার বহ্নিশিখায় লঙ্কানগরী পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছিল। লঙ্কাবাসীর মনে যে তাপ জমেছে তাকে শীতল করার দায়িত্বও মিত্রবর হনুমানের। তাঁর চেয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি এখানে কেউ নেই বলে আমার ধারণা।

সভামধ্যে হনুমান দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলল : প্রভু রামের ইচ্ছে পালনের কোন ত্রুটি করব না।

রামচন্দ্র তবু সভাস্থ সকলকেই সম্বোধন করে বলল : আপনারা সকলেই আমার ও বিভীষণের বান্ধব। লঙ্কার পুনর্গঠনের কাজ হনুমানের একার নয়। মিত্রবর বিভীষণের রাজনৈতিক মর্যাদা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পুরবাসীদের মন জয়ের জন্য যা যা করলে ভালো হয় আপনারাই বলে দিন। বন্ধুকে বিপদের ভেতর রেখে অযোধ্যায় গিয়ে আমি শান্তি পাব না। সেখানে প্রত্যাবর্তন করার আগেই যদি উন্নয়নমূলক কাজগুলি একবার চালু হয়ে যায়, তা-হলে পুরবাসীরা সব বিরূপতা ভুলে বিভীষণের একান্ত অনুরাগী অনুগামী হয়ে উঠবে। রাজারূপে পেয়ে গর্ববোধ করবে। আমিও শান্তি পাব। এখন আপনারাই আমার ভরসা। আপনাদের সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছি।

সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ল হয়ে "সাধু সাধু" করে রামচন্দ্রর প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করল। সভাস্থ সব ব্যক্তিবর্গ তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সাধু সাধু করল।

ভিতরে ভিতরে একটা হালকা খুশির ভাব বয়ে গেল বিভীষণের। সে আর একা

নয়, নির্বান্ধবও নয়। তার পাশে আরো দশজন আছে; এই বোধটা পুলকিত করল তাকে। গতকালের আত্মগ্লানি দাহ্যের মতো তার ভেতর জ্বলছিল। সেই জ্বালাটা আর নেই। স্বস্তিতে ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। দারুণ সুখের ভেতর কেবলই মনে হচ্ছিল ঈশ্বর যাই-ই করেন তার পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। এই শাস্তি হয়তো দরকার ছিল তার। সমস্ত রকম অনুভূতির মধ্যে এক একজন মানুষকে পার করার পেছনে ঈশ্বরের সুগোপন উদ্দেশ্য হয়তো থাকে। লঙ্কার পুরবাসীদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে তার ধারণা হয়েছিল নিজের দোষে সবই হারিয়ে বসেছে। মান-সম্মান, মানুষের ভালোবাসা সব হারিয়ে গেছে তার। সেজন্য দুঃখ, অনুশোচনার অন্ত ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল যা অবধারিত তাই ঘটেছে। সব দোষই তার। দেশের সঙ্গে স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তি ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। এই শাস্তিটুকু না পেলে রামচন্দ্র এবং বানরদের বন্ধুত্বের স্বরূপ তার সম্পূর্ণ করে জানা হতো না। লোকে বলে ঈশ্বর করুণাময়, যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। কথাটা এই মুহূর্তে ভীষণভাবে তার সত্য মনে হলো। ঈশ্বরের ইচ্ছেটা তাঁর উপর দারুণ অভিমান নিয়ে বুঝতে পারা যায় না বলে তাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়। নিষ্ঠুরতাটুকু তাঁর কাছ থেকে না পেলে নিজেকে এবং পরকে অনুভব করার গরজ তার হতো না। উপলব্ধি যার নেই সে তো মানুষই নয়। উপলব্ধির আলোয় অন্যকে অনুভব করা, তার জন্য ভাবিত হওয়ার আর এক নাম মনুষ্যত্ব।

লঙ্কাবাসীর নীরব অবহেলা পেয়েছিল বলেই তাদের দুঃখে দুঃখী হওয়ার কথাটা সর্বাগ্রে ভাবতে হয়েছে সকলকে। তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্টের কাছে তার নিজের দুঃখটাকে দুঃখ যন্ত্রণা বলে মনেই হচ্ছে না। ঈশ্বর নিজে থেকে মানুষের অন্তরে এই শুভবুদ্ধির সূচনা করেন। যার বোধ, বুদ্ধি, বিবেক থাকে কেবল সে তার মহিমাকে উপলব্ধি করে। এক গভীর প্রসন্নতায় বিভীষণের অন্তর ভরে যেতে লাগল। এক অনাবিল হাসিতে তার মুখখানি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। সকলের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতায় সে চুপ করে রইল। তার দৃষ্টি হনুমানের মুখের উপর স্থির হয়ে ছিল। সেই নীরব চোখের উৎসুক চাউনিতে এমন একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা ছিল যে হনুমান চুপ করে থাকতে পারল না। কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াল।

হনুমান মনে মনে তার বক্তব্যগুলো দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে বলল : মহাত্মা বিভীষণের নগর পরিক্রমণের গতকালের ঘটনাটা কারো মনেই রেখাপাত করত না যদি না পুরবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রথম রাজদর্শনকে বর্জন করত। নিরীহ, ভীরু, দুর্বল প্রজাকুলের সাহস নেই রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়ার। বিশেষ করে যেখানে দেশের নতুন রাজা ও রানী স্বয়ং প্রজা সন্দর্শনে এসেছেন সেখানে তারা রাজা-রানীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে এমন অদ্ভুত ঘটনা সচরাচর হয় না। হয় না বলেই ভাবনা হয়। লঙ্কায় শক্তিমান, সুবিধাবাদী প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রচ্ছন্ন মদত ও চক্রান্তে

তারা রাজদর্শন বর্জন করেছিল। এর অর্থ গোটা দেশটাকে তার কব্জা করে রেখেছে। যুদ্ধের খরচ চালনোর জন্য লঙ্কেশ রাবণ গোষ্ঠী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে দেশকে বন্ধক দিয়েছে। কার্যত যুদ্ধের অষ্টআশি দিনের ভেতর এরাই দেশের মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। যুদ্ধের পরে এরা এক একজন খুদে রাজা হয়ে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবে এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের অন্তরে দৃঢ় হয়। তাদের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পেয়েছে তারা। দেশের সংকট সময়ে তাদের পাশে যারা সবসময় ছিল তাদের প্রতি আস্থা হওয়া কোন অন্যায় নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই ভাবনাটা মাথায় না রাখলে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই অশুভ শক্তির উত্থানকে রুখে দিতে না পরলে মিত্রবর বিভীষণের পক্ষে রাজত্ব করা অসম্ভব কার্য। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে সাধরণ মানুষের মনের দোরগোড়ায় পৌঁছানো। মনের বিরূপতার রঙ যতই ফিকে হয়ে যাবে ততই সাফল্য আসবে দ্রুত।

হনুমানের কথাগুলো মন দিয়ে সবাই শুনল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলার চেষ্টা করল না। রামচন্দ্রের কোন ভাবান্তর নেই। মাটির দিকে চেয়ে মুখ বুজে রইল। সুগ্রীব উদ্বিগ্ন মুখে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর জাম্বুমানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কী বলবে বল তো জাম্বুমান। সব দেখেশুনে মাথাটা আমার ঠিক নেই এখন।

আচমকা সুগ্রীবের এরকম একটা জিজ্ঞাসায় জাম্বুমান বেশ একটু বিব্রত বোধ করল। স্থির দৃষ্টিতে সুগ্রীব এবং বিভীষণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ব্যাপরটাকে লঘু করে দিয়ে বলল : আমি একথাটাই তোমার মুখে শুনব বলে আশা করছিলাম। কিন্তু জবাবটা কী দেব ভেবে কূল-কিনারা করতে পারছিলাম না। লঙ্কার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হনুমান যা যা বলেছে সবই ঠিক। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও দেশব্যাপী মানুষ তাদের মুষ্টিবদ্ধ। জনগণের উপর তাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এদের বাদ দিয়ে লঙ্কাতে কিছু করার চিন্তা দুরাশা। অল্প সময়ের মধ্যে জনতাকে কিছু পাইয়ে দিয়ে মন পাওয়ার কাজ খুবই কঠিন। যাদের নেই তাদের কিছু পাওয়া এবং যাদের আছে তাদের কিছু হারানোর ফলে একটা সংঘর্ষ বাধতে পারে। সংঘর্ষ এড়িয়ে কিছু করা মানে যার আছে তা পুরো থাকবে এবং বাড়বে, তার সঙ্গে যার নেই তার অবস্থার যদি পরিবর্তন হয় তাতে তাদের আপত্তি থাকবে না। এর অন্যথা হলে দুই শ্রেণীতে সংঘর্ষ অনিবার্য। এরকম একটা অবস্থায় আমরা বিভীষণকে, কে-কীভাবে সাহায্য করতে পারি শ্রীরাম নিজেই বলুন।

শ্রীরাম জাম্বুমানের আবেদন শুনে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, এমন চিন্তাকুল হলো তার মুখচ্ছবি যেন তার কথাগুলো শুনতে পায়নি। ফলে, কিছুক্ষণ এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। রামচন্দ্র জানে দুই শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী, তবু দু'জনকে না হলে দু'জনের চলবে না। পারস্পরিক সহযোগিতায় এক আদর্শ পরিস্থিতিতে দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু তার জন্য চাই একজন দক্ষ

প্রশাসক, যে অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ হবে। তার কাজ হবে উভয়ের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করে সহযোগিতা ও আপাসের পথে দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বিভ্রান্ত চোখে জাম্বুমানের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল : বিরোধটা ভাষা ভাষা। উন্নতি মানেই ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা। ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে যাদের হাতে ধন আছে তারা তো আরো ধনী হবে। যাদের হাতে তা নেই তাদের অবস্থা তো কিছু পরিবর্তন হবে। প্রয়োজন হলো তাল মিলিয়ে চলা। কাউকে বাদ দিয়ে বড় কিছু হতে পারে না। এক্ষেত্রে একই ঘাটে বাঘে গরু মিলে জল খাবে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নতুন পরিস্থিতি উপযোগী করে দেশের সম্পদ সমৃদ্ধিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা। মিত্রবর বিভীষণ মিছেই ভয় পাচ্ছে। জগতের মধ্যেও সর্বব্যাপী দুই বিরোধী শক্তির ক্রিয়া। চলা আর টানা। মুক্তি আর বন্ধন। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা এবং টানাটা কী আর কোথা থেকে, তাও জানি নে। কিন্তু একটা মহাদৌড়ের পেছনে আমরা সবাই দৌড়চ্ছি। সবাই সবকিছু নিয়ে একটা লক্ষ্যের দিকে চলেছে ; যত এগোচ্ছে লক্ষ্যের সীমানাও দিগন্তের দিকে তত সরে সরে যাচ্ছে। গতিই জীবনের নিয়ম। আমরা গতির টানে শুধু ছুটছি এক মহান দায়িত্বপূর্ণ কর্ম করার জন্য।

বিভীষণ নড়ে চড়ে বসল। মুখে চোখে তার একটা অসহায়ভাব ফুটে উঠল। কূট সন্দেহে ভেতরটা অশান্ত হলো। নিজের কাছেই এক অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন রয়ে গেল তার। রাজকোষে অর্থ কোথায়? অর্থ আসবে কোথা থেকে? এই ভাবনা বিচলিত করল তাকে। বুকে জুড়ে দেখা দিল ভয় এবং আশঙ্কা। মুখে প্রশান্তির ভাবটা মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা কঠোরতা ফুটল। সংকটের কথা বলতে একটু দ্বিধা হলো। বলি বলি করেও সে সামলে নিল নিজেকে। তারপর উদাস বিষণ্ন গলায় বলল : মানুষ বোধ হয় বৃহতের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, বড়র মাহাত্ম্য তাকে সম্মোহিত করে রাখে। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে সে অনেক কিছু করে এবং ভাবে। দেশের উন্নয়নের জন্য চাই বিপুল অর্থ। কিন্তু শূন্য রাজকোষে সে অর্থ কোথা থেকে আসবে? সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলছে না। কৌশলে বিষয়টা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ, সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভীষণের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। অর্থনৈতিক সহযোগিতা না পেলে বিভীষণের সংকট কাটবে না। যে তিমিরে আছে সেই তিমিরে থাকবে। আপনারা খুলে বলুন কার, কী অসুবিধে?

রামচন্দ্র সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান সবাই চিন্তামগ্ন। কেউ কথা বলছে না। বিভীষণ দেখল তাদের চোখে মুখে বিরক্তিকর এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে। প্রশান্ত কপালে হঠাৎই দুশ্চিন্তার গাঢ় কুঞ্চনরেখা ফুটে বেরোল। বুকে কোথায় যেন তাদের অক্ষমতার একটা কাঁটা বিঁধে আছে। বিভীষণের মনটা খারাপ

হয়ে গেল। নিজেকে তার ভীষণ বিপন্ন এবং একা মনে হলো।

মন্ত্রণাকক্ষে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। নীরবতা নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করে তোলে। বিভীষণ রামচন্দ্রের তদগত ভাব লক্ষ্য করে সতর্কভাবে চুপ করে থাকে। সময় বয়ে যায়।

বিভীষণের মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে তার বড় বিপন্ন এবং অসহায় মনে হলো। সবাই নিজের নিজের কথার জালে আটক পড়েছে। সেখান থেকে তাদের বেরনোর পথ বন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারল মুখ-সর্বস্ব উপদেশ ছাড়া মিত্রশক্তির কাছে আর কিছুই মিলবে না। তাই, এক অপরাধবোধে তারা মাথা হেঁট করে বসে আছে। চোখ তুলে তার দিকে তাকাতেও পারছে না। নিজের ভেতর বিপন্ন এক অসহায়তাকে দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে বজ্রের মতো এঁটে থেকে ভিতরকার সব আর্তনাদ, রাগ, বিরক্তিকে প্রাণপণে আটকে রাখল। অনেক ভেবে তার মনে হলো মিত্রশক্তি নিজেই রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাদের নিজের অর্থনীতিই বেহাল। তাদের কাছ থেকে কোনরকম অর্থনৈতিক সাহায্য প্রত্যাশা করা দুরাশা। এনিয়ে মিত্রশক্তির উপর রাগ বা অভিমান করা নিরর্থক।

হঠাৎ এরকম একটা অনুভূতি হওয়ার পর বিভীষণ আত্মগতভাবে নিজেকে শুনিয়েই কথাগুলো বলল। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথা ভাবছি। যুদ্ধে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কারো কম নয়। সকলের অর্থনীতিই ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থায় আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি দেখানো এবং সহযোগিতার পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কী বা করতে পারি ? আমরা সব ফুরিয়ে গেছি। শ্রীরামই আমাদের দুর্দিনের ভরসা। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কেবল অযোধ্যা আমাদের দিতে পারে। শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পরে সেকথা চিন্তা করা যেতে পারে। ততদিন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

বিভীষণের নরমে ও গরমে রচিত কূট ভাষণে রামচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ বিভীষণ তাকে দেয়নি। লঙ্কা-যুদ্ধে অযোধ্যার অর্থনীতির উপর কোন ধাক্কা লাগেনি, তাকে কোন মূল্য দিতে হয়নি। বিভীষণ সুকৌশলে সে কথাটা শুনিয়ে রাখল তাকে। আসাবধানে বিভীষণের মুখ দিয়ে কথাটা নির্গত হয়নি, খুব সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সে শ্রীরামের কাছে আর্থিক সাহায্যের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবি করল।

রামচন্দ্র এরকম একটা কথা শোনার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাই একটু চমকে উঠল। হতভম্বের মতো বিভীষণের দিকে নিজের বিস্ময় এবং অপ্রস্তুত ভাবটা চট করে গোপন করার জন্য একটু হাসল। সেই হাসিতে রোজকার দেখা রামচন্দ্র বদলে গেল হঠাৎ। ধীর স্থির শান্ত গলায় বললঃ তুমি যা করেছ দেশের জন্যই করছে। তুমি আমার একজন ভক্ত। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরও ভালো

লাগবে। লঙ্কার মানুষের চিত্তাকাশে আমার নামটাও শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।

বিভীষণ একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল। অনুরাগদীপ্তিও স্থির দৃষ্টিতে রামের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে একটু হাসল। সকলের দিকে ফিরে বললঃ আমি একথাটা শ্রীরামের মুখে শুনব বলে আশা করেছিলাম। আমার সে প্রত্যাশা পূরণ হলো। এখন এই আশ্বাসটুকুই আমার যথেষ্ট।

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বিভীষণের মুখটা আর একটু ভালো করে দেখল। একটু হাসল। তারপর বললঃ তা-হলে আজ এই পর্যন্ত। তোমার সংকটের সুরাহা তা-হলে একটা হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। এবার অযোধ্যায় ফিরতে আমার আর কোন বাধা নেই। একটা শুভ দিন দেখে আমাদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আয়োজন কর।

কথাগুলো বলে রামচন্দ্র গাত্রোত্থানের জন্য উঠে দাঁড়াল। তার ওঠা দেখে অন্যেরাও যান্ত্রিকভাবে উঠে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

যুদ্ধের পরে মিত্র বাহিনীর সাহায্যে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এক বিপুল সংখ্যক বানর সৈন্য এবং তাদের সেনাপতিরা মাসাধিককাল ধরে লঙ্কায় অবস্থান করছে। এছাড়া রাজ্যের বিশেষ অতিথিরূপে সমাদৃত হচ্ছেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা-সহ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান প্রমুখ ব্যক্তিরা। এঁদের প্রত্যেকের ভরণ-পোষণ এবং আপ্যায়নের জন্য বিপুল অর্থব্যয় হতে লাগল। লঙ্কার বেসামাল অর্থনীতি এই ব্যয়ভারের দরুন একেবারে ভেঙে পড়ল। দেশ জুড়ে খাদ্যের আকাল দেখা দিল। চরম খাদ্যাভাবে ধুঁকতে লাগল দেশের মানুষ।

এরকম একটা সর্বব্যাপী সংকট বিভীষণকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোন রাস্তাও. দেখতে পেল না। চিন্তায় চিন্তায় বিভীষণের পাগল হওয়ার অবস্থা। দুঃসময়ে তার পাশে কোন বান্ধব নেই, মন্ত্রণাদাতা নেই। এমন কি রামচন্দ্রও নেই। সে একেবারে একা ভীষণ একা।

দেশের মানুষের মনে তার কোন ভাবমূর্তি নেই। রামচন্দ্রই জনগণের মনে তার ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য সৎ-ধার্মিক, আদর্শবান একজন বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিকের যে মূর্তিই গড়ার চেষ্টা করুন না কেন, তাতে লঙ্কার মানুষ ভুলল না। তাদের চোখে সে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং জনগণের শত্রু। রামচন্দ্রের মনোনীত একজন প্রতিনিধি স্থানীয় রাজকর্মচারী। রামের হাতের পুতুল। তার নিজের কোন ইচ্ছে, অনিচ্ছে কিংবা স্বাধীনতা নেই। থাকলে, অনেককাল আগে বানর সৈন্যদের দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করতে পারত। জগদ্দল পাথরের মতো লঙ্কার ঘাড়ে চেপে বসেছে। মিত্রবাহিনী

এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গ লঙ্কার বোঝা। এদের ভার হালকা করার কোন চেষ্টাই করছে না বিভীষণ। রামচন্দ্রকে সে কথা খুলে বলার সাহস বিভীষণের হয় না বলেই তার উপর সন্দেহটা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। রামচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে তার কাছে কী চায় বিভীষণও বোধ হয় ভালো করে জানে না। লঙ্কার ভেঙে পড়া অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার আরো অবনতি ঘটিয়ে বিভীষণকে একটা রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রাখতে চায় রামচন্দ্র। যতদিন যেতে লাগল লঙ্কাবাসীর মনে এই ধারণাটাই দৃঢ় হলো। বিভীষণের সে কথাটা না বোঝার কথা নয়। কিন্তু বিভীষণ যখন কিছুই করছে না, তখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভেবে রামচন্দ্র এবং মিত্রবাহিনীর উপর তার নির্ভরতা বাড়ছে। তার বিশ্বাস, এরা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার কোন বিপদ নেই। এরা চলে গেলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থই বড় হলো বিভীষণের। যে কোন মূল্যে ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকা এবং আগলে রাখাই তার আদর্শ।

লোকে যা খুশি ভাবতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যা ইচ্ছে তাই করা তাকে মানায় না। শোভাও পায় না। লঙ্কার মর্যাদা, গৌরব, সুনাম নষ্ট হয় এমন কোন কাজ বিভীষণ করতে পারে না। রামচন্দ্র এবং বানর বাহিনীর বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেললে সেও একটু স্বস্তি পায়।

রামচন্দ্র এবং বানরপ্রধানেরা স্বচক্ষে লঙ্কার দুরবস্থা এবং ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাওয়ার কোন উচ্চবাচ্য নেই। এরকম অবস্থায় বিভীষণ অতিথিদের কী করে লঙ্কা ছেড়ে যেতে বলে ?

অনেক করেও শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুত হয়ে তাকে অসহায়ের মতো রামকে বলতে হলো শুনতে পাচ্ছি, অযোধ্যায় ফেরার জন্য রঘুনাথ নাকি ব্যস্ত হয়েছেন। লঙ্কায় ক্লান্তি বোধ করছেন। মহামান্য সুগ্রীব নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের তাড়া অনুভব করছেন। মিত্রবাহিনীর সৈনিকেরা বহুদিন ঘরছাড়া ; ঘরমুখী মন তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। এ অবস্থায় নিজের স্বার্থে আপনাদের সকলকে আর কতদিন ধরে রাখব ? আমি চাইলেও আপনারা আমার কথা কেউ শুনবেন না। সুতরাং কী আর করব ? আপনার অনুমতি পেলে যাত্রার সব আয়োজন করতে পারি।

বিভীষণের নরমে গরমে মেশানো মনগড়া চতুর কথাবার্তা শুনে রামচন্দ্র থ হয়ে গেল। প্রকারান্তরে তাকে এবং বানরদের লঙ্কা ছেড়ে যাওয়ার কথাই বলল। আশ্চর্য ! রামচন্দ্র এসব কিছুই বলেনি এবং ভাবেনি। অথচ, বিভীষণ নিজের অসুবিধেটা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে কী অবলীলায় মিথ্যে বলে তাকে চমকে দিল। একটার পিঠে আর একটা কথা এমন যত্নে এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে বসাল যে রামচন্দ্র অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে চেয়ে রইল। নিজের অজান্তে তার মুখে হাসি ফুটল। বিভীষণকে অপদস্থ করার কোন ইচ্ছে রামের ছিল না। তাই বিষণ্ন কণ্ঠে বললঃ অনেকদিন হলো। তোমার রাজ্যপাট গুছিয়ে নিয়েছ। আমাদের দরকার তোমার কাছে

ফুরিয়েছে। আমরাও স্বদেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। চোদ্দটা বছর অযোধ্যা ছাড়া হয়ে আছি। সেখানে গিয়ে কী দেখব কে জানে! মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের বাঁচালে।

রামের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে বিভীষণও হাসল। দু'জনের হাসির অন্তরালে যে নাটক হয়ে গেল রামচন্দ্র এবং বিভীষণ ছাড়াও আরো একজন দর্শক অন্তরীক্ষ্যে ছিল সে হলো তাদের ভাগ্যদেবতা। বিভীষণ স্বগতোক্তির মতো বললঃ যা কিছুই ঘটে সবই আগেই ঠিক করা থাকে, সব কিছুরই মানে থাকে। এক অদৃশ্য হাতই সব কিছু পরিচালনা করে। আমি তো নিমিত্ত।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দিন যত নিকটবর্তী হতে লাগল ততই বিভীষণ ভাবিত হয়ে পড়ল। প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় আয়োজন করা একটা শ্রমসাধ্য এবং ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। কাজটা খুব ছোটখাট নয়। তার জন্য অনেক পরিকল্পনা দরকার ছিল। বিপুল বানর সৈন্যবাহিনীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে ক্রমে ক্রমে তাদের কিষ্কিন্ধ্যায় ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। সর্বশেষ দলটি লঙ্কা থেকে বিদায় নিতে চার পক্ষকাল সময় লাগবে। প্রথম দলটি বানর প্রধানদের সঙ্গে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবে। তারপর অন্য দলগুলিকে ফেরত পাঠানোর কাজ আরম্ভ হবে।

এদিকে রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সংগ্রামের গৌরবময় সাফল্যের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত করে তোলার জন্য কী করলে ভালো হয় তার সব দায়দায়িত্ব বিভীষণের উপর ন্যস্ত করা হলো। রামের প্রত্যাবর্তনকে রাজকীয় আড়ম্বরে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার জন্য বিপুল অর্থ চাই। কিন্তু সে অর্থ কোথা থেকে, কীভাবে আসবে? কে দেবে সে অর্থ? এসব ভাবনা চিন্তায় তার ভেতরটা অস্থির হলো। রাজকোষ শূন্য। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, লোকের হাতে অর্থ-নেই, রাজস্ব দেবার সঙ্গতি নেই, দুবেলা দুমুটো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা নেই— এক দুঃসহ অসহায় অবস্থার মধ্যে বিভীষণের দিন রাত কাটে। মাঝে মাঝে কান্না পায়। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়তো কিছু স্বস্তি পেত। শান্ত করার লোকও পেত। কিন্তু সেটা পারছে না বলেই দুশ্চিন্তার বোঝাটা তাকে একা বইতে হচ্ছে।

রাজ-অতিথির বিদায়দানের সময় তাঁর সম্মানে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন দেওয়ার যে প্রাচীন রেওয়াজ আছে তার কী করবে? রত্নের ভাণ্ডারে উপঢৌকন দেবার মতো রত্নের অভাব। বিভীষণের পাগল হওয়ার অবস্থা। কী করবে ভেবে কূলকিনারা করতে পারল না।

বিভীষণের মনের অবস্থা ভালো না। বারংবার মনে হতে লাগল, ঈশ্বর তাকে পাপের শাস্তি দিচ্ছে। নইলে এরকম সংকটে পড়বে কেন? প্রত্যেক মানুষকে তার

কর্মফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করে কারণ হয়তো মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। নিজের খেয়াল-খুশিতে কিংবা ক্ষুদ্র স্বার্থে যা খুশি তাই করা যায় না। করলে, সারা জীবন ধরে দায়িত্বচ্যুত হওয়ার মূল্য দিতে হয়। তখন আপসোস চলে না আর। কোন কৈফিয়তে কিংবা ব্যাখ্যাতে দুষ্কৃতির ক্ষমা হয় না। কলঙ্কের দাগ একবার লাগলে তা আর মোছে না।

রামচন্দ্রের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব লঙ্কাবাসীর অন্তরে তার যে ভাবমূর্তিই খাড়া করল তা হলো একজন সৎ, ধার্মিক, আদর্শবান এবং নীতিপরায়ণ মানুষের। বিভীষণের নিজেরই সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। নিজের বিবেকের কাছে তার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। এই মুহূর্তে যে মানুষ নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছে না, সে অন্যের ক্ষমা প্রত্যাশা করবে কোথা থেকে? লঙ্কাবাসী তার পাশে যদি না দাঁড়ায়, সে দোষ তাদের নয়; তার কৃতকর্মের ফল।

কথাটা বিভীষণের মনের ভিতর পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল। কৃতকর্মের কথা মনে হলে কিছুকাল আগের কথা মনে হয়। প্রিয়তম-ভগিনী শূর্পনখা নিজের রাজ্য দণ্ডকারণ্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লঙ্কা উত্তাল হয়ে উঠল। একজন রাক্ষস রমণীকে সম্ভ্রমহানি করার যন্ত্রণার উত্তাপ লঙ্কাবাসীর গায়ে লাগল।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাক্ষস জাতির স্বাজাত্যবোধকে মূলধন করে রাবণ লক্ষ্মণের নারী নির্যাতনের ঘটনাকে লঙ্কাবাসীর জাতীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে এক অভিনব রাজনীতির সূচনা করল। সম্ভ্রামহানির বদলা সম্ভ্রমহানি করে নেওয়ার জঙ্গি মনোভাব রাবণ নিয়েছিল সভাসদবর্গ একবাক্যে তা সমর্থন করল। ফলে, সীতা হরণের মতো একটা ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে গেল। বিদেশী আর্যশক্তির সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হলো। নারীর অসম্মান নিয়ে রাবণ ও রামের মর্যাদার লড়াই শীঘ্রই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হবে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বিভীষণ এটা বুঝেছিল। যে কোন দুষ্টু কূটবুদ্ধি কিংবা কোন হীন চক্রান্ত করতে বিভীষণের মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। বাইরে থেকে তার নিরীহ, ভালোমানুষী মুখের পানে তাকিয়ে কখনো মনে হবে না এমন তীক্ষ্ম কৌশলজ্ঞানের অধিকারী সে।

রাবণ শান্ত স্বভাবের এই ভাইটি সম্পর্কে উদাসীন ছিল। রাজসভাতেও কিংবা মন্ত্রিসভায় তার কোন গুরুত্ব ছিল না। এমন কি কোন একটি অঞ্চলের দেখাশোনার কর্তৃত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিল না। নিজেকে বিভীষণের খুব উপেক্ষিত মনে হতো। অবমাননার দুঃখ-কষ্টে আর মনটা আর্ত হয়ে ছিল। অনাদর, অবহেলার পথ ধরেই তার মনে ক্ষমতা লিপ্সার বাসনা প্রবল হলো। বুদ্ধিতে, কর্মক্ষমতায় রাবণের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এটা জানান দেবার জন্য ভেতরের অতৃপ্ত অস্থিরতা তাকে অশান্ত করে তুলল। সরমা ছাড়া আর কেউ সে ব্যথার খবর জানত না।

একদিন সরমাই তাকে বললঃ যত দিন যাচ্ছে তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বল না। সব সময় বিড় বিড় করে কি যেন বল। অন্তঃপুরে লোকজন তোমাকে দেখে আড়ালে হাসে। পাগল বলে। তুমি তো এমন ছিলে না।

বিভীষণ অবাক চোখ মেলে সরমার দিকে চেয়ে রইল। স্মিত হাসি ফুটল অধরে। বললঃ তোমার রাজরানী হতে ইচ্ছে করে না।

সরমা চমকে তাকিয়ে থাকে। বিভীষণ বোধ হয় সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে ভেবে রাগটাকে সামলে দরদী গলায় বললঃ কত ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু সবার সব কি পূরণ হয়!

বিভীষণ হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বললঃ একজন মনেপ্রাণে চাইলে নয়কে হয় করতে পারে। একান্ত করে চাওয়াটাই সব।

সরমা তর্ক করল না। অবজ্ঞার হাসি হাসল। বললঃ একটা সামান্য মন্ত্রী হওয়ার সাধ পূরণ হলো না যার, সে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখে কী করে? সংসারে অনেকরকম পাগল আছে। তুমি তাদের একজন।

আহত বেদনায় দুচোখের পাতা সহসা ভারী হয়ে উঠল। বিমর্ষ গলায় বললঃ সরমা, অবহেলা করে আমাকে সরিয়ে রেখ না, আমার ভেতর অনেক ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেটা অগ্রজের জন্য কারো চোখে পড়ল না। বিখ্যাত কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তির ভাই হওয়াও দুর্ভাগ্যের। তার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যের পাশে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো মিট মিট করে তারা। কিন্তু তারাও যে নিজের ক্ষেত্রে এক বিশাল নক্ষত্র, লোকে সেটা আমল দেয় না। কাছের তারা বলেই ধ্রুবতারার খাতির। মানুষের কাছে দূরের নক্ষত্রদের কোন আলাদা নাম নেই, সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই; তাদের বিশালত্বের দাবি নিয়ে নিজের মতো করে কোন পরিচিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। আমার ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা, প্রতিভা থাকলেও অগ্রজের জন্য তা স্বীকৃতি পেল না। লোকে তাকেই ভয় করে, স্তুতি করে। অগ্রজ নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তাই, আমার সামনে তাকে নীরবে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই সরমা। কেবল একটা পথই খোলা আছে তা বিদ্রোহের এবং বিনাশের। হয়তো এই পথেই আমার ভাগ্য ফেরানো সম্ভব, অথবা দুর্ভাগ্য আমার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ হবে। দেখবে, একদিন বেপরোয়া হয়ে সব ভয় জয় করে নিজের ভাগ্যের অন্বেষণে একা বেরিয়ে পড়েছি।

সরমা অবাক হয়ে দেখল তার শান্ত স্বভাবের নিরীহ স্বামীদেবতার চোখ দুটি প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকারে জ্বলজ্বল করছে। তার মুখে ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, তীব্র অসহিষ্ণুতায় ভালো-মন্দের বিচারবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে সে নিচে নেমে যাচ্ছে। তার উত্থান কিংবা পতন সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। সে শুধু দয়া থেকে করুণা, অনুগ্রহ, উপেক্ষা, অসমাদর থেকে মুক্তি চায়। আদর্শবাদ

তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ন্যায়, নীতি, কিংবা ধর্মকে অপরিহার্য বলে বোধ হয় না, পালনযোগ্য মনে করে না। এ কোন বিভীষণকে সরমা দেখছে? চিরচেনা বিভীষণকে তার ভীষণ অচেনা মনে হয়। নিজের অজান্তে বুক কাঁপিয়ে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেরিয়ে এল। বললঃ স্বামী স্বপ্ন দেখে মন খারাপ করার যন্ত্রণা আমি সইতে পারব না।

হতাশ দৃষ্টিতে বিভীষণ সরমার দিকে চেয়ে বললঃ সরমা তুমি চাও না আমি রাজা হই?

সরমার ভেতরটা আনন্দে, উদ্বেগে, ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে গেল কয়েকবার। উৎসুক চোখে বিভীষণের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সম্মোহিতের মতো বললঃ চাই। ভীষণভাবে চাই। কিন্তু কী করে সম্ভব হবে আমার মাথায় আসে না।

একফালি প্রত্যাশার হাসি উজ্বল হয়ে বিভীষণের ঠোঁট ছুঁয়ে রইল। বলল: জানি না।

সরমার আত্মবিস্মৃতি এক ঝটকায় কেটে গেল। ঝম করে মাটিতে পড়ল যেন পা। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। হঠাৎই তার ভেতরটা কঠিন হয়ে উঠল। বললঃ তুমি নিজেকে নিয়ে যা খুশি পাগলামি কর, আমাকে তার মধ্যে টেনে এন না।

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে বিভীষণ জিগ্যেস করলঃ একথা বলছ কেন?

সরমা শান্ত স্বভাবের স্বামীটিকে নতুন করে কোন উদ্বেগে ফেলতে চায় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য পাছে কোন বিপদ তাড়া করে আসে তাই একটু নির্দয় হলো। বললঃ কেন? আসলে তুমি ভীরু, অক্ষম, অযোগ্য। তোমার পৌরুষ চরিত্রই নয়। তুমি শুধু স্বপ্ন দেখ। আর স্ত্রীর কাছে নিজের যোগ্যতার বড়াই করে একটা কেউকেটা হয়ে ওঠ।

কথাগুলো বিভীষণের বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ বাড়িয়ে দিল। মনমরা বিষণ্ন গলায় বললঃ হয়তো তাই। কিন্তু তুমি দেখ, যে গৌরব, সম্মান, মর্যাদা আমায় কেউ দেয়নি তা একদিন আমি ছিনিয়ে নেব। যদি না পারি ভেঙে টুকরো টুকরো করব তাকে। মরবার আগে তুমি দেখে যাবে তোমাকে সবার উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছি।

সরমা মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনল। জবাব দেবার ভাষা তার নেই। হয়তো বিভীষণের অঙ্গীকার শুনে অন্য এক নারীকে তার ভীষণ মনে পড়েছিল। সে নারী মন্দোদরী। চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল সরমা। শরীরের গভীরে একটা অবসাদ টের পাচ্ছিল। মন্দোদরী যে বিভীষণের জীবনে কতখানি জুড়ে আছে তা যেন এতদিনে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করল। দু'চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছিল।

বিভীষণ একটু আশ্চর্য হয়ে মৃদুস্বরে বললঃ সরমা অত চোখের জল ফেলছ কেন?

চোখ বুজে রেখে সরমা বললঃ বেঁচে আছি বলেই দুঃখে আনন্দে বেদনায় চোখে জল আসছে।

কেন ?

একটু হেসে সরমা চোখ খুলে মুখ তুলে বিভীষণের দিকে তাকাল। বললঃ একজন শত্রু আছে আমার। মাথা থেকে যে আমার রানীর মুকুট কেড়ে নেবে। তাই মুকুটে আমার লোভ নেই। আমি চাই তোমাকে গলার হার করে রাখতে। রানী হওয়ার কোন বাসনা নেই। তুমি রাজা হলে আমার সুখ নেই। তাতে দুঃখ যন্ত্রণাই পাব শুধু।

বিভীষণ স্তব্ধ হয়ে শুনল তার কথা। সরমার দুঃখের উৎসটা কোথায়, কিসের যন্ত্রণা, তার কিছু আঁচ পেয়ে ভয়ে চুপ করে রইল। মন্দোদরীর মুখখানা নয়নপটে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর মন কণ্টকিত হয়ে উঠল পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। বিভীষণের মুখে চোখে একটা চাপা সুখ ডগমগ করছিল। চোখের দৃষ্টিতে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবও ছিল। একটা ঝিমঝিম নেশাড়ু মাদকতায় সে হাসতে হাসতে সরমাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। এই মুহূর্তে সরমা বাস্তব সত্য। স্বপ্নের রানী মন্দোদরী স্বপ্নেই বাস করে। মনেতে তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া বিভীষণের আর তো কোন উপায় নেই।

সরমা বিভীষণের গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগের গলায় বললঃ এই তুমি আমার কথায় রাগ করছ? তোমার রাজা হওয়ার জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। সে আমি সহ্য করতে পারব না। সরমার বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উঠতে চাইছিল। জোর করে চাপা দিয়ে বলল : আমার ভয় মন্দোদরীকে। আমার পথের কাঁটা।

তার কথায় বিভীষণ হাসল আবার পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল : আমাকে রাগ করতে নেই। বরং তুমি নিজেকে নিয়ে একটু ভাবলে আমার দুশ্চিন্তা যায়। মানে গোটা ব্যাপারটা একটা খেলার হারজিতের মতো সহজভাবে মেনে নিলে আর কোন যন্ত্রণাই থাকবে না।

কথাটা শুনে সরমার বুক কেঁপে উঠল একটু। দুঃসংবাদ শোনার মতো সে স্তব্ধ হয়ে রইল। চোখে তার তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টি, রাগে অপমানে অস্বাভাবিক জ্বল জ্বল করতে লাগল। বিভীষণ সর্বাঙ্গ দিয়ে সেই দৃষ্টির তাপ অনুভব করল।

আচমকা একটা মেয়েলি হাতের নরম ছোঁয়া পেয়ে বিভীষণ চমকে উঠল। নিমেষে তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। স্পর্শের ভেতর মন্দোদরী তার শরীরের কম্পন অনুভব করল। কেমন একটা লজ্জা পেল। নিভৃতে বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিন্তাটাই তার কাছে অত্যন্ত গর্হিত এবং অস্পৃশ্য মনে হতে লাগল।

বিভীষণ অপলক তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সোহাগ রাতের পর মন্দোদরীর

সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। এর মধ্যে মাসাধিককাল কেটে গেছে। স্বপ্নের মন্দোদরী নিজে এসেছে যেচে। হঠাৎ তার আগমনের কারণটা জানার জন্য মনটা বিভীষণের আঁকুপাকু করতে লাগল।

চাঁদের আলোয় ভরে গেছে ছাদটা। নীল আকাশের নক্ষত্রের চুমকি পরানো চাঁদোয়ার নিচে তারা দু'জন। গাছপালা, নক্ষত্রেরা উন্মুখ হয়ে নিরীক্ষণ করে তাদের।

মন্দোদরীর কথা বলতে সংকোচ হলো। কেমন একটা দ্বিধা নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দোদরী। ওভাবে চুপচাপ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিভীষণ একটু হাসল। মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলল : চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলবে আমায়? সোহাগ রাতের পর এই প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হলো। কিছু বলতে এসেও চুপ করে আছ। তুমি খামোকা আমার উপর রাগ করে আছ।

মন্দোদরী অন্যমনস্কভাবে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল। ভুরু কুঁচকে যতদূর সম্ভব কঠোর মুখভঙ্গি করে বলল : আমি ভাবছি, প্রাসাদের এত ঘরের ছাদ পড়ে থাকতে আমার ঘরের ছাদটা বেছে নিলে কেন? এ ঘরের ছাদটা তোমার কি খুব ভালো লাগে?

বিভীষণের অধরে স্মিত হাসি। বলল : এই কথাটা জানার জন্য এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে আমার কাছে আসতে হলো?

মন্দোদরী একটু বিষাদের সঙ্গে হাসল। বলল : চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি তোমার মতো পরিমাপ করে দেখার জন্য নিশ্চয়ই ছাদে উঠিনি। তোমার দর্শন পাওয়ার কোন লোভও আমার নেই। একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মতো এদেশের রাজার কাছে এসেছি।

বিভীষণ অন্যমনস্ক। এসব কথা কিছুই তার কানে গেল না। মন্দোদরীকে দেখা থেকে তার সমস্ত শরীর শাঁখের মতো বেজে উঠল। ভেতরে ভেতরে তার একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল। ভিতরকার অসহনীয় তাপে তার মুখ তাম্রাভ হয়ে গেল। চোখ দুটোয় পাগলের চোখের মতো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। মুখ চোখও কেমন অন্যধারা হয়ে গেছিল। ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। ঐ হাসির অর্থ মন্দোদরী জানে। কিন্তু তার সাবধান হওয়ার আগে আচমকা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে জোর করে তাকে একটা চুমু দিল। মন্দোদরী বিরক্ত হয়ে নিজেকে তার বাহুবন্ধন থেকে আপ্রাণ ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, আর বলল : ছাড়ো, ছাড়ো। লাগছে। ছিঃ— বলে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে রাগে অপমানে কাঁপতে লাগল।

বিভীষণের বেহায়া নির্লজ্জপনা দেখে তার ভিতরটা ঘেন্নায়, অপমানে, বিরক্তিতে তেতে উঠল। ভিতরকার উৎকণ্ঠায় কিছুক্ষণ বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগল। উত্তপ্ত গলায় ঘৃণা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণার বাতাস লাগিয়ে বলল : খবরদার, আমাকে ছোঁবে না তুমি। তোমাকে আমার ঘেন্না করছে। এই বয়সেও ইচ্ছে করে? ছিঃ।

বিভীষণ রাগল না। লুব্ধ মন এই তিরস্কার, ভর্ৎসনা, প্রত্যাখ্যানের ভালোমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। বলল: মন্দোদরী তুমি আমার স্বপ্নের রানী। তোমাকে বাস্তবে পাওয়ার জন্য আমার ভিতরটা পাগল হয়ে উঠেছে। তোমার উপর আমার অধিকারটুকু হারাতে পারব না। সেই ভয়েই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি প্রতিমুহূর্তে।

মন্দোদরীর ভুরু কুঁচকে গেল। ঘেন্নায় ঠোঁট বেঁকে গেল। বলল: আমি নাটক পছন্দ করি না। এই যে দেখছ তোমার রানী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আমার ছদ্মবেশ। সব সময় মনে হচ্ছে আমি অন্য এক নারী চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি মাত্র। সারাজীবন নিজের সঙ্গে অভিনয় করতে পারব না। মনে রেখ তোমার সঙ্গে বাস করব স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে নয়।

বিভীষণ একটু অবাক হয়ে বলল : কী বলছ মন্দোদরী?

তোমাকে আমি স্নেহ করি দেবরের মতো। তোমার চাওয়ার মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নেই। তুমি চাও আমার দেহটা। আমি কি দেহসর্বস্ব জীব? শরীর ছাড়া আমার কাছে তোমার চাওয়ার আর কিছু নেই! তোমার সঙ্গে একজন পশুর কোন তফাত নেই।

কথাটা শুনে বিভীষণের আপাদমস্তক জ্বলে গেল অপমানে। এই রমণীর প্রতি তার কিছু দুর্বলতা ছিল বলেই সে উত্তপ্ত হতে পারল না। মিন মিন করে বলল: মন্দোদরী রাগের বশে কী বলছ, তুমি জান না। তোমার মনটা একজায়গায় আটকে গেছে। নানা সংস্কার কাজ করছে।

বিতৃষ্ণায় মন্দোদরীর ঠোঁট দুটো কথা বলার সময় একটু কুঁচকে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: হুঁ, শালীনতাবোধ বাদ দিয়ে, ভদ্রতার ধার না ধরে সংস্কারভাঙা আর ভালোবাসার যে নমুনা দেখালে তাতে তোমাকে কেউ সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ বলবে না।

অসহায়ের মতো নিজের দোষ ঢাকার জন্য বিভীষণ বলল : মন্দোদরী ধর্মত তুমি আমার স্ত্রী। আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর।

মন্দোদরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল : কক্ষনো নয়।

নয়! বিভীষণের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

তেজের সঙ্গে মন্দোদরী বলল : না। আমি এরকম করে তোমাকে ভাবতে পারি না। পুরুষ মানুষ যা সহজে পারে একজন মেয়ে তা পারে না। সত্যিই তার মধ্যে অনেক সংস্কার কাজ করে।

মন্দোদরী, আমাকে তা-হলে কী ভাবো?

এরপরও নতুন করে বলার কিছু আছে? তোমার সঙ্গ-সান্নিধ্য কিচ্ছু ভালো লাগে না আমার। কোনো আবেগও কাজ করে না।

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে হতাশ গলায় অপরাধীর মতো বলল : আচ্ছা,

আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি। তোমার মনের অবস্থাটা না জেনে ভুল করেছি। এবারের মতো আমাকে মাপ করে দাও।

মন্দোদরীর চোখে কৌতুক, অধরে হাসি ফুটল। বলল : দেহ ছাড়াও মন্দোদরীর যে মন আছে সেটা বেশি করে মনে রাখলে খুশি হব।

মন্দোদরী তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না। আমার উপর রাগ পুষে রেখ না। একটা কথা মনে রেখ, তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি আমি। নারী-পুরুষের ভালোবাসা কী দিয়ে বোঝাব, যদি দেহ রয় নিরুত্তর। তাই একটা অন্যায় করে ফেলেছি। তোমাকে কোনদিন যদি ছুঁতে না দাও মেনে নেব, কিন্তু রাগ করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যেও না। তুমি শুধু আমার বুক ভরে এই কথাগুলো বলতে পারলেই আমি ধন্য হয়ে যাব।

বিভীষণের দিকে চেয়ে মন্দোদরী একটু মুচকি হাসল দয়া করে। বলল : ভালোবাসার কথা অত বলতে নেই। মুখে বলে যে ভালোবাসা বোঝাতে হয়, সে ভালোবাসা থাকে না, নোংরা হয়ে যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভীষণের মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল : অনেক কথা হলো। কিন্তু যা বলতে এসেছিলাম তা বলা হলো না। বলার মতো মন নেই। সে ইচ্ছেটাই মরে গেছে। কিছু ভালো লাগছে না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আমি যাচ্ছি।

সহসা বিভীষণ দুহাত জোড় করে বলল : দোহাই তোমাকে; রাগ করে থেক না। আমি বুঝতে পারিনি যে এক পাথরের প্রতিমাকে রক্তমাংসের নারী ভেবে নিজেকে নিবেদন করেছিলাম। কিন্তু সে যে শুধুই পাথর; ঠোক্কর খেয়ে জখম হব একবারও ভাবিনি। অনেক মূল্য দিয়ে বুঝলাম, পুরুষরা মেয়েদের কাছে হঠাৎ কী চায় কখন নিজেও জানে না তারা। মাঝে মাঝে চাওয়াটা আকাশে উঠে যায়। পুরুষ মানুষের স্বভাবের এই দোষটুকু তুমি মার্জনা কর। যা বলতে এসেছিলে তা না বলে চলে গেলে আমার ভালো লাগবে না। নিজেকে বড় অপমানিত মনে হবে।

তোমাকে অপমান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। রাবণ-মহিষী সম্রাজ্ঞী মন্দোদরীর বুকে রাবণের পবিত্র প্রেমের কুসুমগন্ধী স্মৃতির সৌরভ যতদিন থাকবে, রাবণের দেশের সম্মান, মর্যাদা, গৌরব ততদিন ক্ষুণ্ন হতে দেব না। রাবণের অবর্তমানে সত্যি দেশ বিপন্ন। রাবণের শত্রু, দেশের শত্রু। রামচন্দ্র এবং বানর প্রধানেরা এদেশের শত্রু হলেও নতুন শাসকের সম্মানিত অতিথি। যথোচিত মর্যাদায় স্ব-স্ব দেশে তাদের ফেরত পাঠাতে না পারলে লঙ্কার গৌরবহানি হবে। তার অপমান হবে। সে অপমান সম্রাজ্ঞীরও। এসময়ে রাগ-অভিমান করে দূরে থাকতে কি পারি ? রানী হয়ে তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

বল। আমাকে সুপরামর্শ দেবার মানুষ নেই। তুমি যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছ

তাতেই আমার পাওয়ার ঘর ভরে গেছে। আমায় কেউ বুঝল না, এটাই দুঃখ।

মন্দোদরীর ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। বলল: বড় দেরি করে বুঝলে। পথ একবার ভুল বেছে নিলে শোধরাবার উপায় থাকে না। সেই সব নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তিও বড় কঠিন। এ শাস্তি কাউকে দিতে হয় না। নিজের জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হয় নীরবে, নিভৃতে। তোমার কাছে নাগরিকদের আগামীকালের কোন ভরসা কিংবা প্রত্যাশা নেই।

কথাগুলো বিভীষণের বুকে তীরের মতো বিঁধল। তীর বিদ্ধ পাখির মতো করুন চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। তার পলকহীন অসহায় দুই চোখের দিকে চেয়ে বলল: তোমার মান-অপমান নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। লঙ্কার প্রজাকুলের রানী আমি। দেবীর মতো তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার বিবেক তাদের জন্য ভাবতে বলল। শত্রু হলেও রামচন্দ্র আমাদের অতিথি। বিদায়কালে তাঁকে সমাদর না করলে লঙ্কাবাসীর অপমান হবে। রাজকোষে কিংবা রত্নভাণ্ডারে পর্যাপ্ত অর্থ এবং উপহার উপঢৌকন দেবার সামগ্রী নাও থাকতে পারে। কিন্তু দেশের ঐশ্বর্যবান মানুষদের ঘরে তার অভাব নেই। আমি বলি কি এদের সকলকে রাজসভায় আহ্বান করে একটা উপায় খুঁজে বার করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হোক। এই দায়িত্ব পেলে তারা সম্মানিত বোধ করবে। দেশের সংকটকালে বিশিষ্ট নাগরিকরাও স্বেচ্ছায় কিছু অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকে। দেশ তো একা রাজার নয়। সমস্ত দেশবাসীর। তাই দেশের সম্ভ্রম বাঁচাতে তারা হাত বাড়িয়ে দেবে। কেউ গুটিয়ে নেবে না।

ভুরু কুঁচকে বিভীষণ একটু ভাবল। মাথা নেড়ে স্তিমিত গলায় বলল: তোমার প্রস্তাব খুব ভালো। কিন্তু বিনা স্বার্থে তারা সাহায্য করবে কেন? রাজার সম্মানহানি করে লাভ কী?

দপ করে জ্বলে উঠল মন্দোদরী। বিভীষণের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে রাগে, ঘেন্নায় তার মনটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। ঠোঁট কামড়ে ধরে বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: আশ্চর্য! রাজার সম্মান কিছু আছে? যেটুকু সম্মান এখনও অবশিষ্ট আছে তা দেশের। সেটুকু গেলে লঙ্কার গর্ব করার মতো কী থাকল? সকলকে তোমার মতো ভাবছ কেন? দেশের জন্য মানুষ। সে দেশ গেলে একজন মানুষের গর্ব করার মতো কী থাকল? এমন কি নিজের অস্তিত্ব থাকবার কথাও নয়। দেশ থাকলে সে যে বেঁচে আছে, তার পায়ের তলায় মাটি আছে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই আছে, নিজের বলে মনে করার কিছু আছে - এটাই তার প্রেরণা, এই বিশ্বাস তাকে নতুন জীবন দেয়।

বিভীষণের বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। অনুতাপ, অনুশোচনার যন্ত্রণার গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। অপরাধবোধে সে কেমন বোবা হয়ে গেল। প্রত্যুত্তর করে না। অপমানে পুড়ে যেতে লাগল তার ভেতরটা। নিবিষ্ট হয়ে

সে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। মনে হলো, আরো অন্ধকারের ভেতর ডুবে যেতে পারলে বাঁচতো। মন্দোদরী যা বলছে তাতে তার গৌরব নেই, আছে অপমান।

তাকে নিরুত্তর দেখে মন্দোদরীর ভেতরটা রাগে জ্বলে যেতে লাগল। ভীষণ অপমান লাগল। মনটা বড় নিষ্ঠুর হলো। বলল : আমার কথার কোন জবাব পেলাম না। একটা কথা তো বলবে?

বিভীষণ নিস্পৃহ গলায় বলল : তোমার কথার উপর কি আমার কোন কথা থাকে বল? তোমার কথা না শুনে আমার লাভ কী? সামনে আমার মর্যদার লড়াই। সাফল্যটা সেখানে বড় কথা।

মন্দোদরীর বুকে অভিমানের তুফান উঠল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বলল : দেশের কাজে শুচিবাইগ্রস্ততার কোন স্থান নেই। দেশের স্বার্থে, দেশের সম্মানে এবং মর্যাদায় বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস যার আছে, ভুল-ত্রুটির কোন কলঙ্ক তার গায়ে লাগে না।

বিমর্ষ গলায় বিভীষণ বলল : আমার উদ্বেগ অন্যত্র। নিঃস্বার্থ মানুষ খুব কম জন্মে। দেশপ্রেমের নামাবলি পরে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, সংকট পরিত্রাণের পরের দিনগুলিতে তারা এক জটিলতা সৃষ্টি করবে। অনেক জোড়াতালি আর মিথ্যে দিয়ে তাদের সাহায্যের একটা বড় মূল্য দিতে হবে। কিন্তু জেনেও আমার করার কিছু নেই। পেছোবারও পথ নেই।

মন্দোদরী কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল : তোমার কথাগুলো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। কী করলে সব কূল রক্ষা পায় ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। পরে আমাকে দোষ দিও না যেন। মেয়েমানুষের বুদ্ধি দিয়ে আমি যতটুকু বুঝেছি, বললাম।

বিভীষণের চোখে অন্যমনস্কতার ঘোর। মুখে শিশুর অসহায়তা। মন্দোদরীর কথা শুনে সে হাসল না। চমকাল না। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পর বলল : জড়ভরত হয়ে দিন কাটাতে ভালো লাগছে না। কিছু করতে চাই। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তুমি আমার অন্ধকারের জ্যোতির্ময়ী আলো। আকাশের ধ্রুবতারা পথহারা পথিককে যেমন পথ দেখায় তেমনি তুমিও আমার কর্তব্য বলে দিলে। তোমাকে কোনদিক দিয়ে ছোট করি সে ইচ্ছেও নেই, সাধ্যও নেই।

চমকানো বিস্ময়ে গভীর অনুরাগে এবং সপ্রেমে মন্দোদরীর বুক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হলো : দেবর! গাঢ় ভাঙা ভাঙা স্বরে—।

॥ ছয় ॥

বিভীষণের দুঃখ; মন্দোদরীর কাছে তার কানাকড়ি দাম নেই। মাঝে মাঝে এ

বোধে আক্রান্ত হলে তার খুব কষ্ট হয়। অথচ পাপ, অন্যায়, অপরাধ, দোষ যা কিছু করেছে নিজের কাছে, দেশের কাছে তা মন্দোদরীর জন্য করেছে। মন্দোদরীকে প্রিয়া করে পাওয়ার প্রবল বাসনাই তাকে পাগল করেছিল। স্বপ্নের মন্দোদরী তার স্বপ্নেই রয়ে গেল। বাস্তবে যদি বা মিলন হলো, পাওয়া হলো না। এই ব্যর্থতায় দুঃখ, অপমানের যন্ত্রণায় তার ভেতরটা কুঁকড়ে গেল। নিজের ভেতর অনবরত শামুকের মতো গুটিয়ে যেতে যেতে পুরু খোলসের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়ে নিজেকে দেখে। "বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা।"

যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠল বিভীষণ। সে আর বর্তমানের মধ্যে নেই। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে বিশ বছর আগের এক অতীতকে দেখছে; - মন্দোদরীর ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাবণ মহিষীর এত্তেলা পেয়েই সটান তার ঘরে হাজির হলো। মন্দোদরী তখন জানলার কাছে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল।

বাইরের দিকে চেয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। কণ্ঠে সুর গুণগুণ করছিল তার। প্রাণ মন উজাড় করে দিয়ে গাইছিল: 'ব্যথা আমার কুল মানে না, বাধা মানে না, পরাণ আমার ঘুম জানে না, জানা জানে না।' মন্দোদরীর কণ্ঠে এই গান বিভীষণের মনে এক নতুন মানে বয়ে আনল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দোদরীর দিকে। ওপাশ থেকে মরা রোদে হলুদ আলো পড়েছিল কানের দু'পাশে ভ্রমর কালো চুলে। গান থামলে ডাকল বিভীষণ: বৌঠান!

ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল মন্দোদরী। বিভীষণ দ্রুতপায়ে একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল: মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে তুমি কৌতুক কর ভীষণ। কিন্তু যাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা তার অবস্থা যে কী হয় সেটাই শুধু বোঝ না। বুঝলে, এমন জরুরি তলব পাঠাতে না।

মন্দোদরী যন্ত্রবৎ বিভীষণকে হাত ধরে পালঙ্কে বসাল। নিজে বসল অন্যপ্রান্তে। গম্ভীর গলায় বলল : আর কিছু আছে তোমার বলার ?

মন্দোদরীর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে অবাক হলো বিভীষণ। সমবেদনা দেখাতে গিয়ে বেদনাহত হয়ে পড়ল। বলল : বৌঠান, এমন গম্ভীর হতে তোমাকে আগে দেখিনি। কী হয়েছে তোমার ?

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মন্দোদরী গম্ভীর গলায় বলল : মেয়েমানুষের কিছু হতে নেই। হয়ও না। তারা মেয়ে, মানুষ নয়। তাদের মন নেই, অনুভূতি নেই, ইচ্ছে নেই। ভালোবাসা বলে কিছু নেই। তারা এক নেই রাজ্যের শরীরসর্বস্ব প্রাণী। শুধু ক্ষুধার খাদ্য। কথাগুলো বলার সময় অভিমানে, কষ্টে, ঠোঁটটা থর থর করে কাঁপল কয়েকবার।

বিভীষণ চুপ করে চেয়ে রইল। মন্দোদরীর বুকের গভীরে লুকানো এক দাবানল আজ যেন প্রথম টের পেল বিভীষণ। এ কোন দাবাগ্নি তাকে দগ্ধ করছে? দেহমন জুড়ে জ্যোতিবিকীর্ণ দাবাগ্নির আলো ছড়িয়ে পড়েছে, আর বিন্দু বিন্দু করে পুড়ে

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার অহংকার, তার নীতি, তার সাধুতার গর্ব। এতক্ষণ মন্দোদরী যা কিছু মূল্যবান বলে ভেবেছিল সবই শিখার মুখে জ্বলছে। সমবেদনায় সহানুভূতিতে বিভীষণের মন নরম হয়ে গেল। একটু সরে এসে মন্দোদরীর পাশে বসল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে। দু'হাত তার বিভীষণ তুলে নিল নিজ হাতে। মন্দোদরী বাধা দিল না, আবার সরিয়েও নিল না। বরং, আশ্চর্য হলো কী সুন্দর নরম তুল তুলে সেই হাত। একটা সুন্দর অনুভূতি হলো বিভীষণের। ভিতরটা প্রদীপ শিখার মতো কম্পমান। মনে হলো, শিষ্টাচার এবং নীতিভঙ্গ করেছে সে। তাই এত আলোড়ন। কিন্তু সত্যি কি তাই? বিভীষণ স্পষ্ট করে কিছু জানে না। সারা বুকখানা তার গান গেয়ে উঠল। গানের সুর যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে তার কানে ভেসে আসছে। আর সে মন্দোদরীর হাতের উপর কান পেতে বিভোর হয়ে যেন শুনছিল, আর শুনছিল। এমন অনুভূতি আগে হয়নি কখনও। এতে কোন দাহ নেই, সিগ্ধ স্পর্শেই ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেতে লাগল তার ভেতরটা। হাতটা ধরা অবস্থায় বলল : ক'দিন ধরে খুব ইচ্ছে করছিল তোমার গলায় আমার প্রিয় গান শুনি। গানে মনটা পবিত্র আর হালকা হয়।

মন্দোদরী কথা না বলে বিভীষণের চোখের উপর চোখ পেতে রেখে গাইল "কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে, আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে।"

গান শেষ হওয়ার পরে একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা সেখানে থমথম করছিল। সুরের রেশ থাকতে থাকতে বিভীষণ বলল : সুন্দরম্। এ কিন্তু আমার গান নয়।

সমস্ত অন্তর থেকে মন্দোদরী বলল : গানে আমার তোমার কিছু নেই। গান দিয়ে মানুষ যতখানি স্পষ্ট করে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে, মনের ভার হালকা করতে পারে, অন্যের অন্তরের দোসর হতে পারে— অন্য কিছু দিয়ে তা পারা যায় না। মনের আগল খুলে ফেলে গানের মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিতে খুব ভালো লাগে সব মানুষের তাই না?

বিভীষণের অধরে স্মিত হাসি ফুটল। বলল: "প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু। সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু— তোমায় দেব না দুখ, হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ।" কথাগুলো বলার সময় তার মুখ-চোখ খুশিতে, আনন্দে, ভালোবাসায় মাখামাখি হয়ে গেল। হঠাৎ এক দারুণ মুগ্ধতায় তার হাতে চুমু খেল। মন্দোদরীকে নিয়ে বিভীষণের যে খুশি, তাতে খুশির গভীরতার অর্থ বুঝতে বোধ হয় মন্দোদরীর কোন ভুল হলো না। তাই একটু চককে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

বিভীষণের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মন্দোদরী বলল : ভালোবাসার মানে কিন্তু কম মানুষই বোঝে। বেশিরভাগ পুরুষের কাছে ভালোবাসা মানে শরীর। মেয়ে মানুষের শরীরটাই তার কাছে মহার্ঘ। ঠাণ্ডা মাথায় স্থির লক্ষে পৌঁছানোর জন্য ছলা-কলা করে নারীর শরীরের কাছে একবার পৌঁছে গেলে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে

খেয়ে নেয় তার সর্বস্ব। পুরুষ ভালোবাসতে জানে না। ভালোবাসার নামে বিবাহিত মেয়েমানুষকে লোকভয় আর অভ্যাসের দাসত্ব করতে হয়।

ফ্যাল ফ্যাল করে বিভীষণ চেয়ে থাকে মন্দোদরীর দিকে। ভয়ে ভয়ে বলল : তোমার কথা বোধগম্য হলো না। অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদের যন্ত্রণায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে তোমার সুখ কী ?

জানি না। জীবনের পরম অনুভূতিতে আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রতিদিন আমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমার ধ্বংস খালি চোখে দেখা যায় না। তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম মনের কারণে তা বলা হয়নি। আমি অবসাদে ভুগছি। তাই হতাশ হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করি, শরীর পাওয়া কি পুরুষ মানুষের একমাত্র পাওয়া ? তার কী অন্য কোন চাওয়া নেই ?

দেবী, তোমাকে কষ্ট পেতে দেখে, আমারও আর হচ্ছে। কিন্তু এত কষ্ট পাওয়ার তো কোন দরকার নেই। তবু নিজেকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ। এটাই আমার বেশি খারাপ লাগছে।

তোমার সহানুভূতিতে আমি এত অভিভূত হয়ে গেছি যা প্রকাশ করবার সাধ্য আমার নেই। আমি ভাগ্যের খেলা খেলছি। আমার সব রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা তোমার অগ্রজের উপর। সে একের পর এক সাম্রাজ্য গড়তে পারে, নতুন নতুন দেশ জয় করতে পারে, অনেক যুদ্ধে জিততে পারে; বহুজন তাকে ভয় সমীহ করতে পারে, কিন্তু সে কাপুরুষ। রাজ্য জয় করা তার কাছে সাজে, কিন্তু রমণীর হৃদয়রাজ্যে জয়ের দিকে তার কোন লক্ষ্য নেই; চেষ্টাও নেই। সে আমার স্বামী। সেটা আমার যেমন গর্ব, অহঙ্কার, তেমনি আমার লজ্জা এবং অপমান। আমি তো তাঁর সাধারণ স্ত্রী নই, এ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। আমার যশ মান সম্মান খ্যাতি, গৌরব, সমাদর, মর্যাদা সবই তোমার অগ্রজের সমান। একদিন আমার এই সুন্দর শরীর জ্বলে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু আমি হব ইতিহাস। জীবন্ত ইতিবৃত্ত। আমার মতো এমন ভাগ্যবতী কজন হয় ? কিন্তু তাতে আমার সুখ এবং আনন্দ কী ? জীবনে পেলাম কী ? শূন্যতা নিয়ে বসে আছি। মনের সুখই সব। মনের সুখের কাছে বাইরের কৃচ্ছ্রসাধনের কোন কষ্টই আমাকে সুখী করবে না। জান দেবর ; সর্বক্ষণ মনে হয় আমার মতো একা এবং দুখী এ লঙ্কাপুরীতে কেউ নেই। শূন্যতা একাকীত্বের ফাঁসে আটকে আছি। সাতপাকের বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়ি সে সাধ্যও নেই। অথচ মনটা খাঁচার বন্দী পাখির মতো মুক্তির জন্য ছটফট করছে। কী যে করি ?

দেবী, তোমার মন আজ ভালো নেই। মাঝে মাঝে সব মানুষের মনের যে কী হয় মনই জানো না। সব পুরুষের নারী আছে, সব নারীর আছে একজন পুরুষ। তবু এত কষ্ট কেন ? এ কিসের কষ্ট ? রাগের, কামের, প্রেমের, না অপ্রাপ্তির কোন কষ্ট— কে জানে ? জানা থাকে না বলেই কি এ কষ্ট সকলের ?

দেবর, পুরুষ বলে তোমার অগ্রজ একাধিক নারী সঙ্গ করছে। কত নারীকে সন্তান দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্বাধীনতা, নিজস্বতা কিছুই বাধা দেয়নি কোন নারীর প্রেমের কাছে, ভালোবাসার কাছে। প্রকৃতির শৃঙ্খলে নারী নিজেই নিজের কারাগারে বন্দী। কিন্তু একচক্ষু প্রকৃতি পুরুষকে কোন কিছু দিয়ে বাঁধেনি। তার শরীরের মধ্যে জানোয়ার হয়ে ঘুমিয়ে আছে সে। খিদে পেলেই নিদ্রা থেকে কুম্ভকর্ণের মতো জেগে ওঠে। দেবর, তুমি বল, একজন পুরুষ যদি তার প্রেম, ভালোবাসা ছাড়াই দেহের সুখ, আনন্দ নিয়ে সহজে বাঁচতে পারে তাহলে নারী পারবে না কেন? আমি নিজে বেঁচে দেখিয়ে দেব, প্রমাণ করব, স্বামী ছাড়াও একজন নারী-পুরুষের মতোই বেঁচে আছে। মেয়েদের যেটা মস্ত বল সে হলো তার শরীর। একজন মেয়ের এই পরিচয় ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই। দুর্বল, লোভী পুরুষ ঐ শরীরের গন্ধে মাতাল হয়ে থাকে। যতক্ষণ নারী একা, স্বাধীন ততক্ষণই তার মস্ত বলের গর্ব। নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার। পুরুষের একার সম্পত্তি হয়ে গেলে তার ঐ শক্তি অহঙ্কার নিঃশেষ হয়ে যায়। স্ত্রী হয়ে গেলে নারী সব কিছু হারিয়ে বসে। ন'মাসে ছ'মাসে যখন হঠাৎ ইচ্ছে হবে তখন...। না, আমি তেমন নই। ঐ অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া চাই না। স্ত্রী হওয়ার পরে আমার কাছে সবটা মনের ব্যাপার। শরীরের নয়। সেই মনের মনকে তোমার অগ্রজ ছোট করলেও করতে পারে তা বলে আমাকে আমি ছোট করব কী করে? জোর করে, যেচে সেধে কারো কাছে কিছু চেয়ে লজ্জা পাওয়া যায় কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় না। মনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া কোন আনন্দই আনন্দ হয়ে উঠে না।

দেবী, আমি বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে এক অভিমানিনী নারী মন ভিতরে ভিতরে কাঁদছে। কজন দম বন্ধ এই ভারী বোবা কান্নার পাষাণ ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে? কিবা করতে পার তুমি?

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে যেন বলল: সত্যিই কি পারি না কিছু? তোমার মতো নরম মনের মানুষ, কম উচ্চাশাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বিয়ে হলেই বোধ হয় আমি সুখী হতাম।

বিদ্যুৎ চমকানোর মতো চমকে উঠল বিভীষণের ভেতরটা। অবিশ্বাসের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল। মাথা নিচু করল, বলল: দেবী, প্রত্যেকের জীবনে এমন এমন কিছু সম্পর্ক থাকে গোপনে এবং অগোপনে যেখানে তারা না নিয়ে নীরবে নিঃশব্দে কিছু দিয়ে ধন্য হয়।

হঠাৎ মন্দোদরীর বুকের ভেতর কী যে ঘটে গেল তা নিজেও জানে না। বহুকালের সংস্কার, সম্ভ্রমের পাহাড় চূড়া যেন সশব্দে ভেঙে পড়ল তার পায়ের কাছে। আর সবিস্ময়ে সে চেয়ে আছে তার দিকে। বলল: তুমি আমার সেই মনের মানুষ। প্রেমহীন লঙ্কাপুরীতে কারো বুকে যদি একটু দরদ, মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জাগানো প্রেম থাকে তা আছে কেবল তোমার বুকে। বিশ্বাস করে মনের কথাটা

কেবল তোমাকেই বলা যায়। চল দেবর, আমরা হাত ধরাধরি করে কোথাও পালিয়ে যাই। এমন জায়গায় চল যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না কখনো। তোমার অগ্রজও নয়। পারবে, এই মিথ্যে জীবন থেকে আমায় বার করে নিয়ে যেতে ? চলো, পালিয়ে গিয়ে সকলকে চমকে দিই। মাথা হেঁট করে আছ কেন তুমি ? দিন ফুরিয়ে আসছে। পালানোর তো এই সময়। সাহস হবে কী পালাবার ?

মন্দোদরী খুবই সপ্রতিভ মহিলা। হঠাৎ বিভীষণের ডান বাহু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল। নিজের মনেই বলল : চলো, দেবর এবার আমরা যাই। শুধু তুমি আর আমি। তোমার অগ্রজ থাক তার নিজের সুখ, আনন্দ, স্ফূর্তি নিয়ে। সে থাকুক তার প্রভাব প্রতিপত্তি খ্যাতি, যশ, মান, ঐশ্বর্য এবং বিরাটত্ব নিয়ে। ও সবে আমার লোভ নেই। যশস্বী পুরুষদের আসল জায়গা বোধ হয় তাদের কাজের জায়গা। সেখানে সে সবচেয়ে আনন্দে থাকে। আমার পালিয়ে যাওয়াটা তার কাছে কোন খবরই নয়। তাকে জব্দ করার জন্য চল পালাই আমরা। তোমার জন্য না হলেও অন্তত আমার জন্য কোথাও চল।

পরস্ত্রীর আব্দার তার শারীরিক উষ্ণতার ছোঁয়া অনেকক্ষণ শরীর মন জুড়ে দামামার মতো বুকের গভীরে দ্রিমি দ্রিমি করে বেজে যেতে থাকল। বিভীষণ বুঝে পেল না কী করবে ? মন্দোদরীর বয়স হয়েছে যথেষ্ট। এই বয়সে আবেগে ঘর ছেড়ে কেউ বিবাগী হয় না। মনটা অসহিষ্ণু হয়েছে বলেই নিজেকে নিষ্ঠুর করেছে। তাই এত ওলোট পালোট হয়ে গেছে তার ভেতরটা। মনটা অস্বাভাবিক না হলে মন্দোদরীর মনটাকে জানা হতো না। এ মনের নিভৃতে তার জন্য একটা আসন পাতা আছে। তার প্রতি মন্দোদরীর কোথায় যেন একটা ক্ষীণ দুর্বলতা এবং অনুরাগ আছে। এই অনুভূতিতে তার ভেতরটা একটা অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হলো। মন্দোদরীকে ধরে সামনের একটা কেদারায় বসাল বিভীষণ। বলল : দেবী, আর্ত মনকে আর কষ্ট দিতে চাই না। তুমি শান্ত হও। স্থির হও। তোমার বুকের ভিতর যে অভিমানের সাগর উথলে উঠেছে তার দুটো রূপঃ একটা গলায় ফাঁস দিয়ে টানে, শিকল দিয়ে বাঁধে। আর অন্যটা মনকে ব্যকুল করে দোলে— তার এক পা অতীতে অন্য পা বর্তমানে। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠে যখন, পিছন ফিরে তাকানোর সময় থাকে না। অভিযাত্রী মনটা অভিভূত করে দিচ্ছে। হৃদয় জুড়ে সঙ্গীতের কল্লোল : 'হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমন গাহিব কহি দাও স্বামী, মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে ডমরু বাজাব— ভীষণ দুঃখে ডালি লয়ে তোমার অর্ঘ সাজাব।''

মন্দোদরী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। কথা বলছিল না। চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল।

বিভীষণের বুক ফুঁড়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তাতেই সে চমকে তাকাল নিজের দিকে। ঘরের ভেতর সে ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় প্রাণী নেই। অনেকক্ষণ ধরে একা

বসে আছে ঘরে। কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে মন্দোদরীর স্মৃতি যেন দৈত্যের মতো হানা দিয়ে তার মনের সুখ শান্তি সব হরণ করছে।

বিভীষণের ভুলটা এখন খালি চোখে স্পষ্ট দেখতে পায়। মন্দোদরীর স্নেহবৎসল অন্তঃকরণকে তার প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রেম বলে ভুল করেছিল। সে ভুলের অনেক দাম দিতে হলো তাকে। মন্দোদরীর প্রেমের মাশুল এখনও কতকাল ধরে তাকে একা দিতে হবে, কে জানে? বিপদ সংকেতের মতো কথাটা তার কানে বাজতে লাগল। কিন্তু কী করার আছে তার? এখন সে অসহায়। রামচন্দ্র এবং বানরসৈন্যদের দল লঙ্কাত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরে সে আরো অসহায় বোধ করছিল। না, নিজের বিপদের কথা ভেবে নয়, লঙ্কার ভবিষ্যৎ তাকে শঙ্কিত করে তুলল।

পালঙ্কে স্থাণুর মতো শুয়ে রইল বিভীষণ। মাথাটা ভার ভার। মশার পাল উড়ছে মাথার উপর। শরীর ঘিরে পাক খাচ্ছে অনবরত। একটানা পোঁ-পোঁ শব্দ অশুভ সংকেতের মতো ঘরময় বাজতে লাগল। বাইরে সন্ধ্যা নামছে ধীরে। চারদিক থেকে নিবিড় আঁধার গড়িয়ে আসছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। জল স্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে। এ যেন স্বপ্ন দৃশ্য। সমুদ্রের নীল জলও আঁধারে ঢেকে গেল।

থমধরা বিষণ্নতা নিয়ে বিভীষণ অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে রইল। মনটা সিক্ত। কিছু বিষণ্নও। সর্বক্ষণ বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। ঘর সংলগ্ন দক্ষিণের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রকৃতি শান্ত। নির্বিকার। আত্মমুখী। তার কোন দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই। নির্মেঘ আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র যেন নিয়তির চোখ হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে। হতোদ্যম বিভীষণ ঊর্ধ্বমুখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আকাশের দিকে। পুঞ্জীভূত অভিমান, একাকীত্বের কষ্ট, যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পাক দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো। হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। উদ্‌গত কান্না বুকে আটকে রেখে আকাশের দিকে চেয়ে নিরাকার কোন মহাশক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললঃ কেন? কেন এই শাস্তি দিচ্ছ আমাকে? আমি কী করেছি? যা করেছি, তোমার ইচ্ছে এবং নির্দেশেই করেছি। তা-হলে আমার দোষ কী? কেন এই কলঙ্ক? জবাব দাও ভগবান।

হু হু করে বাতাস এসে তার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। এক অনিশ্চিত কালো ভবিষ্যৎ দক্ষিণের হাওয়ার মতো তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সব কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে। জীবনটা পর্যন্ত ওর স্বাভাবিক নেই। যে জীবন ঘুম ভেঙে যাওয়া থেকে ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একইরকমভাবে গড়ায়। তার কোন বৈচিত্র্য নেই, বৈশিষ্ট্য নেই। এ হলো তার পাপের শাস্তি। এসব অশান্তি, যন্ত্রণা, কষ্ট না থাকলে মানুষ তার দোষ-অন্যায় পাপ পুণ্যের তফাৎ বুঝবে না। নইলে তো গড্ডালিকা স্রোতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যকে এক হতে হয়। প্রত্যেকটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষ না গেলে জীবনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয় না। নিজের কৃতকর্মের ভালো মন্দের

তফাত জানা হয় না। জীবনে ধর্ম ও অধর্মের মস্ত বড় ভাগ দুটো। আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা আছে সব। সমস্ত ভাগই ভিন্ন। এসব কথা গভীর করে আগে ভাবেনি কখনও। নিজের মনটাকে কাজে লাগায়নি। মনের চোখ ঢেকে ভালোবেসেছিল মন্দোদরীকে। কিন্তু সে ভালোবাসা এতই সীমিত যে মন্দোদরীর কাছ থেকে কিছু না পেয়ে একদিন ফুরিয়ে যাবে সে। তার কপালটাই এরকম। এখন বুঝতে পারছে, যা ও জানত আজ অবধি তা ঠিক নয়। কারো কোনো জানাই অভ্রান্ত নয়। জানার জন্য প্রতিদিনই বোধ হয় বদলে যায়। একদিন যেটাকে অভ্রান্ত ভেবে, নিশ্চিত সত্য মনে করেছিল আজ সেটাকে সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু এই বিভ্রান্তি কার সৃষ্টি ? এর জন্য দায়ী কে ? প্রশ্নগুলো বিভীষণ নিজেকে করল। নিজের মনে উত্তর খুঁজল তার। আর একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। খুব বেশিদিনের কথা নয়। তাই সব কিছু স্পষ্ট করে মনে পড়ল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। এই অনুভূতিই তার অন্তঃকরণ প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে তুলল। এতকাল সে প্রশ্ন একবারও মনে উদয় হয়নি। চিন্তার মধ্যে তাকে খুঁজে দেখার দরকার হয়নি। কিন্তু আজ যখন তার মধ্যে প্রবেশ করল তখন শুধু নিজেকে নয়, অনেককে তার মধ্যে দেখতে পেল। শূর্পনখা, অকম্পন, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সম্পাতি, রাবণ সবাই আছে।

রাজসভায় পাত্র-মিত্র, সভাসদদের মধ্যে সেও আছে। প্রতিদিনই থাকে। নিজের জায়গায় বসে রাবণের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যার অর্থ নানাবিধ। বিভীষণের মুখ দেখে রাবণ তার মনের কথা টের পায়। সে যে একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করছে এটা বুঝেই তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলঃ বিভীষণ, রামচন্দ্রের যুদ্ধের নানারকম হুমকি শোনা যাচ্ছে, একথা কতটা সত্য বলে মনে হয় তোমার ?

শিরদাঁড়া থেকে একটা কম্পন উঠে এল যেন বিভীষণের।

এরকম একটা আচমকা প্রশ্নে সে খুব আশ্চর্য হয়েছিল। মনের ইচ্ছেটা বাইরের কাক-পক্ষীও জানে না। তা-হলে রাবণ কী করে জানল ? ভেতরের বেসামাল অবস্থাটা সামাল দেবার জন্য আমতা আমতা করে বললঃ এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন আমাকে করছ কেন ? রাজ্যের বাইরে বা ভেতরে কোথায় কী হচ্ছে সে সংবাদ তো গুপ্তচরেরা দেবে।

আমার প্রশ্নের এটা কিন্তু জবাব হলো না। তোমার কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন না করা দোষের।

ভর্ৎসনা করার মতো কোন কাজ করিনি আমি।

তোমার বিবেককে জিগ্যেস কর। তুমি কিন্তু এত উদাসীন ছিলে না কোনদিন ? চুপ করে থাকলে নিরপরাধ প্রমাণ হয় না। তুমি আমার ভাই। আমার সবচেয়ে আস্থার পাত্র।

আস্থাহীনতার কোন কাজ করেছি কি ?

দু'চোখ বুজে রাবণ মাথা নাড়ল। হাসি হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললঃ খর ও দূষণের মৃত্যুর পরে সব কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। রামচন্দ্রের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছে। রাবণের সোনার লঙ্কা আক্রমণের কথা ইদানীং সে ভাবতে আরম্ভ করেছে। রামচন্দ্রের এত বড় সাহস হয় কী করে ?

সে জবাব কি আমায় দিতে হবে ?

দেওয়া, না দেওয়া তোমার অভিরুচি। রাজভ্রাতার কাছে প্রত্যাশা করা দোষের নয় ? খর ও দূষণের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ?

উদ্ভূত ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে খরও দূষণ রামচন্দ্রকে সহায়-সম্বলহীন বনবাসী ভেবে তার শক্তি সামর্থ্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল। তারা বিচার করেনি রাম নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য ছত্রিশ জাতির মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে তাদের সংগঠিত করেছে। এরা রামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। সে যে গোপনে বিপুল অস্ত্র-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল, উপজাতিদের নিয়ে একটা দক্ষ সেনাবাহিনী গড়েছিল, খর ও দূষণ তার সংবাদ রাখত না বলেই ভরাডুবি হলো তাদের। সব ঘটনা বিচার করে মনে হয়েছে আমার, লঙ্কাও খুব নিরাপদ নয়।

বিভীষণের কথা চুপ করে শুনল রাবণ। নিজের চিন্তায় এতই অন্যমনস্ক এবং আচ্ছন্ন যে বিভীণণের শেষ কথাটা তাকে চমকে দিল। বললঃ লঙ্কা বিপন্ন কেন ? তোমার মনে এরকম আশঙ্কা জাগল কেন ?

রামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেই রাম ছোট হয়ে যায় না। বরং সুবিধে হয় বেশি। তোমার ভুল রাজনীতির সুযোগ নিয়ে রাম কূটকৌশলে প্রতিনিয়ত তোমার মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের জমি প্রস্তুত করতে সফল হয়েছে। তোমার ভেতরে তার এক অদৃশ্য লড়াই সুরু হয়ে গেছে। সন্দেহ অবিশ্বাস তোমাকে গ্রাস করেছে।

রাবণ বিতৃষ্ণায় ভুরু কোঁচকাল। বিরক্ত হয়ে বললঃ আশ্চর্য, তোমার যুক্তি। তুমি জেগে ঘুমোচ্ছ বলে টেরে পাচ্ছ না। বিপদ, পা টিপে টিপে লঙ্কায় প্রবেশ করছে। লঙ্কার মানুষ তোমার কূটনীতি বোঝে না। তোমার নীরবতাকে তারা দুর্বলতা ভাবে। রামের ভয়ে ভীত বলেই তুমি তার স্বাধীন চলাফেরার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করতে দ্বিধা করছ। কেন বোঝ না ; রাজনীতিতে শত্রু বা প্রতিপক্ষ যত ছোট অথবা দুর্বল হোক তাকে তুচ্ছ করতে নেই। যে করে তাকে পরে পস্তাতে হয়।

রাবণ প্রাণখোলা হাসি হাসল। বললঃ নীরবতা একটা রণকৌশল। যুদ্ধ বাইরে কোথাও নেই, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে একটা নিরন্তর লড়াই লেগে থাকে শত্রুর। রামচন্দ্র এতই অযোগ্য যে তেরোটা বছর কেটে গেল তবু রাক্ষসদের একজনকেও সে আক্রমণ করেনি।

বিভীষণ বললঃ তোমার এই আত্মতৃপ্তির ঋণ খর ও দূষণের জীবন দিয়ে শোধ

করতে হয়েছে। ভগিনী শূর্পনখা নিজেকে বিপন্ন মনে করছে। নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য বৈরীতা ভুলে রামের সঙ্গে মিত্রতা করছে। একে দোষ বলে মনে করলে দোষ, কিন্তু তোমার উপর আস্থা রাখতে পারছি না সেটা ভেবে দেখার দায়িত্ব তোমার।

শূর্পনখার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বর্তমান রাজনীতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, তার থেকে মুক্তি নেই তার। নিজে থেকে মুক্তি চাইলেই তবে মুক্ত হওয়া যায়। মুক্তির জন্য এক জীবনে এক একজনকে অনেক দাম দিতে হয়। বিভীষণ তুমিও সাবধান। এবার তোমার পালা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার দু'চোখে লোভ, মনে নানা কুমতলব কাজ করছে। সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছ।

বিভীষণ চমকাল। গভীর অপমানে তার মুখ রক্তাভ হলো। বললঃ তোমার ভাই হওয়ার জন্য আমাকে এমন একটা কটু কথা শুনতে হলো রাজভ্রাতা না হলে পদে পদে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসম্মান আমাকে কুড়োতে হতো না। বলতে বলতে বিভীষণের দু'চোখের কোটরে ব্যথা জমে উঠল।

সে রাত্রি দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি বিভীষণ। প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে বুঝল, রাবণের কাছে ধরা পড়ে গেছে। কোন কিছু তার কাছে গোপন নেই। রাবণও অকপটে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেনি তাকে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললঃ আচ্ছা বিভীষণ তোমার সঙ্গে আমার অবনিবনা কোথায় ? তুমি না বললেও আমি টের পাই, লঙ্কার সিংহাসনে আমাকে তোমার খুব পছন্দ নয়। আমাকে ঈর্ষা কর। কিন্তু আমার এই যশ, খ্যাতি, সম্মান, গৌরব কেউ আমাকে দেয়নি। উত্তরাধিকারী সূত্রেও পায়নি। এ আমার অর্জিত। এর উপর কারো কোন ভাগ কিংবা দাবি থাকতে পারে না। আমার জ্যোতির পাশে তোমরা তারার মতো মিট মিট করছ। সেজন্য একটা জ্বালাধরা ঈর্ষায় তোমার ভেতরটা অশান্ত। সিংহাসনের স্বপ্ন তোমার দুই চোখে। সাফল্যের জন্য তুমি বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছ।

বিভীষণ কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললঃ সন্দেহ এমন এক জিনিস, একবার মনে ঢুকলে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। আঁশটে গন্ধের মতো গেলে থাকে। আমি যদি প্রতিবাদ করি, অস্বীকার করি তবু তোমার সন্দেহ ঘুচবে না। বিশ্বাস মরে গেলে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না তাকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের মিথ্যে চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না আমার। আমি সে চেষ্টা করব না।

রাবণ কুটিল চোখে বিভীষণের দিকে চেয়েছিল। তারপর বললঃ তুমি সত্য কথা স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছ। ইদানীং তুমি রামের একজন ভক্ত হয়ে উঠেছ। তার সব কার্যই তোমার কাছে খুব আশ্চর্যকর। রামের কথা বলতে তুমি আনন্দ পাও। লঙ্কাবাসীকে

বোঝাচ্ছ, ঈশ্বরকে চোখে দ্যাখনি, কিন্তু তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপ এবং আশ্চর্য ক্ষমতা রামের মধ্যে আছে। ঐশ্বরিক শক্তি বলে রাম গোটা দক্ষিণারণ্যের জনগণের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। বুক ভরা তার ভালোবাসা। ভালোবাসার মন্ত্রে পর আপন হয়ে যায়। রামকে ভয় করার কিছু নেই। রাম আমাদের বন্ধু হতে পারে।

বিভীষণ থতমত খেয়ে বললঃ তুমি অনেকদূর ভেবে ফেলেছ দেখছি।

রাবণ তার দিকে চেয়েছিল। ধীরে ধীরে তার মুখের হাসি ও কৌতুকভাবটা মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল। বললঃ বিভীষণ, এসব কথা যখন কেউ বলে, বুঝতে হবে ; তার কিছু স্বার্থ আছে। দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ অনেক বড়। তোমার সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ চরেরা করলে, কী জবাব দেবে তুমি ? মানুষের পরিচয় তার কাজে প্রকাশ পায়। তোমার সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ করে তাদের কোন লাভ নেই। ভাই হয়ে তোমার স্বভাব, আচরণকে মেনে নিতে পারছি কৈ ? এসব কেন করছ জানি না। সিংহাসনের লোভ যদি থাকে খোলা মনে বল— রাজমুকুট খুলে দেব আমি। অথবা লঙ্কার শাসনাধীন কোন অঞ্চলের নরপতি করে দেব তোমায়। কিন্তু ভাই, ভুলেও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাতৃহন্তা হয়ো না। এর মতো বড় পাপ এবং অভিশাপ আর নেই। মানুষের শাপ-মন্ত কুড়িয়ে তুমি শান্তি পাবে না। সিংহাসন হবে তোমার কণ্টক আসন। জীবনের সব শান্তি নষ্ট হবে।

হঠাৎ কোকিলের সুমধুর ডাকে তার চোখ খুলল। সকালের সূর্যের নরম আলো এসে পড়েছে তার গায়। শীতল বাতাসে শীত শীত করছে। চোখ খুলতে টের পেল সারারাত বাইরের বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। নিস্তেজ শরীরে তখনও আলস্য জড়িয়ে আছে। মাথাটাও ভার ভার লাগছে। মৃদু যন্ত্রণায় কপালের শিরা দপদপ করে লাফাচ্ছে।

॥ সাত ॥

বিভীষণ পুজোর বেশবাস বদল করে, রাজবেশ পরিধান করে মন্ত্রণাকক্ষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। মনটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল। এক বুক প্রসন্নতা নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল। চারদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখল। অতিথিদের আসনের উপরে তার চোখ। সবাই বসে আছে যে যার আসনে। কোন আসন শূন্য নেই। অমলিন হাসি ঝরতে থাকে তার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে। অতিথিরা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার চন্দন-চর্চিত কৃষ্ণবর্ণের কপালের দিকে। ললাটে রক্তবর্ণ সিঁদুরের তিলকটি যে সবার নজর কেড়ে নেবে, অন্তরে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সৃষ্টি করবে বিভীষণ তা জানত। রামচন্দ্রের সঙ্গে থেকে বিভীষণ বুঝেছিল সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব কত গভীর, কত ব্যাপক। এ প্রভাবকে ব্যবহার করতে পারলে রাজনীতিতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত, কেউ তার উন্নতি ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তাই রাজবেশ এবং পূজারীর অঙ্গরাগ ধারণ করে

অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কপালে রক্তবর্ণের তিলকটা জ্বলজ্বল করছে।

ধনী ব্যবসায়ী, বিত্তবান এবং অভিজাত প্রমুখ রাজনীতির বাইরের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এবারের মন্ত্রণাসভা। যুদ্ধক্ষত লঙ্কানগরীর পুনঃনির্মাণের জন্য বিভীষণ এঁদের সমাদর করে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেছেন। এই উদারনীতি গ্রহণ করে বিভীষণ নিজেকে সবাকার চোখে একজন মহান এবং রহস্যময় মানুষ করে তুলল।

মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকে একবার চতুর্দিক ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে সিংহাসনে বসল। এটা তার অভ্যাস। অতিথিদের দিকে চেয়ে বিভীষণ মিট মিট করে হাসছিল। তার শান্ত সৌম্যভাবটি তাতেই বেশি দেদীপ্যমান হলো। অতিথিদের হৃদয়ের সঙ্গে মুহূর্তে তার একটা যোগাযোগ ঘটে গেল যেন। তাতেই হৃদয় বাধা পড়ল তাদের। একজন সামনের সারি থেকে দাঁড়িয়ে বললঃ পুজোয় পরে সকাল বেলা এই বেশে এইভাবে আপনাকে প্রথম দেখলাম। কী ভালো যে লাগছে!

বিভীষণ হাসল। বিগলিত কণ্ঠে বললঃ আপনাদের তা-হলে হতাশ করেনি। কী খাবেন বলুন? সরবৎ বা অন্য কোন পানীয়?

সকলে এক সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বললঃ ওসব থাকুক। আসুন কাজের কথা হোক। আমাদের ডেকেছেন কেন তাই বলুন।

কী শুনতে চান?

বলবেন তো আপনি। অতিথিরা বলল।

বলব। আশা করি আপনারা আমায় হতাশ করবেন না।

বলুন। দেশের রাজাকে হতাশ করার স্পর্ধা আমাদের নেই।

বিভীষণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বললঃ দেশের মঙ্গলের কথা ভেবে একদিন রাবণের পতন কামনা করেছিলাম। দেশসেবক থেকে যখন শাসক হলাম, নতুন কর্তব্যের আহ্বান এল। একটা যুদ্ধেই লঙ্কা শ্রীহীন হয়েছে। এখন কর্তব্যের আহ্বানে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু আমার ক্ষমতা সামান্য। অথচ, দেশটা আমাদের সকলের। এর উপর আমার যেমন অধিকার এবং দরদ, আপনাদেরও তেমনি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

বণিক চন্দ্রকান্ত বললঃ দেশজুড়ে অরাজকতা। কাজ না পাওয়া ভুখা মানুষের ভিড়। পেটের জন্য তার কি না করছে- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বস্তি বলে কিছু নেই। অস্থিরতায় গোটা দেশটা ধুঁকছে। কোথাও কাজ করার পরিবেশ নেই। এরকম অবস্থায় লাভবান হওয়ার মতো কী আছে?

বিভীষণ উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। বললঃ এখনই বা কী ভবিষ্যৎ আছে? বরং যে অবস্থায় আছি, তার থেকে তো খারাপ কিছু হবে না। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের কিছু করে দেখাতে হবে। ভুখা মানুষ কাজ পেলে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পেলে আবার স্ব-স্বভাবে ফিরে আসবে। উন্নয়নমূলক কাজকর্মে

দেশের হাল ফিরলে বর্তমান সংকট কেটে যাবে। আপনাদের অর্থ আছে, সম্পদ আছে, উদ্যোগ আছে, আপনারা একটু চাইলেই এ দেশ আবার সোনার দেশ হয়ে উঠতে পারে। আমরা সবাই মিলে এদেশকে তিলোত্তমা করতে পারি। আমরা কিছু হারাইনি। আমাদের সব আছে।

বণিক-প্রধান চন্দ্রকান্তের ধূর্ত দুচোখ লোভে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবার চোখ মুখে একধরনের ভণ্ডামি এবং শঠতা খেলা করছিল। মেদভারে জর্জরিত তাদের গোলাকৃতি মাংসল গালের স্মিত হাসি দেখছিল চন্দ্রকান্ত। চোখ-মুখ দেখেই অসাধারণ তৎপরতায় তাদের মনোভাব চটপট বুঝে ফেললেন। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে চন্দ্রকান্তর মেধা বিদ্যুতের মতো দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। তার মেদবহুল চেহারার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ মানুষ। বক্তা হলেন লঙ্কানগরীর বণিক-প্রধান চন্দ্রকান্ত। ওষ্ঠাধারে বাঁকা হাসি খেলে গেল তার। অতিথিদের উদ্দেশ করে বলল : দেশসেবার কাজে রাজা আমাদের আহ্বান করলেন তাঁকে তো 'না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারি না। দেশের কাজে তিনি আমাদের সহকর্মীর মর্যাদা দিলেন। এ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে একযোগে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিলে আমরাও লাভবান হব। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে, দেশ সমৃদ্ধ হবে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হবে। বিবিধ রাজস্বে রাজার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হবে।

চন্দ্রকান্তর কথাগুলোর ভেতর এমন কিছু ছিল যা বিভীষণকে চিন্তামগ্ন করল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। নাসিকায় প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা। বিভীষণ কিছু বলার আগেই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চন্দ্রকান্ত পুনরায় বলল : আপনার অনুগ্রহ এড়িয়ে লঙ্কাকে সমৃদ্ধ করা যাবে না। তাই, দেশের সংকটে আমরা আপনার পাশে আছি এবং থাকব।

ধনকুবের-ভস্মলোচন বলল : দেশ চিরদিন বিত্তবানদের। তারা আছে বলেই দেশ চলছে। এসব রহস্য সাধারণ জনগণ বোঝে না। দেশের উন্নতি হয় কী করে, কারা করে, কোথা থেকে অর্থ আসে, কী করে রাজ্য চলে, কারা কীভাবে রাজ্য চালায় নেপথ্যে থেকে; তার কিছুই জানে না তারা। তারা বোঝে দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার আর এক নাম জীবন। এই সীমাবদ্ধ ধারণার মধ্যে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধরে না। আকাঙ্ক্ষার এক স্বার্গরাজ্য সৃষ্টি করতে পারলে তাদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে যাবে। নিত্য নতুন চাহিদা পূরণের প্রবল বাসনা এবং অতৃপ্তির একটি লোষ্ট্রপাত তাদের শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে যে তরঙ্গকায় সৃষ্টি করবে তার আবর্ত সহজে থামবে না। জীবনের ভেতর তাদের আকাঙ্ক্ষার জগৎ বদলে যাবে।

অভিজাত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর বলল : ঠিক কথা। জনতা কী চায় তা ভাবলে রাজত্ব চলে না। রাজত্ব করব আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে। আপনি হবেন তার নিয়ামক এবং চালক।

বিভীষণ চুপ করে রইল। নীরবে চিন্তা করছিল। অনেক ঘটনাই তার মনে হচ্ছিল। সবটুকু বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝল যে, সমস্যা-জর্জরিত লঙ্কার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নেপথ্যে গোপন লেন-দেনের এক চতুর খেলায় মেতে উঠেছে। দাক্ষিণ্যের লোভ দেখিয়ে তারা দেশের শাসকের উপর নেতৃত্ব ও প্রভাব কায়েম রাখার দর কষাকষি করছে যেন। বিভীষণের চোখে কৌতুক, অধরে হাসি। সহজাত বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে বুঝল লঙ্কার উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাকে জনতার দাক্ষিণ্য ত্যাগ করে এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে; তাদের আকাঙক্ষার উপর নিজের নেতৃত্ব কায়েম রাখা চেষ্টা করতে হবে। অক্ষমতা, কর্তব্যবিমুখতা, দুর্বলতার জন্য একটা অপরাধবোধ মনে মনে তাকে পীড়িত করছিল। তাই বেশ একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল : আজ এই মহান সঙ্কল্পে যোগদান করার মুহূর্তে আমি নিজেকে একবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখে গর্ব হওয়া তো দূরের কথা, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত স্বার্থবুদ্ধি, কত লোভ-লালসা, জঞ্জালে ভরা আমাদের জীবন। এই নিয়ে দেশের ভালো কী করে করব আমরা ?

চন্দ্রকান্ত হাসি হাসি মুখে বলল : রাজত্ব চালানোর কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। রোজকার পথ, নিয়ম, নীতি রীতি রোজ তৈরি করতে হয়। রাজত্ব করতে অনেক কিছুই করতে হয়; নিজের জন্য না হলেও রাজ্যের স্বার্থে করতে হয়।

অতিথিরা চলে গেলে বিভীষণ একা মন্ত্রণাকক্ষে বসে রইল। সিংহাসনের হাতলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ডান হাতের তেলোর উপর মুখ রেখে চুপ করে বসেছিল। অনেকগুলো চিন্তা তার মস্তিষ্কের ভেতরটা তোলপাড় করে দিচ্ছিল। চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয় এল। নিজের এলোমেলো ভাবনায় বুঁদ হয়ে যেতে যেতে বিভীষণ নিজেকে প্রশ্ন করল : তুমি কী চাও ?

বিভীষণের ভেতর থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জবাব দিল : সাম্রাজ্য !

ব্যস, আর কিছু চাও না ?

চাই প্রভুত্ব। যশ, মান, খ্যাতি।

তোমার চাওয়া শেষ ; তা হলে ?

নিরুচ্চারে বিভীষণ বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে বলল : না। ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মনে মনে বলল : আমি চাই প্রজাদের ভালোবাসা। তাদের হাত থেকে গলা বোঝাই ফুলের মালা।

তোমার চাওয়া তা-হলে অনন্ত !

হ্যাঁ, আমার চাওয়ার কোন শেষ নেই। আমি শুধু পেতে চাই। পেতেই হবে আমাকে। যা পাব না ; আদায় করে নেব।

নিজেকেই প্রশ্ন করল : কীভাবে ?

ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে হোক জয় চাই আমি।

নিজেকে বাহবা দিয়ে বলল বিভীষণ: ধন্য। এই না হলে পুরুষ সিংহ। বুকের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে কে যেন ব্যঙ্গ করে বলল; মন্দোদরীকে জয় করবে কোন মন্ত্রে পুরুষসিংহ?

প্রশ্নটা তীরের মতো একেবারে তার মর্মস্থলে বিদ্ধ করল। দুঃখে-যন্ত্রণায়, প্রেমে-সোহাগে, আনন্দে-কান্নায় তার ভেতরটা ককিয়ে উঠল। হঠাৎ, ভেতরে কীসব জমে থাকা জিনিস গলে গলে পড়তে লাগল। সেই সব গভীর অজানা অনাস্বাদিতবোধ তার বুকে যে বিশ্বাসঘাতকের মতো লুকিয়ে ছিল বিভীষণ জানত না। হঠাৎ করে কে যেন ছুরি মারল সেইখানে। হতাশ কণ্ঠে কষ্টে বলল নিরুচ্চারেঃ জানি না। স্বপ্নের মন্দোদরীকে ভীষণভাবে চাই। চাইলেই মায়া হরিণকে ধরা যায় কি? মানুষের সব চাওয়া পাওয়ায় পর্যবসিত হয় না, তবু তার পেছনে ছোটে অবিরাম। সুন্দর চাওয়ার যা কিছু ইচ্ছে তা নিবৃত্ত করতে না পারার মধ্যে মরীচিকার মতো এক ধরনের তীব্র আকর্ষণ থাকে। তেমনি মন্দোদরী আমার জীবনের এক মরীচিকা। জয়ের নেশায় ছুটছি তার পেছনে। তাকে নিয়ে ভেবেছিলাম অনেক কিছুই। হয়নি কিছুই, স্বপ্ন ঘোরে পায়ে পায়ে, ধুলোয় ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে। এখন বুঝি, কোনো কোনো ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থরূপ নয়। একাই ভালোবাসা মানুষের জীবনে স্বর্গ এনে দেয়, চারপাশটা সুগন্ধে ভরিয়ে দেয়, আবার তারই এমন রূপ আছে যা মানুষকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বাইরে থেকে উভয়ের রূপ দেখতে একই যেন দুই যমজ ভগ্নী; একজন প্রাণ দেয়, অন্যজন হরণ করে। মন্দোদরীর ভালোবাসাটা সেইরকম। সে আমার তৃষ্ণা এবং দাহ। তার সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে না উঠলে আমার জীবন পবিত্র থাকত। আমি এক অন্য মানুষ হতে পারতাম। তার জন্য সরমাকে হারলাম। আমার মতো নির্বোধ আছে কে? কথাগুলো মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে— যার নাম হাহাকার?

॥ আট ॥

লঙ্কায় সর্বত্র এখন পরিবর্তনের ঢেউ। দেখতে দেখতে লঙ্কার শ্রী ও সৌন্দর্য আমূল বদলে গেল। রাবণের লঙ্কা এক নতুন রূপ নিল। ময়দানবের হাতের লঙ্কা কয়েক বৎসরের মধ্যে মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল। নতুন যুগের নতুন শিল্পপতি ও স্থপতি ভাস্করবর্মণের হাতে লঙ্কা শুধু অপরূপ নগরী নয়, এক সমৃদ্ধ দেশ। সমৃদ্ধ সুন্দর নগরই দেশের অর্থনীতির দর্পণ। তাই তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যা যা করলে ভালো হয় তার সব দায়িত্ব ভাস্করবর্মনকে দিল বিভীষণ।

বাইরের লোক নগর দেখে মুগ্ধ হলো। বড় বড় রাস্তার দু'পাশে বিরাট বিরাট চিত্তাকর্ষক অট্টালিকা হয়েছে। পাকা রাজপথের দু'ধারে ঝাউ, দেবদারু এবং বাহারী

গাছ পাহারদারের মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আগন্তুকদের। চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে গোলাকৃতি সাজানো উদ্যান, নানা জাতের চোখ জুড়ানো ফুল। নানারকম পশু-পাখির চিড়িয়াখানা আর ফোয়ারা। সূর্যের আলো পড়ে রামধনু সৃষ্টি হয়। এছাড়া নগরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে আছে নজর কেড়ে নেওয়া ভাস্কর্য; নৃত্যের দেবদাসী, নটরাজ, সতীহারা মহেশের উন্মাদ রূপ, হরপার্বতীর মিথুন মূর্তি, ঢুলিবাদকের মর্মর মূর্তি, আরো কত কী? নগর তো একটা ছবি যেন। লোকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে আর বাহবা দিচ্ছে বিভীষণকে। তার রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করছে। ভুখা মানুষও পেটের খিদে ভুলে গিয়ে বিস্ময়ে সমৃদ্ধ নগরীকে দেখে। দেখে গর্ব হয়, আনন্দ হয় আর একটা অদ্ভুত সুখ ও তৃপ্তি বিভীষণের বুকে ঢেউ দিয়ে যায়।

নিজের ভাগ্যকেই বিভীষণের এখন ঈর্ষা হয়। কী অবস্থা থেকে উঠে এসেছে সে। গর্ব হলো বিভীষণের। লঙ্কাকে সমৃদ্ধ করেছে কে— রাবণ, না বিভীষণ? বুকের গভীর থেকে তৎক্ষণাৎ কারা যেন হাজার হাজার সমবেত কণ্ঠে বলে উঠে— বিভীষণ আবার কে? লঙ্কায় যা কিছু গর্বের আনন্দের, আত্মশ্লাঘার তা সবই বিভীষণের সৃষ্টি। ইন্দ্রের অমরাবতীও বিভীষণের লঙ্কার কাছে হার মেনে যায়। রাবণের লঙ্কাকে নতুন দিগন্তের দিকে মুখ ফেরাল বিভীষণ। এটাই তার কৃতিত্ব। বিভীষণের অধরে মৃদু হাসি। অহঙ্কারের হাসি। তৃপ্তি সুখের অনির্বচনীয় আনন্দে গৌরবে তার বুকের ভেতরটা ভরে ওঠে। আরামে দু চোখ বুজে আসে। আর তখনই মনে হয় এই লঙ্কার মাটিতে আর পাঁচটা আদিম কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের মধ্যে তার জন্ম। সে এদেশ থেকে আলাদা কিংবা বিচ্ছিন্ন নয়। এদেশের অরণ্য, মাটি, মানুষজন, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, রাতের আঁধারের সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড়। এদের ভীষণ ভালোবাসে সে। এর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভব করে ধুলোর গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ। তার যা কিছু উত্তেজনা, উন্মাদনা, আনন্দ, সুখ সব এদেশে ওদেশের মানুষকে ঘিরেই। মানুষ হোক এই চিন্তাই করেছিল সেদিন।

মানুষের ভালো চেয়ে একদিন রাবণও কুবেরের হাত থেকে লঙ্কাকে উদ্ধার করেছিল। দেশের মাটি থেকে তাকে বিতাড়িত করে মাতামহের সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করেছিল। লঙ্কার নৃপতি হয়ে রাবণ লঙ্কাকে দ্রুত সমৃদ্ধশালী করল। সুখ, শান্তি, প্রাচুর্যতে ছাপিয়ে গেল লঙ্কার জীবনযাত্রা। সকলে ধন্য ধন্য করল রাবণকে। দেশের মানুষ রাবণকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে।

তবু প্রদীপের নিচে অন্ধকার থেকেই যায়। রাবণ তা নিয়ে কোন কালে মাথাই ঘামায়নি। সেই অন্ধকারের সঙ্গে তার নিজের তামসও মিশে ছিল। সে তামস যাওয়ার কথা নয়। প্রদীপের ঔজ্জ্বল্য তারতম্য হয় না তাতে।

রাবণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই চুপি চুপি তাকে জনতার কাছে অপ্রিয় করে তুলল। রক্তে তার সাম্রাজ্য লোভের বাসনা। সে চায় গোটা পৃথিবীর আধিপত্য। বিশ্ববিজয়ের দুর্মর

উন্মদনা তাকে নিজের রাজ্যে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। নিরন্তর জয়ের উন্মাদনায় সে বারংবার লঙ্কা থেকে অভিযান করেছে। সেজন্য সর্বক্ষণ লঙ্কার মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর শোক, ব্যথা, যন্ত্রণা তাদের রাবণ-বিদ্বেষী করে তুলল। কিন্তু জনতার অসন্তোষের কথা, বিরাগের কথা তার কানে পৌঁছল না। মানুষের বুকে জমানো কান্নার দিকে রাবণ ফিরে তাকাল না। তাদের মনটাকে না বোঝার জন্য জনতার আনুগত্য প্রতিদিন হারাতে লাগল রাবণ।

বিভীষণের সেই প্রথম মনে হলো, মানুষ রাবণের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার হাত থেকে মুক্তি চাইছে। তারা হাঁফিয়ে উঠেছে সবাই। মানুষের বুকের কান্না বিভীষণ কান পেতে শুনল। তাদের কাছে রাবণের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাবণ তাদের বন্ধন তার প্রতি আনুগত্যকে অভিশাপ মনে হয়। তবু তার কড়া শাসনের মধ্যে বন্দী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে তারা। এ থেকে তাদের মুক্তি নেই। অথচ এই রাবণ একদিন কুবেরের অমানবিক পীড়ন, শোষণ থেকে, ক্ষুধা থেকে তাদের শুধু মুক্ত করেনি। সুখ, আরাম, ধন, ঐশ্বর্য সব দিয়েছিল। কেবল মনের শান্তিটা দিতে পারেনি। শান্তির জন্য ক্ষুব্ধ আত্মা বিদ্রোহী হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। বাইরে দেখে তার আঁচ টের পাওয়ার উপায় ছিল না।

ঘটনার পর্যালোচনা করতে করতে বিভীষণের মনে হলো ভ্রাতৃবৎসল ভাই হিসেবে তার কিছু করণীয় আছে। কিন্তু রাবণ নামের মহিমার পাশে সে একেবারেই নিষ্প্রভ। বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী ভ্রাতার ভ্রাতা হওয়া দুর্ভাগ্য। তারা বড় হতভাগা। ক্ষমতা, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব থাকলেও সহজে স্বীকৃতি পেতে চায় না। লোকে তাদের আমল দেয় না। তাদের আলাদা কোন সম্মান নেই, গৌরব নেই, স্বীকৃতি নেই, এই চরম সত্যটি বিভীষণ তার সমস্ত জীবন দিয়ে অনুভব করেছে। স্নেহবৎসল ভ্রাতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার আশ্রয়ে ভ্রাতৃবৎসল অনুগত ভাই হয়ে থাকতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সহিষ্ণু বিবেচক মনটা ক্ষুব্ধ হয়। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাবধানী মনটা সতর্ক করে দেয় এই ধরনের আত্মপ্রকাশের জন্য কী ভীষণ দাম দিতে হয় বলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

ভ্রাতৃবৎসল বিভীষণের ভেতরটা চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল একদিন। অগ্রজের অমঙ্গল চিন্তা করে বলল : দাদা তোমার ভুল হচ্ছে কোথাও। যোগ-বিয়োগের ভুল। এ ভুল শোধরানোর জন্য তোমাকে কিছু বলা উচিত মনে হয়েছে।

রাবণ হেসে বলল : তোমার অঙ্কের হিসাবটা তা হলে শুনতে হয়। তুমি বল।

দাদা, কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরা শ্বেতাঙ্গ মানুষদের হাতে অনেক নিগ্রহ, অপমান ভোগ করেছে। লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা পেয়েছে। তাদের মানুষ মনে করে না তারা। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠেছ। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে কী? তাদের সঙ্গে আমাদেরও হারাতে হচ্ছে অনেক। লাভ কিছুই হচ্ছে না।

রাবণের অধরে টেপা হাসি। চোখে কৌতুক। বলল : লাভ-ক্ষতির হিসাব সোজা অঙ্ক নয়। দেশের বাইরে লঙ্কার নিজস্ব গৌরব, মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এটুকু মূল্য দেশবাসীকে দিতেই হবে। কৃষ্ণবর্ণ জাতি যে শ্বেতাঙ্গদের ধনে-মানে, সম্পদে, ঐশ্বর্যে, বীরত্বে-হীন নয়, অবজ্ঞার পাত্র নয়, বরং তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং সম্মানের পাত্র, মানুষ হিসেবে তাদেরও আলাদা মর্যাদা আছে, শ্রেষ্ঠত্ব আছে, এবং তারা চাইলে শ্বেতাঙ্গদের পদানত করতে পারে, অনুগ্রহ দেখাতে পারে এই সরল সত্যটা শ্বেতাঙ্গরা আজ স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। এতবড় একটা লাভকে তুচ্ছ করে দেখার কোনো কারণ আছে কি?

দাদা, আমি বলছি না, রাক্ষসদের শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নির্মূল করার যুদ্ধে রাক্ষসরা শয়ে শয়ে প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু লঙ্কা হারাচ্ছে তাদের বীর সন্তান, জননী হারাচ্ছে তার পুত্র, স্ত্রী হারাচ্ছে তার পতি, সন্তান হারাচ্ছে তার পিতা। বহু পরিবারের থিত-ভিত ভেঙে পড়ছে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। এতে লঙ্কার ক্ষতি হচ্ছে। তুমি এ অভিযান বন্ধ করে স্থিতু হয়ে বস। অনেক হয়েছে, আর চাই না।

রাবণ সহসা গম্ভীর হলো। তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং বিমর্ষ দেখাল। শান্ত অথচ থমথমে গলায় বলল : বিভীষণ তোমার কথা সত্য। বাধা আছে বলেই মানুষ বাধা উত্তরণের জেদ ধরে। তবু পথের শেষে যা আছে তার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতে হয়। পথটাও সত্য, পথের শেষটাও সত্য। এই পথটাকে অতিক্রম করতে আমাদের অনেক মূল্য দিতে হবে, কিন্তু অতিক্রম না করলে কৃষ্ণকায় মানুষদের অন্তরে লুকানো বহুকালের যন্ত্রণা কষ্টের অবসান হবে না। তাদের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা একদিন সকলের কল্যাণ হয়ে গোটা জাতিকে অভিষিক্ত করবে। এইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা এবং আকাঙ্ক্ষা। সহায়-সম্বলহীন অবস্থার একদিন লঙ্কার মাটিতে গৃহহীন বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের মতো আমিও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। তারপর সেই ছোটবেলাতেই কোন দুঃখ, যন্ত্রণার মাটিতে একটা বিদ্রোহী মনের জন্ম হয়েছিল, নিজেও জানি না। সেই মনটা আজও সুখে স্বস্তিতে, আনন্দে, নিশ্চিন্তে এবং শান্তিতে থাকতে দেয় না। দুঃখ, বেদনায়, কান্নায়, অভিযোগে ক্লান্ত হয় না। পাথর মনটা কেবলই খোঁজে তার অতীতকে। কুবেরের ভূত এখনও আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি। অসংখ্য মানুষের মধ্যে আমি তার ছায়া টের পাই। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে। খুব আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীতে আমার মতো মানুষদের পাশে হয়তো কেউ থাকে না। কেউ থাকার জন্য আমাদের মতো মানুষদের জন্ম হয় না। কেউ যদি থাকে আমার তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে কেমন করে? দেশের অগ্রগতির চাকা চলবে কী করে? আপনজন থাকা বড় বিপদ। নিষেধের বেড়ায় চলার পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়।

রাবণের কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা মুগ্ধতা ছিল যে বিভীষণ তর্ক করতে পারল

না। রাবণের জীবনটা এক মহাসংগ্রামের জীবন। * সংগ্রাম সে সারা জীবন করছে। আর, বারে বারে সংগ্রাম অতিক্রম করতে গিয়ে আর একটা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। এ সংগ্রামের শুধু বাইরের সঙ্গে নয়, ভেতরের সঙ্গে। রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে পদার্পণের পর থেকে তার এক নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে নিজের সঙ্গে অন্তরে এবং বাইরে।

বিভীষণের সেই প্রথম মনে হলো রাবণের আত্মবিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরেছে। আর সেই ফাটলের ফাঁকে অশ্বত্থের অঙ্কুরের মতো দুরন্ত শত্রুতা নিঃশব্দে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। লোক চোখের অন্তরালে মহীরুহ হয়ে দুর্গের পাথরের দেওয়ালটাকে ভেঙে চৌচির করে দেবে কেউ কল্পনা করতে পারে না। রাবণও স্বপ্নে ভাবেনি প্রিয়ভ্রাতা বিভীষণ দুঃখী মানুষের একান্ত আপনজন হয়ে তার প্রতিপক্ষ হবে। ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতার সঙ্গে ধর্মপ্রাণ বিভীষণের এক বিরোধ বাধল।

রাবণের সামনে দাঁড়ালে বিভীষণের সব যুক্তি হারিয়ে যেত। কিন্তু নিজের কাছে হেরে যাওয়াটা তার হয়নি কখনো। চোখের সামনে হয়তো বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না বলেই নীরবে মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াটা তার অভ্যাস হয়ে গেছিল। যা ছিল তা শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞার একটা অতীত ইতিহাস। ভবিষ্যৎ তারই থাকে যার নিজের কিছু স্বপ্ন থাকে, প্রত্যাশা থাকে। হঠাৎই সে ভাবতে আরম্ভ করল যার কোন প্রত্যাশা থাকে না, সে মানুষ নয়। কলের পুতুল। রাবণের হাতে সেও একটা পুতুল বই কিছু নয়। তার নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নেই, প্রাণ নেই, মানুষ বলে যে এক ধরনের জীব সংসারে প্রাণী হয়ে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সকলের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে বেঁচে থাকে বিভীষণ যেন তা নয়। সে শুধু বাধ্য ও অনুগত ভাই। রাবণের আদেশ ও নির্দেশ মতো সব কিছু কাজই করে। মানে, করতে হয়। না করলে একজন অখুশি হবে তাই তার হুকুম পালন করা। এই হুকুম পালন করতে গিয়ে তার আত্মাটা ভেতরে ভেতরে কাঁদত, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। স্বপ্নে ঘনঘন যন্ত্রণায় উঃ-আঃ করে বিছানায় ছটফট করত।

সত্যিই যে বিভীষণের কী হয়েছে, তা সে নিজেও তখন ভালো করে জানত না। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে জীবনযাত্রা সুরু হতো, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হতো। সেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সব কিছু বদলে গেল রামের দণ্ডকারণ্যে পদাপর্ণের পর। লঙ্কার ভূগোল, জীবনযাত্রা, ইতিহাস, মানুষ সব কেমন আমূল বদলে গিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সূত্রে জট বাঁধালো,

* মৎলিখিত 'লঙ্কেশ রাবণ'এ রাবণের সংগ্রামী জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা এসে মানুষকে ধীরে ধীরে চোখের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দিল। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ বাধল দেশের সঙ্গে দেশের, কালোর সঙ্গে কালোর, স্বজাতির সঙ্গে স্বজাতির। অবশেষে, সেই বিরোধ এসে ঢুকল পরিবারের ভেতর। সংঘাত বাধল ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পুত্রের সঙ্গের পিতার। এ কী কম বিপর্যয়!

বিভীষণের ঘরেও তার ঢেউ এসে লাগল। পিতার নিরুত্তাপ মনোভাব, সর্বব্যাপারে তার অনীহা, ঔদাসীন্য মাঝে মাঝে তরুণ তরণীসেনকে ক্ষুব্ধ করত। এই মানুষটা চিরকালই বড় শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর। কোন কিছুতে তার অপ-উত্তাপ নেই। লক্ষ্মণের হাতে তার আপন সহোদরা শূর্পনখার লজ্জা এবং সম্ভ্রমহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন লঙ্কাবাসী ভীষণ ক্ষুব্ধ, অশান্ত তখনও বিভীষণ ভীষণ নীরব। ভালো-মন্দ একটা কথাও বলেনি। পাথরের মতো নিশ্চল, শীতল পিতার ঔদাসীন্য দূর করতে তরুণ তরণীসেন অসহিষ্ণু আবেগে বলল : বাবা, তোমাকে আমার খুব আশ্চর্য মানুষ মনে হয়। সবার থেকে তুমি একটু আলাদা। কিন্তু তোমার নিজের জনেরা কেউ তোমাকে মানুষ বলে ভাবল না। তুমি নরদেহে রক্তমাংসের এক পাথরের মূর্তি। তোমার হৃৎপিণ্ড নেই, মগজ নেই, বোধশক্তি নেই, সুখ-দুঃখ নেই। বাইরের লোকেরা যে চোখে দেখে, সেটা মিথ্যা প্রমাণ করার কোন দায় নেই তোমার। ছেলে হয়ে আমারও মনে হয় তারা একটুও মিথ্যে বলছে না। এ যে আমার কাছে কী লজ্জার, অপমানের তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

বিভীষণ একটু মলিন হেসে বলল : আমাকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলাতে না পারার জন্য তোমার দুঃখ থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব থাকে। কারো সঙ্গে কারো ব্যক্তিত্ব মেলে না। মেলাতে চেও না। তাতে দুঃখ পাবে শুধু। এটা হলো ব্যক্তিত্বহীনতার যুগ। কী মানে আর কী মানে না সেটাও বোঝে না ভালো করে। চিন্তার দৈন্যে বেশির ভাগ মানুষের সদগুণগুলি ঢাকা পড়ছে, না হলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তরণীসেন এক আশ্চর্য তন্ময়তা নিয়ে পিতাকে দেখতে লাগল। বুকের মধ্যে তার অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল। অনেকক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : পিতাকে নিয়ে পুত্রের গর্ব করার মতো কিছু থাকল না। বড় হতভাগ্য আমি। অথচ, গোটা লঙ্কাবাসী তোমার সহোদরের অপমান, লাঞ্ছনা এবং সম্ভ্রমহানির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য গর্জে উঠেছে। তাদের জাতীয় আবেগ টগবগ করে ফুটছে। কেবল তুমি শান্ত আছ। তাপ উত্তাপ তোমার কিছু নেই। তুমি কী? দেশ ও জাতির সংকটে তুমি গা বাঁচিয়ে চললে বাঁচবে ভেবেছ? নগর পুড়লে দেবালয় কি রক্ষা পায়?

বিভীষণ আস্তে আস্তে হেসে বলল : প্রশ্ন তোমার। জবাব তুমিই দেবে। জমানা

বদলে গেছে, না ?

নিশ্চয় ! দেশটা তো পিতৃব্য রাবণের একার নয়। সমগ্র লঙ্কাবাসীর। সমস্ত দেশবাসীর মর্যাদা জড়িয়ে আছে। কেবল তোমার কোন অনুভূতি নেই। তাতে তুমি সবাকার কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠছ। লোকের বিষ সন্দেহ আমাকেই সকলের চোখে ছোট করে দেয়। ছোট হবার মনের জ্বালা যদি তুমি বুঝতে তাহলে তোমার উপর আমার কোন অভিযোগ থাকত না। তুমি ভীষণ স্বার্থপর। নিজের কথা ভাব শুধু। নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাস না। তোমার মতো মানুষরা এ যুগে সবচেয়ে কৃপার পাত্র। বোধ হয়, দেশের বড় শত্রু।

বিভীষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। পুত্রের কথায় রাগ করল না। কিন্তু এক গভীর অপমানে তার মুখ তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হলো। তবু অধরে হাসি নিয়ে বলল : পুত্র, তোমার কথায় আমার রাগ করতে নেই। আমি রাগ করলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। বিধাতা আমাকে পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু করেছেন। তুমি ছেলেমানুষ। বিভীষণ কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক। মুখ দিয়ে অসাবধানে কথা বেরোয় না সহজে। ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকল।

বাবা, তোমাকে আমি বুঝি। তুমি কী চাও ; জানি না। তুমি ঋষিও নও, সন্ন্যাসীও নও। আর সবারই মতো সাধারণ মানুষ। এক দুর্বোধ্য মানুষ। কিন্তু পিতৃব্য লঙ্কেশকে নিয়ে দেশের মানুষ গর্ব করে। তিনি অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। যে বিচার ক্ষমতার তিনি অধিকারী, সে ক্ষমতা কেউ তাঁকে দেয়নি, তা তাঁর নিজের অর্জিত। ব্যক্তিত্বের জোরে, চরিত্রগুণে বহু মানুষ বিশ্বাস করে এ ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। আর মহান মানুষটা বহুর কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে দেশ ও জাতির সেবায়। তাঁর বংশের সন্তান হওয়ার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। বড় ধন্য মনে হয় নিজেকে। কিন্তু যখন মনে হয়, আমি তোমার পুত্র তখন লজ্জা পাই, অপমান বোধ করি।

পুত্র, তুমি অগ্রজ দশাননের কাজে কোন অন্যায় দেখতে পাও ?

পাই, নিশ্চয়ই পাই। দেবতারাও অনেক অন্যায় করে থাকেন। কিন্তু যে দোষের জন্য পিতৃব্যকে দোষী করতে তুমি চাইছ, সে অপরাধে অপরাধী নন তিনি। সীতা হরণের জন্য লক্ষ্মণ দায়ী। দোষ রামচন্দ্রেরও। জেনে শুনে সীতাকে সরিয়ে দিয়ে এক অন্য মহিলাকে তার জায়গায় এনে বসিয়েছেন। বিপদের আঁচ পেয়ে আপন স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য যা করছেন তা কোন দোষেরই নয়। কিন্তু নকল সীতা হরণের জন্য তার বাড়াবাড়িটা দোষের। সংঘাত বাঁধানোই তার উদ্দেশ্য।

বিভীষণের মুখের হাসি বেশ একটু গোলাকার হলো। বলল : পুত্র তোমার সব কথা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার অঙ্কটা যে মিলছে না বাবা। নকল সীতাকে তোমার পিতৃব্য ছেড়ে দিতে নারাজ কেন ? তাকে ছেড়ে দিলে তো এযুদ্ধ হয় না। মিথ্যেই একটা ঘটনাকে মর্যাদার লড়াই করে অগ্রজ ভুল করছে। দেশশুদ্ধ মানুষের

যে অঘটন হবে তাতে, এই কথাটা কিছুতে বোঝাতে পারেনি তাকে।

বাবা, রামচন্দ্রকে একটা মিথ্যে ব্যাপারকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে লোককে বিভ্রান্ত করে পিতৃব্য রাবণের যশ, খ্যাতি ও চরিত্র গৌরবকে কলঙ্কিত করছেন কেন ? তিনি তো মীমাংসা চান না। আপোষের বদলে রণং দেহি মূর্তিতে জল ঘোলা করছেন। তুমিও জান, কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালি পিতৃব্য রাবণের মিত্র। কিস্কিন্ধ্যা এবং লঙ্কার সুসম্পর্ক অনেক কালের। তবু লঙ্কার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যই শ্রীরাম কিস্কিন্ধ্যাকে প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি করে তোলার পরিকল্পনা করলেন। অথচ, কী আশ্চর্য দেখ, দেশের অধিপতি বালির শরণাপন্ন না হয়ে শ্রীরাম রাজদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী ঋক্ষপর্বতে নির্বাসিত তারই অনুজ ভ্রাতা সুগ্রীব এবং তার কিছু অনুগামীদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হলেন। বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে রাজা করে দেবেন, বিনিময়ে কিস্কিন্ধ্যাকে যুদ্ধ ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করবেন। তা হলে বুঝতে পারছ, রাবণ না চাইলেও রামচন্দ্র লঙ্কার সঙ্গে যুদ্ধ করত। লঙ্কার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যই তো বালির চেয়ে রাজ্যহীন সুগ্রীবকে তাঁর বেশি পছন্দ। সুগ্রীবের দুর্বলতা এবং আনুগত্যই তাঁর যুদ্ধ প্রস্তুতির মূলধন।

পুত্র, তোমার বিচার-বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার প্রশংসা করি। কিন্তু আমি একেবারে, অন্য কথা বলব। দোষ রামচন্দ্রের নয়, দোষ-সে দেশের জল-মাটি-হাওয়ার। দোষ মানব চরিত্রের।

ছি, ছি, একী কথা বলছ তুমি।

পুত্র, নীতির দুটো দিক আছে। দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, সভ্যতা সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে নীতি তা হলো আদর্শবাদী নীতি। এই নীতি নিয়ে দুনিয়া চলে না। যে নীতি ব্যবহারিক তা নির্দিষ্ট হয় সমাজ, ধর্ম, আর্থিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন দিয়ে। সাম্রাজ্য তৈরি করতে গিয়ে সব নরপতিই এমন কোন দুর্নীতি নেই যা প্রয়োগ করে না।

তাতে কি প্রমাণিত হয় ? রামচন্দ্রের যদি সদুদ্দেশ্যে থাকত, লঙ্কার সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে মীমাংসার জন্য বালির মিত্রতাকে মূলধন করে তৃতীয় পক্ষ রূপে তাকে মধ্যস্থ করে ছায়া সীতার ব্যাপারটা অনায়াসেই মিটিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু রামচন্দ্র তা করেননি। পাছে, বালি তাঁর রাজশক্তি বিস্তারের অন্তরায় হয় তাই তার বাধা দূর করার জন্য, তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সুগ্রীবের ভ্রাতৃদ্রোহীতার সুযোগ নিলেন। বালির মতো সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা অনেক। তাই, তার বেঁচে থাকাটা রাম মনে প্রাণে চাননি। চাইলে, বালিকে কাপুরুষের মতো অলক্ষ্য থেকে তীর বিদ্ধ করে জঘন্যভাবে হত্যা করতেন না। রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্য, আধিপত্যর জন্য নিজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে রামের একটুও মনোকষ্ট হয়নি। নীতিহীন, বিবেকহীন, ধর্মহীন কাজের জন্যও তাঁর অনুতাপ নেই। স্বার্থের জন্য রামচন্দ্র পারেন না এমন কাজ নেই।

পুত্রের কথাগুলো বিভীষণ উপভোগ করছিল। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারছিল না। বরং একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু জোর করে অধরপ্রান্তে প্রতিপদের চাঁদের মতো এক ফালি বাঁকা হাসি জীইয়ে রেখে কৌতুক করে বলল : যেমন!

প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলো তরণীসেন। কৌতূহলী দুচোখ মেলে তাকে বুঝতে চেষ্টা করল। ঠিক ধরতে পারল না, এটা পিতার কৌতূহল, না রঙ্গ! তরণীসেন নিজের বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে ফেলল। অমনি বাঁকা হাসিতে ধনুকের মতো তার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হলো। বলল : সব লঙ্কাবাসী একথা জানে। তোমারও অজানা নয়। তবু সব শুনে তোমার এই অবাক হওয়ার ভাণ, আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। রামচন্দ্র বিরোধ ও যুদ্ধ চায় বলেই বালিকে হত্যা করে মিটমাটের রাস্তা সর্বাগ্রে বন্ধ করেছে। সংঘাতকে জীইয়ে তোলার জন্য বালির চেয়ে সুগ্রীবের মিত্রতা তাঁর অধিক কাম্য মনে হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে ; তুমি কি লঙ্কার মানুষ, না অন্য কোন গ্রহের লোক? তুমিও দেখেছ, পিতৃব্য সংঘাত এড়িয়ে চলছে বলেই তাঁর ভগিনী শূর্পনখাকে লাঞ্ছিত করল লক্ষ্মণ। এর আগেও বীরপুঙ্গব অয়োমুখীর স্তন ছেদন করেছে। তবু প্রজাপালক রাবণ ক্রোধের বশে রামকে শাস্তি দিতে কোনো যুদ্ধ করেনি। কিন্তু ভগিনী শূর্পনখাকে অস্ত্রাঘাত করে লক্ষ্মণ বর্বরের মতো যে আচরণ করল সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য মুখ বুজে তাকে সহ্য করলে পিতৃব্যের নিন্দে হতো। তার গৌরবহানি হতো। তাই রামের স্ত্রী হরণ করে রামের পৌরুষগর্ব খর্ব করা এবং সম্ভ্রমহানি করার এক স্নায়ুচাপ সৃষ্টি করেছিল। পিতৃব্য অপহৃতা রমণীর সঙ্গে বর্বর আচরণ করেনি, কিংবা সম্মানহানির কোন কাজ করেনি। রামচন্দ্র যেন তেন প্রকারে পিতৃব্যের সঙ্গে একটা যুদ্ধ চায়, সেই যুদ্ধটা করার জন্য শূর্পনখা এবং অয়োমুখীর সম্মানহানি করেছে। যুদ্ধটা জীইয়ে রাখার জন্য এবং মীমাংসার দরজা রুদ্ধ করে দেবার জন্য বালিকে হত্যা করেছে। চাওয়াটা দু'জনের সঙ্গে দু'জনের মিললে তবেই তার সমাধান হয়। তাই বলছিলাম, তোমার কথিত ব্যবহারিক নীতির মধ্যে এমন কোন দুর্নীতি নেই, কপটতা নেই যা রামচন্দ্র করেনি।

তরণীসেনের কথাগুলো রাবণের কথার প্রতিধ্বনি হয়ে বিভীষণের কানে বাজতে লাগল। বিভীষণ, তুমি ছাড়া লঙ্কাপুরীর কোন রাক্ষস বলবে না রাবণ দোষী। সারাজীবন আমি রাক্ষসদের ভালো চেয়েছি। তবু, তাদের কেউ কেউ আমার কথা শোনেনি। তুমিও না। জাতীয় সঙ্কটকালে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার করার দায়িত্ব সকলের। বিরোধকে যে উস্কে দেয়, সে দেশের শত্রু। তোমার বিচারবোধহীন নির্বোধ উক্তি কেবল সংশয় সৃষ্টি করবে। তোমাকেই প্রশ্ন করব— নারীহরণ আর নারী অঙ্গ বিকৃতিকরণের মধ্যে কোনটা বেশি অমানবিক আর বর্বর? লক্ষ্মণের আচরণের জন্য রাম দুঃখ প্রকাশ না করে একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলল। সীতা বলে যাকে হরণ করল সে আদৌ সীতা নয় ; ছায়া সীতা। আসল সীতাকে অত্রিমুনির আশ্রমে আগেই সরিয়ে দিয়েছিল রাম। নকল সীতা নিয়ে লঙ্কাকে নাকাল করার কোন যুক্তি নেই রামের। তার সঙ্গে সংঘর্ষ

বাধার কথা নয়। তবু হচ্ছে, এটাই আশ্চর্য! একটু থেমে বিভীষণের দিকে কালো চোখ মেলে প্রশ্ন রাবণ করল, আচ্ছা বিভীষণ, রামচন্দ্রের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণার বিরুদ্ধে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হয় না কোনো? তুমি কী চাও?

বিভীষণ মাথা হেঁট করে অপরাধীর মতো বলল : এখন তো চাওয়ার কিছু নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করা। দু'পক্ষই যুদ্ধর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সীতা হরণের এই নাটক কোথায় গিয়ে কীভাবে শেষ হবে কেউ জানে না।

অমন করে বল না বিভীষণ। স্পষ্ট করে বল রামের পত্নী সীতা নয়, শরণাগত ছায়া সীতার সম্মান রক্ষার জন্য রামের যুদ্ধের প্রস্তুতি যেমন সমর্থনযোগ্য তেমনি ভগিনীর সম্মান বাঁচানো এবং একজন সাধারণ রাক্ষস রমণীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তেমনি কোন আদর্শ বিরোধী কাজ নয়। স্বদেশবাসীর কর্তব্য। কেবল তোমার ভাবনা চিন্তাটাই একটু আলাদা।

বিভীষণ উত্তর দিল না। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে রইল। রাবণই তার খুব কাছে সরে গিয়ে বলল : সাম্রাজ্যলোভী রামচন্দ্র তেরো বছর ধরে অপেক্ষা করে আমাকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারেনি। আমার ধৈর্যের পাহাড়ে ফাটল ধরানোর জন্য রাক্ষসদের প্রতি তার অবজ্ঞা, ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ উগরে দিল। প্রথমে অয়োমুখী, তারপর শূর্পনখাকে দিয়ে জঘন্য নারী লাঞ্ছনার এক নজির স্থাপন করে রামচন্দ্র আমাকে সংঘাতের মধ্যে টেনে আনল। সংঘাত রামের সৃষ্টি। তবু, তুমি ছায়াসীতাকে রামের হাতে অর্পণের জন্য জেদাজেদি করছ। তাকে অর্পণ করলেও রাম তাকে পুনর্বার গ্রহণ না করে, নানারকম অপবাদ দিয়ে তার ও আমার চরিত্র হনন করবে। যুদ্ধ বন্ধ হবে না কিন্তু আমি অনেক কিছু হারাব।

বিভীষণকে চুপ করে থাকতে দেখে রাবণ ভীষণ অপমানিতবোধ করল। রাগটাকে বুকের মধ্যে চট করে লুকিয়ে ফেলে বললঃ বিভীষণ। তোমারও সুগ্রীবের মধ্যে পার্থক্য নেই। কূট কৌশলটা কেবল আলাদা। আমার রাজ্যে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহীর কোন স্থান নেই। তোমাকে অচিরেই এদেশ ছেড়ে যেতে হবে। তুমি অনেক ক্ষতি করেছ লঙ্কার। শুধু ভাই বলে তোমাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু আর তোমার লঙ্কায় থাকা চলবে না। হনুমানের সঙ্গে তোমাকেও তাড়ালে ভালো হতো। সিদ্ধান্ত নিতে বড় দেরি হয়ে গেল। লঙ্কার ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তোমার কথাতেই বলি ; এখন শুধু অপেক্ষা করা।

বিভীষণকে অপেক্ষা করতে হয়নি। বিধাতা তার নিজের অজান্তেই অনেক আগেই লঙ্কার বাইরে বেরোনোর নিরাপদ পথ প্রস্তুত করে রেখেছিল। তাকে কিছু করতে হয়নি। সে শুধু নিমিত্ত। একটার পর একটা বাধার দরজা তার সামনে খুলে গেল, আর সে তার মধ্যে একে একে প্রবেশ করতে লাগল।

যুদ্ধের উন্মাদনার আবেগ ও উত্তেজনায় সারা দেশের মানুষের আবেগ যখন টগবগ

করে ফুটছে, সেই সময় গোপনে সাগর পার হয়ে সকলের নজর ফাঁকি দিয়ে রামের চর হয়ে হনুমান সাধুর ছদ্মবেশে একেবারে লঙ্কার অভ্যন্তরে ঢুকল বিবাদ বাধাতে এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর লঙ্কাবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা খুব বেশি। তাদের ক্রোধ, অসন্তোষকে ভয় পায় তারা। তাই ছদ্মবেশী হনুমানকে তারা একজন হিমাচলবাসী সাধু সন্ত এবং ভবিষ্যৎবক্তা ভেবেই প্রচুর আদর, আপ্যায়ন এবং সম্মান করতে লাগল। তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার রন্ধ্রপথ ধরে হনুমানও সাবধানে মন ভাঙানোর এক আশ্চর্য খেলা শুরু করল। সুদূর গ্রামের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে সে তাদের মনের অভ্যন্তরে লঙ্কার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করল। বলল : রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় রাজ্যের দখল নিয়ে। কিন্তু এ যুদ্ধ একজন রমণীকে পাওয়ার জন্য। এর ফল কখনো ভালো হয় না। একবার অপরূপ এক রমণীর রূপ লাবন্যের আকর্ষণে মোহিত হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ দুই ভাইর বিরোধ বাধল। এ বিরোধ এবং সংঘর্ষ তাদের সৃষ্টি। অথচ, তারা দুভাই দুভাইকে ভীষণ ভালোবাসে। কেউ কারো অদর্শন একদণ্ড সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তিলোত্তমাকে দেখার পর সব গণ্ডগোল হয়ে গেল তাদের। ভ্রাতৃপ্রেমে বিরোধ বাধল। অথচ, কোন কিছুর অধিকার নিয়ে তাদের বিরোধ হয়নি আগে। তিলোত্তমা তাদের চিরকালের বিশ্বাস, আদর্শ ভেঙে তছনছ করে দিল। ত্যাগ ও ক্ষমার পাত্র শূন্য হলো। একতায় ফাটল ধরল। শুধু একজন রমণীর জন্য ভ্রাতৃপ্রেমকে হত্যা করল। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দু'জনকে ছুরি মেরে আত্মঘাতী হলো।

শ্রোতারা অভিভূত। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে সাধুবেশী হনুমান শ্রোতাদের কার কী প্রতিক্রিয়া অবলোকন করতে লাগল। ভিড়ের মধ্য থেকে একজনই কেবল বলল : এর সঙ্গে লঙ্কার সম্পর্ক কী ?

হনুমানের গাল ভর্তি হাসি। মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সমঝদারের মতো বলল : আছে। আছে। রাবণের অপহৃতা রমণীও তিলোত্তমার মতো কালাগ্নি হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ পাকিয়ে তুলেছে। ঐ রমণীর পুণ্যের আগুনে লঙ্কা পুড়ে ছারখার হবে। দেশপ্রাণ রাবণ প্রিয়দেশবাসীর সঙ্গে তাকে নিয়ে মরণযুদ্ধ খেলছে। রাবণের ভুল, ত্রুটি ব্যক্তিগত। তবু গোটা লঙ্কাবাসীর সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যকে জড়াল। কেন ? লঙ্কার ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে কার স্বার্থে ? সীতা নয়, ছায়া সীতার সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক কি ? তবু তাকেই রাবণ মর্যাদার লড়াই করে শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ চাইছে। এই যুদ্ধ লঙ্কার কোন উপকারে লাগবে ? যুদ্ধে জয়ী হলে লঙ্কা পাবে কি ? এ প্রশ্ন অনেকের। তবু মুখ ফুটে সাহস করে বসতে পারে না কেউ। রাবণ হারলে তাকে হারাতে হবে অনেক। জয়পরাজয় যাই হোক, একটা বড় লোকক্ষয় তো হবে। কত রমণী পতি-পুত্র হারাবে, কত সন্তান তার পিতা হারাবে, কত সংসার অবলম্বনহীন হয়ে পরবে ? লঙ্কার ঘরে ঘরে অচিরেই এক দুঃসহ শূন্যতা আর হাহাকার সৃষ্টি হবে। তার খোঁজ লঙ্কাবাসী রাখে কি ?

ছদ্মবেশী হনুমানের কথাগুলো সাধারণ লোকের মনে গেঁথে গেল। কথাগুলো বাতাসের মতো দ্রুত লোকের মুখে মুখে ছড়াল। একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। যে সব সাধারণ মানুষ দেশের জন্য যুদ্ধ করে তাদের মনে প্রশ্ন জাগলঃ এযুদ্ধের উপলক্ষ তো কোন দেশ নয়, সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, শুধু প্রতিহত করে পরাজয় এড়ানো। আশ্চর্যের কথা হলো যার জন্য যুদ্ধ সে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, তবু তাকে নিয়ে রাম-রাবণের মর্যাদার লড়াই কেন?

আবার অন্য একদল ভাবল, শূর্পনখা এবং অয়োমুখীর সম্মানহানি করা এবং নারী-অঙ্গ কর্তন করে গোটা লঙ্কার নারীজাতির ইজ্জতহানি করেছে রামচন্দ্র। এযুদ্ধ করা লঙ্কাবাসীর নৈতিক কর্তব্য। ছায়া সীতা হরণ করা রাবণের কোন দোষ হয়নি। এই অপহরণের জন্য লঙ্কার কোন রমণী রাবণকে দোষী করল না, অপবাদ দিল না। বরং রাবণকে মনে হলো একমাত্র পুরুষ যে, নারীকে সম্মানিত করেছে। রাবণের কাছে কৃতজ্ঞ তারা। ঘরে ঘরে লক্ষ্মণের নিষ্ঠুর, অমানবিক বর্বরতাকে তারা নিন্দে করল। রাবণের নারী হরণের জন্য লক্ষ্মণই দায়ী। লক্ষ্মণই কার্যত লঙ্কাবাসীর সম্মান, মর্যাদা, গৌরব ক্ষুণ্ণ করেছে। তা-হলে, তাদের এই দ্বিধা সংশয় কিসের জন্য? সেই প্রশ্ন একজন সাধারণ মানুষের মনেও জাগল, সাধুবেশী মানুষটি তা-হলে কে? ছদ্মবেশী রামের কোন গুপ্তচর হয়ে হয়তো তাদের মনের অভ্যন্তরে সংশয়, বিক্ষোভ বিদ্রোহের আগুন জ্বালছে। প্রত্যেকের ঘরে মনের আগুনে তাদের সুখ-শান্তি, আনন্দ পুড়তে লাগল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ হনুমানকে বন্দী করে আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা দেখভাল করার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিভীষণের হাতে অর্পণ করল।

বিভীষণ একান্তে হনুমানের সঙ্গে নিভৃত আলাপে বসল। তার প্রশ্নের আগেই হনুমান সম্পর্কটা সহজ করার জন্য বলল: রাবণানুজ বিভীষণ। শ্রীরামের দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি ভক্ত হনুমান। আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবল বাসনা অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় পূর্ণ হলো। পাহারাদারদের কড়া বেষ্টনী পেরিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারার কঠিন পথটা ধরা দিয়ে সহজ হয়ে গেল। নইলে, কোন কালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো না। লঙ্কাপুরীতে শ্রীরামের দূত হয়েই আপনার সন্দর্শনে এসেছি। অথচ, আপনিই দুর্লভ। আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলো দাস। এখন অনুমতি হলে সাক্ষাতের কারণ নিবেদন করতে পারি।

হনুমানের ধূর্ত কথাবার্তায় এবং আচরণে বিভীষণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলঃ আপনি চান কী, বলুন?

আমার কাছে খবর আছে, লঙ্কেশের নারীহরণের ঘটনা আপনার পছন্দ নয়? লঙ্কাপুরীতে আপনি সকলের থেকে একটু আলাদা। লঙ্কার ভালো করারে জন্য আপনি ব্যাকুল। লঙ্কাবাসীর উন্নতি হবে কিসে; গোটা লঙ্কা নগরী প্রাণের আনন্দে ও খুশিতে কী করলে ঝলমল করবে, লোকের নজর কেড়ে নেবে, তার স্বপ্ন বিফল হওয়ার

আর্তনাদ আপনাকে আত্মপ্রকাশের জন্য অস্থির করে। লঙ্কেশ্বরের দাপট প্রতিপত্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে রাজশক্তিতে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার প্রবল বাসনায় আপনার ভেতরটা অশান্ত। সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে গেছে। তাই তাঁর দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি। শ্রীরাম বলেন শক্তিমান হবার একমাত্র পথ শক্তি সঞ্চয়, শক্তি সন্ধি এবং শক্তিপ্রসার। অর্থাৎ শক্তি সঞ্চয় করতে হবে শক্তিমানদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে। বাস্তব মন নিয়ে বিশ্লেষণ করে শক্তির নিপুণ বিস্তার করতে হবে। শ্রীরাম আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রস্তুত। সাগর লংঘন করে তাঁর মৈত্রীর বার্তা নিয়ে আমি এসেছি।

হনুমানের কথা শুনে বিভীষণ চমকাল। কষ্ট করে হাসল। বললঃ মানুষ কী পেলে খুশি হয়, লোভাতুর মনকে কিভাবে লোভী করতে হয় সেই মনস্তত্ত্বের পথ ধরে আপনি আমাকে জেনে নিতে চান। এই সস্তা কৌশল আপনাকে শেখাল কে?

সে জেনে আপনার লাভ কী? লঙ্কা নগরী ঘুরে ঘুরে যা জেনেছি তা যাচাই করার জন্য করেছি।

আপনি কি আমার চলাফেরা, কাজের উপর গোয়েন্দাগিরি করেন?

আহা, রেগে যাচ্ছেন কেন? রাগ করার মতো কোন কথাই হয়নি। যা জেনেছি মুক্তির লোভে রাবণকে কক্ষনো বলব না।

দূত বড় বাড়াবাড়ি করছ। মোটেই না।

তা-হলে, জানলে কী করে? আমার সম্পর্কে এসব কথা রটাচ্ছে কে?

এটা আমার নিছক অনুমান। খুব সহজ অনুমান। কিন্তু এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

বিভীষণ চটে গেল।

আপনার সঙ্গে কথা বলাই বোকামি। আপনি সত্যি নির্বোধ। গুপ্তচর হওয়ার অনুপযুক্ত। নিভৃতে আপনার সঙ্গে কথা বলাটা অন্যায় হয়ে গেছে।

হনুমান হাসি হাসি মুখ করে বলল: একশবার মানি। কিন্তু আপনি কী করবেন সেটাই রহস্য রয়ে গেল।

হতেই পারে না। ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলে জিভ কাটল বিভীষণ। ভেবেচিন্তে বলেনি, তবু কথাটা একটা আলাদা তাৎপর্য পেল হনুমানের কাছে। মানুষের মনের অয়নপথের বিদ্যা যাদের অধিগত তারা কিন্তু ঠিকই টের পায়, মন কী চায়?

বিজ্ঞের মতো হঠাৎ হাসল হনুমান। বলল: রাজনীতিতে সব হয়। লজ্জার কিছু নেই। রামচন্দ্র রাক্ষস জাতির বন্ধুত্ব চায়। কিন্তু সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে রাক্ষস জাতি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মিলতে পারছে না। সদ্ভাবের সব পথ বন্ধ করে রেখেছে আপনার অগ্রজ। এভাবে সাদা-কালোর মিলনের পথ আটকে রেখে লঙ্কেশ্বর সমূহ ক্ষতি করছে নিজের এবং দেশের। শ্রীরাম চান আপনার মতো উদার, মুক্ত মনের মানুষের হাত

ধরে সেই মুক্তি আসুক লঙ্কাভূমিতে। শ্রীরামের বন্ধুত্বই পারে সর্বত্র মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিতে। লঙ্কার দমবন্ধ পরিবেশের মধ্যে খোলা হাওয়া বুক ভরে গ্রহণ করা অসম্ভব। লঙ্কাভূমি ত্যাগ করে না গেলে কোনদিন লঙ্কায় মুক্তির হাওয়া খেলবে না। এটা কোন স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য।

বিভীষণ অভিভূত। কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না তার। যুগপৎ আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় তাকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখাল। হনুমানের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটল। বলল : আপনার কপালে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন। আপনার রাজা হওয়া ঠেকায় কে ? যেটুকু বাকি আছে, শ্রীরামের হাত ধরে একদিন লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসনে বসবেন। দিব্যচক্ষে আমি সেই দিনটা দেখতে পাচ্ছি। এখন শুধু সেই দিনটার অপেক্ষা করা।

বিভীষণের বুক মথিত করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল : উপায় কী বলুন ? দেশের ভালো আমিও চাই। ভীষণভাবে চাই। আমার সীমিত ক্ষমতায় কিছু করেছিও।

কৌতুক হাস্যে হনুমানের মুখ উজ্জ্বল হলো। বলল: তাই তো দেশের লোকমুখে আপনার কথা শুনতে পাই। পরিকল্পিত উদ্দেশ্য তার মধ্যে ছিল না, কিন্তু অন্তরের তাগিদ ছিল। নগরের লোকও একথাটা বারংবার বলেছে। আরো বলেছে লঙ্কার জন্য কিছু করার স্পর্ধা বিভীষণ কখনো করেনি, শুধু সেবার মধ্যে নিজেকে নিবেদন করেছে,- একী কম কথা !

খুব সত্যি কথা হনুমান-জি। দেশের মুক্তি যদি চাই তা-হলে নিজের এই বন্দিত্বকে সহ্য করতে পারছি না। বন্দিত্ব থেকে মুক্তির জন্য একজন সত্যকারের বন্ধু খুঁজছি। শ্রীরামের বন্ধুত্ব আমি গ্রহণ করলাম।

রামের বন্ধুত্বের কত মূল্য বিভীষণ না জেনেই তার সঙ্গে হাত মেলাল। রামের কাছে তার দুটি মাত্র শর্ত ছিল। এক, লঙ্কা জয় করতে পারলে মন্দোদরীকে তার রানী করতে হবে। দুই, লঙ্কার সিংহাসনে তার অভিষেক করতে হবে। বিনিময়ে লঙ্কা জয়ের জন্য সবরকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো সে। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাথায় রাজার মুকুট পরিয়ে দিয়ে সাগরতীরের শিবিরেই লঙ্কার নতুন নরপতিরূপে তাকে অভিষেক করল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার নিল মাতামহ মালী। বাইরে থেকে লঙ্কার অভ্যন্তরে বিভীষণের নামে একটা সমান্তরাল নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হলো। বিদ্রোহীরা গুপ্তস্থান থেকে লঙ্কায় গোপন রন্ধ্রপথে বিভীষণের নির্দেশ পাঠাতে লাগল, একের পর এক।

রাতের অন্ধকারে কে বা কারা দেয়ালের গায়ে লিখে দেয় বিভীষণের নির্দেশ। এক এক স্থানে এক এক রকম। লঙ্কেশ রাবণের হাত থেকে লঙ্কাকে মুক্ত না করলে লঙ্কার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লঙ্কার সমস্যা বড় কঠিন। দেশের সমৃদ্ধি বাড়ছে। বাড়ছে চাষের মাঠ, নতুন নতুন খনি খুলছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। বন্দর কর্মব্যস্ত হচ্ছে। তবু অর্ধেকের বেশি দেশের মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের

অভাব ঘোচে না। দারিদ্র্য যায় না— এ এক দুঃসহ অবস্থা। তাই লঙ্কা থেকে স্বৈরাচারী শক্তি উৎখাত করার জন্য লঙ্কেশের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম। বন্ধুগণ অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকারের উৎস অস্ত্র; পরিণাম সংঘর্ষ। যা তোমাদের পাওয়ার কথা, যা তোমাদের নিজস্ব তা গায়ের জোর খাটিয়ে আদায় করে নিতে হবে। অধিকার ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না, অধিকার কেড়ে নিতে হয়। জনগণই শক্তি। গণতন্ত্রের সে বাণী তোমাদের কানে পৌঁছায় না বলেই, রাজার হাতে পুতুল হয়ে আছ তোমরা। নিজের স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ মিলিয়ে নিয়ে একেবারে মাটি থেকে উঠে এস বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে। জয় তোমাদের সুনিশ্চিত।

রাবণের লঙ্কা ত্যাগ করে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ, লোভ, আকাঙ্ক্ষা মিলে মিশে তাকে এক অন্য বিভীষণ করে তুলল। জয়ের জেদ তাকে পেয়ে বসল। মন্দোদরীকে অঙ্কশায়িনী করার স্বপ্ন, সিংহাসনে বসার বাসনা পূরণ করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর। দেশের সঙ্গে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল মরিয়া হয়ে। রামের জয় মানে তার জয়। ঐ জয়ের পথ ধরে একদিন বিজয়রথে করে লঙ্কায় প্রবেশ করবে। অগণিত মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখবে, বিভীষণ কিছুই হারায়নি। জনসাধারণের কাছে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে লঙ্কার নেতৃত্ব দিতে এসেছে। জনস্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ ও সংকল্পকে মিলিয়ে নিয়ে ভবিষ্যৎ লঙ্কার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সে বীরের মতো প্রবেশ করল লঙ্কায়। রাবণের গৌরবে সে দেশের নরপতি হলো না। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে অর্জন করল লঙ্কার ভাগ্যবিধাতা হওয়ার গৌরব এবং মর্যাদা। একী কম গৌরব তার!

জয়ের জন্য অনেক কিছু করল বিভীষণ। দেশের সঙ্গে শত্রুতা করতে, বিশ্বাসঘাতকতা করতে ত্রুটি করেনি। যে সংগ্রামে সে নেমেছিল নিজের ও দেশের মানুষের জন্য তাতে জয়লাভই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কীভাবে জিতল সেটা কেউ মনে রাখে না। জেতাই সব।

যুদ্ধের পরের দিনগুলিতে তার পূর্ব-ধারণা বদলে গেল। জীবনে জয়ী হওয়া সব নয়, জয়ের মধ্যেও পরাজয় লুকিয়ে থাকে। যাদের সাহায্য নিয়ে একজন অক্ষম মানুষকে জিততে হয়, জেতার পরে তাদের পুরস্কৃত করতে গিয়ে হারাতে হয় অনেক। তাই, রাজা হওয়ার পর সর্বক্ষণ মনে হয় এমন লোভী হয়ে উঠল কী করে? শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত নয় সে। কেন পারছে না সব কিছু ছেড়ে রাজসিংহাসন থেকে নেমে সত্যিকারের জন-গণ-মন অধিনায়ক হয়ে জনসেবায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। কিসের এই নিদারুণ মোহ — কোন সুরার এই অনির্বাণ নেশা!

বিভীষণের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। শরীর অসুস্থ বোধ হলো। বাগানে কয়েকখানা কেদারা সাজানো ছিল। বিভীষণ বসল তার একটায়। চিন্তায়, ভাবনায়, কাজের চাপে

দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন।

বিভীষণ দেখতে পেল না, সরমা একখানা ছোট্ট রথে করে সারথির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে গেল। গাড়ির চাকা ঘর ঘর শব্দ করে ঝড়ের বেগে যখন নিষ্ক্রান্ত হলো তখন তার খেয়াল হলো সরমা কোথায় যেন চলে গেল। কেন গেল জানে না। জানতে ইচ্ছেও করল না।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য এসে একখানা পত্র দিল তার হাতে। অনিচ্ছার সঙ্গে পত্রখানা খুলল। খুবই সংক্ষিপ্ত। এই নরকে হাঁফিয়ে উঠেছি। পাতালে বাকি জীবনটা কাটাব। হয়তো আর ফিরব না। আমাকে ফেরানোর চেষ্টা কর না। তোমার উপর আমার কোন দাবি নেই। একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার সুমতি হোক। ভগবানের উপর তোমার ভার দিয়ে যাচ্ছি। অনেক ছোট করেছ নিজেকে, আর নেমে যেও না।— সরমা

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পত্রখানি অনেকবার দেখল এবং পড়ল বিভীষণ। মনের এককোণে তার বিষাদ জমে উঠল। সেই সঙ্গে কিছু কুসুমগন্ধী ক্লান্তি।

॥ নয় ॥

রাজসভায় সিংহাসনে বসে বিভীষণ শুনতে পায় সভাসদরা ধন্য ধন্য করছে তাকে। সভাকক্ষে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। চোখের তারায় তার নতুন নগরীর স্বপ্ন দৃশ্য। ছবির মতো সাজানো। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখার মতো। চোখের দৃষ্টি একটুও ক্লান্ত হয় না। বনবীথির মনোরম সবুজের ছোঁয়ার স্নিগ্ধ হয়। দেশের মানুষ, বাইরের পর্যটক বিভীষণের পরিকল্পনা, রুচি ও শিল্পবোধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নগরী তো নয় ইন্দ্রের অমরাবতী। ইন্দ্রের প্রাসাদ তো লোকের চোখে দেখা হয়নি, কানে শোনা ঘটনা। মনের মাধুরী দিয়ে যে যেভাবে তাকে কল্পনা করতে পারে। কিন্তু বিভীষণের নতুন লঙ্কা নগরী কল্পনাতেও ধরে না। রূপকথার দেশ। বাইরের মানুষরা বলে সব পেয়েছির দেশ। এমন না হলে রাজ্য! এমন দেশে শুধু হাওয়া আর জল খেয়েও বেঁচে থাকা যায়। দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের ভেতরেও এই অপরূপ নগরীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। এখানেও মরেও সুখ। মুখে নুড়ো জ্বেলে জলে ফেলে দেবে না। শব সৎকার সমিতির লোকজনে দাহ করবে তাকে। ধোঁয়ার রথে চড়ে স্বর্গে যেতে পারবে। এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কত কথা গ্রাম, গঞ্জ, নগর ছুঁয়ে তার কানে পৌঁছায়। আর তখন ভীষণ গর্ব হয় বিভীষণের। নিজেকে একজন সফল মানুষ মনে হয়। সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি, কর্মের প্রশান্তির এক অনির্বচনীয় সুখ ও প্রসন্নতায় মুখখানি তার উজ্জ্বল হয়। স্নিগ্ধ হাসির লাবণ্য- এক অপরূপ শ্রী দিল তাকে।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। বিভীষণ দক্ষিণহস্ত উত্তোলিত করে শান্ত হতে ইংগিত

করল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল : প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু বেশি গুণগান; ভালোর চেয়ে মন্দ করে। আপনাদের হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি সভাগৃহের চারদেয়ালের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই। সারা দেশের মানুষ আমার কীর্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এসব খবর আমার গুপ্তচরেরা নিত্য সরবরাহ করে। দেশের যা কিছু উন্নতি এবং আত্মশ্লাঘার তা তো দেশের মানুষের সম্পদ। স্বদেশের কারিগরিতেই হয়েছে। আমি এর অধিপতি। জনপ্রতিনিধির যোগ্য বলে ভাবতে একধরনের গর্ব হয়, ভালো লাগে। তবু প্রদীপের নিচের অন্ধকার নিয়ে ভাবনা হয়।

আমাত্যপ্রধান মালী পঁচাশি বছর অতিক্রম করেছে। মাথা জোড়া টাক, কেবল ঘাড়ের পিছন দিকে পাতাল পাকা চুল আছে। কপালে গভীর রেখা, হলদে লাল চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। গালের মাংস ঝুলে পড়ে থলথল করছে। সর্বদা পান চিবানো দাঁতগুলো কালো পানের রস শুকিয়ে ওষ্ঠাধর রক্তের দাগের মতো দেখায়। মৃদু হেসে বলল : তুমি সিংহাসনে প্রজ্জ্বলিত নিবাত দীপশিখার মতো আলো বিকীরণ করছ। প্রদীপের পাদদেশে পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর সত্যি প্রয়োজন আছে কি?

একজন প্রধানমন্ত্রীর কথা হলো না; মাতামহের মতো কথা বললে। প্রদীপের নিচের অন্ধকারে প্রদীপের নিজের ছায়াও মিশে থাকে। আমার তামসও পাদপ্রদীপের অন্ধকারের চেয়ে কম নয়।

মালী একগাল হেসে বলল: বুদ্ধির বা বাকচাতুর্যের লড়াই-এ তোমাকে হারানো আমার সাধ্য নয়।

দাদু, এ কথার কাজিয়া নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত। হাতের সব আঙুল কি সমান হয়? দাঁতও সুযোগ পেলে জিভকে কামড়ে দেয়। নিজের বলে খাতির করে না।

নিজেকে নিয়ে মাঝে মাঝে কৌতুক করতে ভালো লাগে বিভীষণের। সভাসুদ্ধ লোক তার কথা শুনে স্মিত হাসল। বিভীষণ সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল: কিছু লোক সব সময় থাকে যারা সন্তুষ্ট হয় না মোটে। তাদের পেটের খিদে হাজার দিয়েও ভরে না। মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। স্বার্থপর। নিজেকে ছাড়া তারা কিছু জানে না। কারো ভালো দেখতে পারে না। দক্ষিণারণ্যের মানুষের সুখ-সুবিধে, উন্নতির জন্য কত কী করল শ্রীরাম; তবু লোক তাকে বলল অভিসন্ধিপরায়ণ, মতলববাজ, কপট, শঠ, প্রতারক। কিন্তু তাতে শ্রীরামের অযোধ্যার নরপতি হওয়া আটকাল কি? প্রজারঞ্জন রাজা জনগণের কথায় প্রিয়তম সতী সাধ্বী পত্নী সীতাকে নির্বাসন দিল। রাজার কর্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তি শ্রীরামের যে দ্বন্দ্ব বাধল তাতে প্রজাতোষণই বড় হলো। সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে যে অমানবিক কাজ করলেন তাতে তাঁর গৌরব, মহিমার ধার কমল না। বালি হত্যার কলঙ্কও তাঁর চরিত্রে লাগল না। বৃহৎ কাজের জন্য ঐ ছোট্ট মালিন্যটুকু নিয়ে তিনি চাঁদের কলঙ্কের মতোই সুন্দর হয়ে উঠলেন। কলঙ্ক

চাঁদের অগৌরব নয়, শ্রী। রানী সরমা অভিমান করে আমাকে ছেড়ে পাতালে গেলেন ; কিন্তু তাতে আমার কাজ বন্ধ হলো কি? সাধারণ মানুষের কথা নিয়ে মন খারাপ করলে জনহিতকর কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। পথে নামলে পায়ে ধুলো লাগবে। এখন করবে কি? দোষটা পায়ের, না পথের — এ প্রশ্ন যেমন নিরর্থক, তেমনি গুজবেরও কোন সদুত্তর হয় না।

মালী লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : ঠিক। সুন্দর ও সমৃদ্ধ নগরই একটা দেশের পরিচয়। রাজ্যের ইজ্জত। তাই তাকে সুন্দর করে তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে সুরক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব রাজাকে নিতে হয়। কারণ, অন্য কোন কর্মচারীকে নয়, একমাত্র রাজাকে প্রজার কাছে তার কার্যের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী থাকতে হয়। প্রশাসনের স্বার্থে অনেক কিছু করতে হয়। প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও হতে হয়। তাই রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল।

একথা বলছ কেন? হঠাৎ বিভীষণ প্রশ্ন করল মালীকে।

মালীর মুখে চোখে ধূর্ত হাসি। কেমন একটা নির্বোধ সরলতা মিশে আছে তার সঙ্গে। চটপট বলল : কথাটা মনে এল বলে, বললাম তা নয়। মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে, যা না ঘটলে মানুষের জীবনটা এমন দুর্ঘটনাবহুল হতো না। তাকে নিয়ে ইতিহাস হতো না। মানুষ তার সকল দুর্বলতা নিয়ে মানুষ। কথায় বলে স্যাকরা তার স্ত্রীর গহনা গড়তে গেলেও সোনা চুরি করে। কিন্তু এ চুরিটা যে তার নিজের জিনিসের ওপর বাটপাড়ি করা সেটা ভুলে যায়। আসলে এ হলো সমাজব্যবস্থার গলদ। চুরিটা অভ্যাস হয়ে গেছে বলে আত্ম-পর কোন জ্ঞান নেই। দুর্নীতির শুরু হয়েছে একেবারে নিজের ঘর থেকে। দুর্নীতি আমাদের সংস্কারের সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাকে আর আলাদা করার উপায় নেই। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় দুর্নীতি।

বিভীষণের কেমন খারাপ লাগল কথাগুলো শুনতে। তবে কি মালীর লক্ষ্য সে? বিস্ময়ে বিভীষণ মালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তর দেবার সময় তার গলার স্বর ভারী হয়ে গেল। বলল : সাবধান করে ভালো করেছ। আমি তো জানি, যাদের সাহায্য, অর্থানুকূল্য নিয়ে লঙ্কা পুনঃনির্মাণ করেছি তাদের হরেক রকম দাবি আমাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে নীতির দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে যেতে হচ্ছে। তোমার মতো এমন করে আগে কেউ বোঝেনি। তুমিও না। বড় সাংঘাতিক অবস্থা আমার। দাদু, তুমি এতসব জানলে কী করে?

মালী হাসি হাসি মুখ করে বলল : বয়স তো হয়েছে। মানুষ দেখলে টের পাই — কী চায় সে? একদিন আমিও তোমার প্রতি দুর্বল মোহে ও স্নেহে পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি যা করেছ তাকিয়ে দেখেছি। দেখেছি, গৌরবের সঙ্গে অগৌরব, বলের সঙ্গে দুর্বলতা, ত্যাগের সঙ্গে লোভ, বিনয়ের মধ্যে অহঙ্কার। আজও লঙ্কা শ্রী ও সৌন্দর্যের গর্বে রঙিন হচ্ছে - কিন্তু জনতা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের অগ্রগতির

নামে অবনতি, উন্নতির নামে পতন, শ্রীর নামে কুৎসিতের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসছে। চোখ থাকতেও আমরা দেখেও দেখছি না। আমরা স্বার্থ, লোভ নিয়ে রাজনীতি করছি। দেশের মানুষের কথা ভাবছি না। আমরা যে ডালে বসে আছি, নির্বোধের মতো সেই ডালটাকে কাটছি। এত বড় সর্বনাশ হচ্ছে জেনেও উদাসীন আমরা।

তোমার কথা শুনে ভয় হয়। কিন্তু এত সব বুঝলে কী করে? লঙ্কার সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য দুনিয়ার লোকের যখন নজর কেড়ে নিয়েছে তখন এক অদ্ভুত অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করলে। দশবছর রাজত্ব করছি। অথচ, এসব কথা আগে বলনি। আজ বলছ কেন?

সময় হয়নি। তোমার মতো আমিও একটা ঘোরে ছিলাম। ঘোর কাটতে সময় লাগল। দশবছর পরে তোমার সাফল্য নিয়ে ভাবতে বসলাম। আর তখনই মনে হলো, তুমি জিততে চেয়েছ। রাজত্ব করতে চেয়েছ যে কোনো দামে, যে কোনো প্রকারে। নিজের সুনাম রক্ষাই ছিল তোমার একমাত্র লক্ষ্য। সুনাম বাঁচানো এবং রাজত্ব করা ছাড়া তোমার কি রাজা হিসেবে আর কোনো কাজ ছিল না?

যথা!

লঙ্কা ত্যাগ করার সময় বলেছিলাম, নেতৃত্ব করবার জন্য যে দুঃসাহস দরকার তা তোমার নেই। তুমি বলেছিলে, নেতৃত্ব করার কর্তৃত্ব তো পাইনি। যদি কখনও সে সুযোগ আসে, নিরাশ করব না। মনে পড়ছে? সেই পুরোনো কথাটা হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল। তোমাকে ভালোবাসি, স্নেহ করি বলেই সুহৃদের মতো কথাগুলো বললাম। একদিন দেশের ভালো হবে মনে করেই তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। দেশের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিশ্বাসঘাতকতা করব না বলেই কথাগুলো তোমাকে বলা আমার কর্তব্য মনে হয়েছে।

দাদামশাই, আমার বিরুদ্ধে তোমার সুনির্দিষ্ট কিছু নালিশ নিশ্চয়ই আছে। অথচ খোলাখুলিভাবে তুমি কখনও তা জানাওনি আমায়। এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলনি। তোমার অভিযোগ জানতে পারলে দেখতে, নালিশ থাকায় তোমার কথা নয়। যা করেছি তোমাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই করেছি। সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি লঙ্কার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য করেছি। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা যে করেনি, প্রমাণ করব বলেই দুঃসাহসিক কাজকর্ম করার ঝুঁকি নিতে হয়েছে। যোগ্যতা অযোগ্যতা নিয়ে সে ঝুঁকি নিয়েছিলাম। সাধ্যমতো পালন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। তখন ভাবিনি এ নতুন দায়িত্ব ও ঝুঁকি নেওয়ার পেছনে কোনে সংকট, সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে। অদ্ভুত মানুষের মন। সবাই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে মশগুল। কী পেল, আর পেল না তার হিসেব করে। কিন্তু একবারও ভাবে না আমার আগে লঙ্কার অবস্থা কী ছিল? তেমনি আমি না থাকলে এই দেশ গোল্লায় যাবে, না জাহান্নামে

যাবে তা নিয়ে কোনে লঙ্কাবাসীর মাথাব্যথা নেই। শুধু অভিযোগই আছে।

রাজসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সম্পাতি বলল : কার উপর অভিমান করছ ? যা কিছু চারপাশের পৃথিবীতে রয়েছে সবই সুবিধের জন্য। তার সঙ্গে যখন বিরোধ বাধছে তখনই রুখে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিবাদ করছে। একজন শিশু তার অসুবিধেটা জানান দেবার জন্য চিৎকার করে কাঁদে। এটাই নিয়ম। নতুন কোন কথা নয়। এসব ভেবে মন খারাপ করার মানে নেই। কী করলে রাজসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় সেই কথাটা ভাব। ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের প্রত্যেক মন্ত্রী কে কী করছে এবং করবে, কোথায় তাঁদের সমস্যা, সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবই কী এসব পর্যালোচনার জন্যই তো আজ এই সভা ডাকা হয়েছে। মহারাজের অনুমতি হলে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বন্ধ করে সভার কাজ আরম্ভ করতে পারি। দশবছরের সাফল্য নিয়ে যেমন আমাদের গর্ব তেমনি উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা নিয়ে আমরা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কী উপায়ে আমাদের স্বার্থ নিরাপদ করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবার সময় হয়েছে।

বিভীষণ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : ঠিক কথা। কিন্তু এসব আলোচনা করতে আমার ভালো লাগছে না। বিমর্ষ মন নিয়ে কেউ গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে পারে ? আজ বরং আমাকে ছুটি দাও। তোমরা নিজেদের ভেতর আলাপ আলোচনা করে স্থির কর কী করবে। আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে হবে।

সম্পাতির চোখে বিস্ময়। বলল : সভার অধিপতি যিনি তাঁকে বাদ দিয়ে রাজসভার কোন মানে হয় না। তার কোন গুরুত্বই থাকে না।

মালী তার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল : রাজা অবশ্যই একজন ব্যক্তি। কিন্তু দুটো সত্তাই তার আলাদা। একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে ফেললে গোল বাধবে। রাজাকে নিরাবেগ চিত্তে সব কিছু গ্রহণ করতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ মান-অভিমান, রাগ-বিরাগ সব কিছু অন্তরের গভীরে নিয়ে, এমন কি নিজেকে নিয়েও যদি কৌতুকবোধের ক্ষমতা তাঁর না থাকে তাহলে সফল রাজা হতে পারেন না তিনি। রহস্যময় কাঠির ছোঁয়ার ব্যক্তি আমিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার বিদ্যা শ্রীরামের আয়ত্তে ছিল বলেই নিরাবেগ চিত্তে সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, কষ্টের সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ রাজার সব আছে, তাই কিছুতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁর জীবনে প্রজাই সব। শাসন তাঁর রক্তের বীজ। শাসনে তাঁর ভুল হতে পারে, ইতিহাস তাঁকে কঠিন বিচারে কঠোর দণ্ড দিতে পারে, তাঁর দুর্বলতা, অক্ষমতা নিন্দনীয় হলেও স্বাভাবিক। কারণ তুমি ঈশ্বর নও, রাজাও নয়, শুধু শাসকও নয়, একজন ব্যক্তিও নয় : তুমি একসঙ্গে সব।

মালীর কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য মুগ্ধতা ছিল যে বিভীষণের মনে জমে থাকা সব অবসাদ, গ্লানি মুহূর্তে চাঙ্গা করে তুলল তাকে। ঠোঁটে হাসির বক্ররেখা

খেলে গেল। মুখে কথা সরল না অনেকক্ষণ। অভিভূত আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেলে বলল: তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে। অনেকের অনেক কথা মনে যে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল তাতে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কথায় তা দূর হলো। মানুষ হিসেবে, দেশকর্মী হিসেবে, পদপ্রদর্শক হিসেবে তুমি আমার নমস্য। তোমার সবচেয়ে বড় গুণ নীতিতে তুমি কঠোর, কিন্তু নির্লোভ। ভেব না, আমি তোমার স্তুতি করছি, যা বলছি তা সত্যি বলছি।

বিভীষণের কথা শেষ হলে সম্পাতি বলল: সোনার লঙ্কা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশবছরের ভেতর আপনি ছাড়াও আরো একশ্রেণীর শাসক উদ্ভব হয়েছে। এরা আগেও ছিল কিন্তু তখন ক্ষমতা ভোগের স্বপ্নে রঙিন হতে পারেনি। মহারাজ, সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে রাজক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে যাদের আপনি রাজত্ব চালানো নামক প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠ অংশীদার করে নিলেন; দাপটে, প্রতিপত্তিতে তারা রাজশক্তির সমকক্ষ ভাবল নিজেদের। এরা হলো সেনাধ্যক্ষ, গ্রামের মুখ্য অধিকর্তা, ভূস্বামী, শিল্প ও বাণিজ্যের মুখ্য উপদেষ্টা, পরিচালক, দেশের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয় অভিজাত ব্যক্তি। প্রশাসনের দেখভাল করার জন্য রাজার প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কার্য করেন। রাজার কাছে তাদের কার্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। দেশ ও জনমত সংগঠনে এঁদের ভূমিকা ও গুরুত্ব এত বেশি যে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে রাজা কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ফলে একশ্রেণী হাত-কচলান, আজ্ঞে-হুজুর সম্পর্কের এক বিরাট গোষ্ঠী রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এদের সবাকার স্বার্থ এক নয়। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার যাদের হাতে আছে, নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তারা এক একজন স্ব-স্ব অধিকারের ক্ষেত্রে খুদে সম্রাট হয়ে বসে আছে। ফলে যাদের আছে আর যাদের নেই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক নীরব সংঘর্ষের জমি তৈরি হচ্ছে। এই দশবছরের লঙ্কেশের সময়কার ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ অনেক বেড়ে গেছে। যাদের আছে তাদের অনেক আছে; যাদের নেই তাদের বেশিরভাগ নিঃস্ব হতে বসেছে। কেবল দু'একজন হাত কচলানো, কর্তাভজা মানুষ একেবারে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছে ধনে-মানে।

বিভীষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পাতির কথাগুলো শুনল। বলল: এরা রাজার পেছনে পেছনে চললে সোনার লঙ্কার সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন থাকবে। তারা যদি রাজশক্তির বিরুদ্ধে যায় তা-হলে রাজা চুপ করে থাকবে না। রাজশক্তি দিয়েই তারা মোকাবিলা করা হবে। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে রাজার শাসনক্ষমতা চলে তাঁর নিজের ক্ষমতার জোরে এবং প্রতিপত্তিতে। অন্যের মর্জিতে কিংবা অঙ্গুলি সংকেতে নয়।

সম্পাতি জোরে জোরে মাথা নাড়ল। কণ্ঠস্বরে তার চাপা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। বলল: একটা অতি সাধারণ সত্য মানতে আপনি ভয় পাচ্ছেন। আপনার স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ এবং প্রশাসন যাদের হাত দিয়ে চলে তাদের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ এক নয়,

এক হতে পারে না। আপনি রাজার কর্তব্য বলতে যা বোঝেন দেশের নিরন্ন, দুঃখী মানুষ তা বোঝে না। তারা বোঝে উদর পূর্তি। আর একটু নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করা। তাদের চাওয়ার পৃথিবীটা একটু আলাদা, যা আছে পুরো থাকবে এবং বাড়বে, তার সঙ্গে ওদের অবস্থারও পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন তাদেরও হয়েছে। তাতে অল্প সময়ের ভেতর তারা অনেক কিছু হারাল এবং আরো দরিদ্র হলো।

সম্পাতি তুমি তো নির্বোধ নও। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ। আমার কাছে শুনে নাও এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে রাজা একা নয়। তার সঙ্গে আছে প্রভূত শক্তিশালী এক বিরাট গোষ্ঠী। যাদের টাকায় দেশ চলে, রাজকোষ ভরে, বিনা স্বার্থে তারা টাকা ঢালবে কেন? দেশ তো সকলের। তা-হলে দেশের উন্নতি, সমৃদ্ধির কথা তারা একা ভাববে কেন?

সম্পাতি তৎক্ষণাৎ বলল: ভাবার ক্ষমতা তাদের আছে। তাদের যা কিছু সম্পদ ও ঐশ্বর্য তা তো দেশ থেকে পাওয়া। দেশের মাটি থেকে তাল তাল সোনা উঠছে তাই দিয়েই তাদের বাড়-বাড়ন্ত এবং প্রতিপত্তি। মহারাজ ভুলে যাবেন না, তারা যা দিচ্ছে রাজভাণ্ডারে, তা তাদের করুণা কিংবা দান নয়। সম্পদের এতটা ক্ষুদ্র অংশ রাজস্ব দেয়। সে অর্থে-কতটুকু উন্নয়ন হয়।

বিভীষণের অধরে হাসি লেগে রইল। বলল: সম্পাতি, উন্নয়ন পুনর্গঠন আসলে এক দীর্ঘ কঠিন সংগ্রাম। এজন্য সকলকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। দুর্বলের ত্যাগটা সব সময়ে একটু বেশি হয়।

মহারাজ আমার অপরাধ মাপ করবেন। রাজসভার অধ্যক্ষ হলেও রাজ্যে গুপ্তচর সংস্থার প্রধানও আমি। তাই দেশে কোথায় কী হচ্ছে, কে কীভাবে চলছে সবই জানতে পাই। সংগ্রাম তো পথের, স্বার্থের ও লক্ষ্যের। সে উন্নয়নের কোন মানে হয় না, যদি পরিষ্কার করে বোঝা না যায়, কাদের উন্নয়ন, কোন পথে ও কী উদ্দেশ্যে? আমি বুঝি সংঘাত ও ত্যাগ ছাড়া কোনো দেশই উন্নতির পথে এগোতে পারে না। উন্নয়ন মানেই সংঘাত।

ঠিক ধরেছ। সংঘাতের পথে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করার পরে জনকল্যাণের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব। এখন আমাদের যুদ্ধ পর্ব। এখন আমাদের লক্ষ্যউন্নতি মানে এগিয়ে যাওয়া। স্থির হয়ে অবস্থান করা নয়। থেমে যাওয়া মানে স্থবিরতা প্রাপ্ত হওয়া এবং উন্নতির সমাপ্তি। একটা সমৃদ্ধশালী দেশের গৌরব পেতে হয় যোগ্যতার লড়াই করে। এ লড়াইতে জেতাটা মুখ্য কথা। যে জেতে তার মাথায়ই মুকুট উঠে আসে যোগ্যতায়। যোগ্যতার একমাত্র প্রমাণ; প্রসার এবং বিস্তার।

বাইরের বিস্তৃতিই কী সব? দেশের ভেতর অগণিত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। তা-হলে এ উন্নতি কার, কিসের উন্নতি, কীভাবে উন্নতি?

সম্পাতি, বিবিধ শিল্পোৎপাদন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগ যত বাড়বে, এদের সঙ্গে

হাত মিলিয়েই তাদের অবস্থাও তত ফিরবে। সেটা হয়তো তাদের মনোমত না হতে পারে কিন্তু উপার্জনের বিবিধ পথ খুলে যাবে। মানুষের আলসেমি দূর হবে। পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ছেলে-বুড়ো ঘরে বসে সময় নষ্ট করবে না। নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করবে। কী করলে দুটো পয়সা আসবে, তার ধান্দায় থাকবে। দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। বিপুল কর্মযজ্ঞে সব মানুষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। লঙ্কার এত বড় একটা রূপান্তরকে অবমূল্যায়ন করার কোন কারণ হয়েছে কি? এর থেকে বেশি সাফল্য দশবছরে হয় কি? অনেক দুঃসাহস আর অনেক বড় স্বপ্ন ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হতো না।

বিভীষণের কথার উত্তরে সম্পাতি কী বলবে ভেবে পেল না। শুধুই মনে হচ্ছিল, একদিন যে আবেগে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই মত ও ভাবনা অনেক বদলে গেছে। উন্নয়নের নামে দশবছর ধরে যা দেখছে তা পূর্ব অভিজ্ঞতায় ছিল না। স্বপ্নের মতো অনেক কিছুই তার মনে যে স্বর্গ রচনা করেছিল সেই স্বপ্নের পৃথিবীটা বাস্তবে কোথাও নেই। মানুষ বড় দ্রুত বদলে যায়। ধনী দরিদ্র সবাই ভিখিরীর মতো চাইছে। চাই-চাই করে উদগ্র সুখের আশায় ছটফট করছে। এ যেন ষাঁড়ের লড়াই। বাঁচার লড়াই, গরিব লোকেরাও ভাগ্যের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছে। প্রতিযোগিতা ধনীর সঙ্গে নয়, ধনের সঙ্গে। ধনের পেছনে ছুটছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে অসংখ্য চাহিদার এবং আকাঙ্ক্ষার। জন্ম থেকেই তাদের নামতে হচ্ছে ইঁদুর দৌড়ে।

প্রতিটির মুহূর্ত এবং সুযোগকে নিংড়ে নিয়ে নিজেদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকরণে সাজিয়ে তোলাই ধনীদের একমাত্র চিন্তা। দেশের মানুষের ভালোর জন্য উন্নতির জন্য সুচিন্তার সময় তাদের কোথায়? ফলে, অভাবী মানুষেরা সামান্য সুখের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলেছে বুক চেপে ধরে।

সম্পাতির মনের ভেতর এই মুহূর্তে অন্য স্রোত বইছিল। সভাসদদের কোন কথাই তার কানে গেল না। দেশটাকে কব্জা করে নিয়েছে স্বার্থান্বেষী, সুবিধেবাদী একশ্রেণীর ধনবানরা। পারদের ঘায়ের মতো দেশের গায়ে ফুটে উঠেছে ব্যাধির চিহ্ন। পৃথিবী সমৃদ্ধতম সোনার লঙ্কায় একী দশা? দেশের আত্মিক দারিদ্র্য দেখে বারংবার শিউরে উঠল সম্পাতি। অথচ, বিভীষণ নির্বিকার। শিল্পায়নের জয়ঢক্কার সুতীব্র আওয়াজের তলায় চাপা পড়ে গেছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পিছিয়ে পড়া মানুষের অব্যক্ত ক্রন্দন। সামনের আলোকিত প্রান্তরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে তাকালে — অন্তহীন শূন্যতা অতলস্পর্শী অন্ধকারে চোখ ঢেকে যায়।

পাগলের মতো মানুষ, তারই মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে অবলম্বন। এক অদ্ভুত চেতনা মনের কোমল কোণগুলিতে জমা হয়ে হয়ে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে — ভালো লাগে না। কোনও কিছু যেন ভালো লাগার নয়। একে দেশের উন্নতি কেউ বলে?

তবু বিভীষণ একেই জীবনের ইতিবাচক দিক মনে করছে। কারণ আলসেমির গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে যে ইঁদুর-দৌড় শুরু করেছে; সেই হারিয়ে দেওয়া প্রতিযোগিতার পথ ধরে দেশ সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল হবে। কিন্তু সে উন্নতির চেহারা কীরকম হবে? সবাইকে পেছনে ফেলে শুধু বিভীষণের মতো নিজের ভালো চাওয়ার নাম যদি উন্নতি হয় তা হলে নিজের আত্মীয়, সহোদর ভ্রাতাকে খুন করে সংহারী হয়ে উঠতেও তার আটকাবে না। বিভীষণ নিজের উন্নতির মতো করেই ভেবেছে সবটা। নিজের জীবনের সুরক্ষার প্রয়োজনে দেশের মানুষকে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক করার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। বিভীষণ পুত্র তরণীসেনের বড় অভাব। পিতৃভক্ত পুত্র হয়েও পিতার পক্ষ না নিয়ে দেশের হয়ে দশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। পিতার স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজের জীবন আহুতি দিল। নতুন তরুণদের ভেতর সে আবেগ কোথায়? নিজেদের সুরক্ষার আবেগে গোটা তরুণ সমাজ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। তরুণ তরণীসেন শিকল ভাঙার গান গেয়ে দেশের মানুষকে দেশের সাথে চলতে শিখিয়েছিল, কিন্তু সেই তরুণরা আজ দেশের কথা ভাবে না। দেশকে নিংড়ে নিয়ে জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকরণে সাজিয়ে তোলাই তাদের জীবন-নীতি। এ এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে বাস করছে মানুষ।

সম্পাতির স্তব্ধ মৌন বিষণ্ন মুখখানা বিভীষণের দু'চোখকে চুম্বকের মতো টানছিল। দুরন্ত এক অস্থিরতায় তার ভেতরটা ছটফট করছিল। বারংবার মনে হচ্ছিল সম্পাতি চুপ করে না থেকে তার সঙ্গে ঝগড়া করুক, তর্ক করুক, অভিযোগ করুক, নীরব থাকার অর্থই বিরূপ হওয়া, অসহযোগিতা করা কিংবা ভয়ঙ্কর এক প্রতিবাদে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। অথবা লুকনো কোনো হিংসা, ঘৃণা বিদ্রোহের তরবারিতে মনটাকে শান দেওয়া। চুপ করে থাকা মানেই মেনে না নেওয়া। আনুগত্যের বেড়া ভেঙে তছনছ করে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো মতলব যে সম্পাতির মনে নেই; কে বলতে পারে? তার সম্পর্কে বিভীষণের মনে এক অবিশ্বাস এবং ভয় জন্মাল। সহসা গম্ভীর হলো সে।

এক সুদূর অতীত তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আর সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নিজেকে। মন্ত্রণাকক্ষে বিশিষ্ট সভাসদ পরামর্শদাতা এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদরা আছে। অগ্রজ রাবণের স্বর্ণসিংহাসনের পাশে একজন অনুগত, বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পরামর্শদাতা হিসেবে সেও আছে। রাবণের মায়াসীতা হরণের ঔচিত্য এবং তাকে নিয়ে উদ্ভূত লঙ্কার সংকট ও আসন্ন যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা হচ্ছিল। একবাক্যে রাবণকে সবাই সমর্থন করল। কেবল সে ছিল নীরব।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেই প্রহস্ত ইংগিতে তার নীরবতার প্রতি রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু সে ইশারা তার নজর এড়াল না। রাবণ বেশ একটু অপ্রসন্ন হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর কোমল কণ্ঠে বলল: বিভীষণ!

তোমার নীরবতার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। মানুষ যখন নীরব থাকে তখনই নানা ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মানুষ চুপ করে থাকলেই তাকে কুৎসিত দেখায়। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, ক্রূর এবং ভয়াবহ মনে হয়।

বিভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করে নিরুত্তাপ গলায় বলল : এটা মনের ব্যাপার। আমাকে নিয়ে তোমাদের গবেষণার অন্ত নেই। আমার গতিবিধি, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা সব কিছুর উপর তোমাদের তীক্ষ্ণ নজর। তোমাদের চোখ এড়িয়ে আমি কিছু করতে পারব না জেনেও আমার উপর অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয়ের খাঁড়া ঝুলছে।

বিভীষণের মনের খেদ রাবণের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। বলল : বিভীষণ, লঙ্কার সব মানুষ থেকে তুমি একটু আলাদা এবং ব্যতিক্রম। তোমার বিবেক কী জাতীয়তার অপমান, ভগিনীর অসম্মান, দেশের বিপন্ন সার্বভৌমত্বের সমস্যা নিয়ে তোমাকে ভাবতে বলে না ? তুমি কী এদেশের কেউ নও ? নিজেকে রাক্ষস বংশের সন্তান মনে করতে কী লজ্জা পাও ? তুমি কি ভাব, এদেশের সব মানুষ নির্বোধ, আর তুমি একা বুদ্ধিমান। রাজরোষের ভয়ে তারা চুপ করে থাকে ভেবেছ ? রাজ অমাত্যরাও কী কর্তাভজনা করছে। এই বংশের সন্তানদের তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবু তাদের একজনও আমার কাজ নিন্দনীয় মনে করছে না। এমন কি তোমার পিতৃভক্ত পুত্র তরণীসেনও আমার কার্যের সমালোচনা করেনি। অথচ এই বংশে সব সন্তানদের চেয়ে সে বেশি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সৎ-ধার্মিক এবং নীতিবান। বরং, তোমার অসহযোগিতায় সে লজ্জা পায়। পুত্রও তোমার সাথে নেই। তুমি একা। তুমি নিজেকে পুনর্বিবেচনা কর। তোমার পুত্রের মতো তুমিও কী মনে কর না জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী !

দাদা, মায়াসীতা রামচন্দ্রের কেউ নয়। নির্দোষ মহিলাকে ছেড়ে দাও। জেদাজেদির ব্যাপার নয় এটা, হাজার হাজার মানুষের জীবনমরণ খেলা। তাকে আটকে রাখলে কী শূর্পনখার অসম্মান লাঘব হবে ? তোমার সব যুদ্ধ তো রামচন্দ্রের সঙ্গে। ঐ নির্দোষ মহিলার সঙ্গে তোমার কোন ঝগড়া নেই। তবে, তোমাদের বিবাদের মধ্যবর্তী হয়ে ঐ নিরীহ বেচারী কষ্টপাবে কেন ? মায়া সীতা কে ?

রামচন্দ্রের মর্যাদার প্রতীক। তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রামচন্দ্র। শূর্পনখা অয়োমুখীর সম্ভ্রম নষ্ট করে সে যেমন আমার যশ, খ্যাতি কালিমালিপ্ত করেছে, তেমনি মায়াসীতাকে আটকে রাখার অর্থ তার শৌর্য-বীর্যের গর্ব ও খ্যাতিকে কলঙ্কিত করা। এ হলো শঠে শাঠ্যং সমাচরেত নীতি। এর সঙ্গে কোন আপোষ হয় না। আপোষ করা মানে হার স্বীকার করা। হার যদি স্বীকার করতেই হয় মুখোমুখি যুদ্ধ করেই তা করব বীরের মতো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রাবণ বলল : তোমার আর কিছু বলার আছে ?

না।

তা-হলে এই দেশে তোমার কোন স্থান নেই। তোমার অনুগত বান্ধব ও পরামর্শদাতারা যেহেতু রাক্ষস, তাই স্বজন হত্যা করতে পারছি না। এই মুহূর্তে তোমরা দেশত্যাগ করে যেখানে খুশি যাও। বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহীদের কোন জায়গা নেই লঙ্কায়। তুমি যেতে পার।

সেই মুহূর্তে বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। পরম আরামে চোখ বুজল। মনে মনে বলল: ভালোই হলো। ইষ্ট সহায় না হলে এমন সহজে মুক্তি পাওয়া হতো না। মুক্তির সুখকর উল্লাস এবং তৃপ্তির স্রোত তার সারা অঙ্গে বয়ে গেল। সংশয় ও দ্বন্দ্ব মুক্ত হওয়ার ভেতর যে এত আনন্দ এবং সুখ লুকিয়ে আছে আগে জানত না বিভীষণ। আস্তে আস্তে বলল: অগ্রজ ইতিহাস কেবল পুনরাবৃত্তি করে। একদিন সাম্রাজ্যের জন্য, সিংহাসনের জন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে বিতাড়িত করেছিলে। কুবেরকে সিংহাসন থেকে অপসারণের ছলনা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হয়, তাহলে আমার নীরব থাকার অপরাধকে বিশ্বাসভঙ্গ হওয়ার অপবাদ দিয়ে আমাকে অপমানিত করার অর্থ কী?

রাবণের দুই চোখে অঙ্গার। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: কুবের রাক্ষসবংশের কেউ না। পিতামহ সুমালীকে বিতাড়িত করে ইন্দ্র লঙ্কাকে দেবলোকের উপনিবেশ করেছিল। কুবের ছিল তার প্রতিনিধি শাসক। এদেশের সঙ্গে তার কোন মমতার সম্পর্ক ছিল না বলেই তাল তাল সোনা নিয়ে ইন্দ্র অমরাবতী তৈরি করল। তার সময়ে লঙ্কা ছিল শ্রীহীন। মহাজনের মতো সে শুধু লঙ্কাকে নিঙড়ে নিয়ে ইন্দ্রকে তুষ্ট করত। ইন্দ্রের কাছে দেশকে বন্ধক রেখেছিল কুবের। দেশের লজ্জা দৈন্য তাতে বাড়ল। হৃতসর্বস্ব দুর্দশাগ্রস্ত সেই দেশের অভিশাপমুক্ত করল কে? সোনার লঙ্কা কার সৃষ্টি? কার চেষ্টায় লঙ্কার গৌরব মর্যাদা বাড়ল? রাক্ষসজাতিকে সম্মানিত করল কে?

রাবণের জবাব দেবার আগেই সভাসদেরা সমবেত কণ্ঠে বলল: লঙ্কেশ, আবার কে?

শুনতে পাচ্ছ বিভীষণ। আমি বলছি না, এদেশের মানুষ গলা ফাটিয়ে বলছে রাবণ শুধু দেশের রাজা নয়, দেশবাসীর হৃদয়ের অধীশ্বর।

সভাকক্ষের মধ্যে কে যেন জোরে হাঁচল। আর তাতেই বিভীষণ চমকে উঠে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরল। অধর কোণে অনাবিল হাসির আভা ফুটল। নিজেকে শুনিয়ে মনে মনে বলল: অগ্রজ, বেঁচে থাকলে দেখতে পেতে লঙ্কা নিয়ে তোমার গৌরব করার কিছু নেই। তুমি পারনি, আমি এ নগরী তিলোত্তমা করেছি। লঙ্কা আমার হাতে সোনার লঙ্কা হয়েছে।

একটা সুন্দর অনুভূতি হলো তার। কে বলে তাকে বিশ্বাসঘাতক? বিশ্বাসঘাতকতা করেনি কে? বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের সঙ্গে রাবণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে করেছে সহোদরের সঙ্গে। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সুগ্রীবও করেছিল সহোদর

ভাই বালির সঙ্গে ? রামচন্দ্র করেছে সীতার সঙ্গে ? মানুষের যা কিছু সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি তা হলো সাফল্যের। কীর্তিই অবিনশ্বর। তার কোনো ক্ষয় নেই, শেষ নেই। সামান্য তৃপ্তিতে কীর্তিমান মানুষের অন্তর তৃপ্ত হয় না। সে চায় সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ; কর্মের গৌরব, খ্যাতির সুখ।

নিন্দুকে যাই বলুক, লঙ্কা সাজানো শহর। পর্যটকদের চোখ জুড়ানো সব পেয়েছির দেশ সোনার লঙ্কা। একটা মনোরম অনুভূতি ফুলের সুগন্ধের মতো সমস্ত চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে যায়, তাকে নতুন প্রাণ দেয়। মনখারাপ করা আর্তিকে নবীকৃত করে।

সভাকক্ষ জুড়ে এক অনুচ্চারিত গুঞ্জন ক্রমে কোলাহলের রূপ নিল। বিভীষণের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতায় সে আচ্ছন্ন। দৃষ্টির অন্তর্ভেদী শূন্যতা পারিষদবর্গকে ছুঁয়েছিল সর্বক্ষণ, তবু কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, কানেও শুনছিল না। সবার চোখ সম্পাতির উপর। তার দিকে তাকিয়েই পারিষদেরা সতর্ক হয়ে সাবধানে কথাবার্তা বলছিল। তাদের উদ্দেশ করেই সম্পাতি বলল : মাননীয় পারিষদবর্গ, আত্মতুষ্ট হওয়ার মতো কোন কাজ আমরা করিনি। উৎফুল্ল হওয়া আমাদের মানায় না। বাইরের লোকের চোখে নিজেদের একজন সার্থক পুরুষ মনে করে আত্মতুষ্ট হওয়া কিংবা সোনার লঙ্কার সুনাম এবং গৌরবের কথা শুনে গর্বিত কিংবা আত্মতৃপ্ত হওয়ার ভেতর যে আমাদের কতখানি ব্যর্থতা এবং ফাঁক ও ফাঁকি লুকিয়ে আছে ; চোখ থাকতেও আমরা দেখি না। দারিদ্র্য আমাদের লজ্জা। ক্ষুধাক্লিষ্ট, নিরন্ন, অভাবী মানুষদের বিষণ্ন মুখখানি ভুলে আছি। তাদের ঘরে দৈন্য কেন, তাদের মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য আমরা কতটুকু করেছি, সেকথা ভাবলে লজ্জা হয়।

সভাকক্ষের কলরবের মধ্যে সম্পাতির কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। একটা দাবিই সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল : মহারাজ, রাজদ্রোহী সম্পাতিকে বন্দী করুন।

॥ দশ ॥

শরীর ঠিক রাখার জন্য প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে বিভীষণ একা ভ্রমণে বেড়োয়। সঙ্গে থাকে নেকড়ের মতো পোষা সারমেয়। নগরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্ত হাওয়া খেলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে, মাথাটাও খোলসা হয়। দিন দিন সে মুটিয়ে যাচ্ছে। শরীরের চারদিকে চর্বি বাড়ছে। পোষা কুত্তার মতো কুতকুতে দৃষ্টি, থলথলে মাংস তার শরীরে। তাই একটু শ্বাসকষ্ট ও নানা ব্যাধির উপসর্গ ইদানীং তাকে ভীত করে তুলেছে। তাই শ্বাসক্রিয়া জটিলতা মুক্ত রাখার জন্য প্রাতঃভ্রমণ করে। মাঝে মাঝে পথে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের ডান দিকের রন্ধ্র বন্ধ রেখে বাম দিকের রন্ধ্র দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। তারপর কিছুক্ষণ শ্বাসক্রিয়া বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে অন্য রন্ধ্র দিয়ে শ্বাস ছাড়ে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ করার পর আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। বিভীষণ দীর্ঘজীবী হতে চায়। অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখে। দ্রুত মরে গিয়ে এই তিলোত্তমা নগরী সোনার লঙ্কা অন্যের

হাতে তুলে দিতে চায় না। কারণ তার কোন উত্তরাধিকারী নেই। সন্তানেরা সব লঙ্কা যুদ্ধে নিহত। সেজন্য তার কোন দুঃখ হয় না। ওর একটাই দুঃখ নতুন করে কোন সন্তান হলো না বলে।

হাঁটতে হাঁটতে যতদূর চোখ যায় লঙ্কার দিগন্ত জোড়া প্রান্তর অনাবৃষ্টিতে ধূ-ধূ করছে। যেন পুড়ে ধূসর হয়ে গেছে প্রকৃতি। নদীতে পড়েছে চড়া। খাদ্যের অভাবে দুগ্ধবতী গাভীও দুধ দেয় না। মানুষের ঘরেও অন্নের হাহাকার। অধরে একফালি হাসিও নেই তাদের। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় চৌরাস্তার গোল চত্বরের সামনে। এখনও সাজানো মঞ্চের চারপাশে শুকনো ফুলের ছড়াছড়ি। এখানে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশে গতকাল রাজনৈতিক সাফল্য নিয়ে বক্তৃতা করেছিল। দশবছর ধরে পারিষদদের কাছে যে কথাটা বলে এসেছে সেই কথাটাই জনগণকে শুনিয়েছিল। কানেতে কথাগুলো অণুরণিত হতে লাগল— আমাদের সকলের গর্বের লঙ্কাকে তিলোত্তমা নগরী করব। বনবীথিতে ছেয়ে যাবে রাস্তার দু'পাশ। পথিকের ক্লেশ থাকবে না। পাখির কাকলীতে মুখর হয়ে থাকবে সর্বক্ষণ। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হবে নগরের ভবনগুলো। একমাত্র সৌন্দর্যবোধই পারে মানুষের মনকে সুন্দর করতে। বাইরের বাহারের আলো পড়ে মানুষের মনের অন্ধকার কেটে যাবে। তার ভেতর ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। ভোগাকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হবে এ মানুষ তার অভাব মেটানোর জন্য পরিশ্রমী হবে। কেউ আর অলস থাকবে না। সবাই সমৃদ্ধির পেছনে দৌড়বে। একেই বলে দেশ ও দশের উন্নতি। মানুষের এই শুভবুদ্ধি ফিরবে দেশের শ্রী-সৌন্দর্যও সমৃদ্ধি থেকে। হে আমার প্রিয় প্রজাগণ নগরের খোলা বাতাসে ফুলের শোভায় চোখ রাখলে তার ফুসফুসে স্নিগ্ধ সতেজ বাতাস প্রবেশ করবে। তাতে মানুষের অর্ধেক অসুখ কমে যাবে। চোখের দৃষ্টি প্রখর হবে। সৌন্দর্য খিদে তার আসল খিদে লাঘব করবে। পুষ্পিত কাননের শোভা, উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা, পাখির কাকলী, শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শে তার হৃদয় মন ভরে উঠবে। অভাব নিয়ে অভিযোগ থাকবে না। মানুষের ভেতর কাঙালপনা থাকবে না। উদ্যান থেকে একটি সুরভিত রমণীয় ফুল তুলে নিলেই মনে হবে ইন্দ্রের পারিজাত পেয়েছে হাতে। বন্ধুগণ, সমৃদ্ধ নগরে জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে মানুষ যত ছুটবে, তাকে দু'হাত ভরে ধরার চেষ্টা করতেই সব সময় কেটে যাবে তার। অলস মস্তিষ্কের শয়তানটা তাকে দিয়ে পাপ কাজ করার সময় পাবে না। তাই চুরি, রাহাজানি অনেক কমে গেছে। মানুষের সমৃদ্ধ জীবন কামনার পথ ধরেই নগরের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির দিন দিন ভালো হচ্ছে।

বিভীষণের কণ্ঠে আবেগের ছোঁয়া লাগল। স্বর্ণপাত্রে রাখা জলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগল : আমার-আপনার সোনার লঙ্কা আপনাদের স্বার্থহীন সেবায়, পরিশ্রমে বিকাশশীল। এর সব কৃতিত্ব, গৌরব আপনাদের। আমি শুধু আপনাদের সেবা করে ধন্য হয়ে গেছি। আপনাদের মতো অনুগত, বাধ্য প্রজাই

আমার সাফল্যের মূলধন।

শিকলে বাঁধা পোষা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বিভীষণের অভিভূত আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। শিকলে কুকুরটাকে টেনে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল। কুকুর তো নয় নেকড়ে। ভীষণ আক্রোশে গজরাচ্ছিল। তেড়ে তেড়ে লাফিয়ে উঠছিল। শিকলটা শক্ত হাতে ধরে রাখতে বিভীষণ হিমশিম খেল।

বনবীথির বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ। সাধারণ দীন দরিদ্র অভাবী মানুষ নয়। সৌম্য দর্শন। মুহূর্তে নজর কেড়ে নেয়। সাধারণ মাপের মানুষের চেয়ে একটু বেশি লম্বা। বিধাতা হাতুড়ি পিটিয়ে মজবুত করেছেন যেন। কোথাও একটু বাড়তি মেদ নেই। মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কেশদাম। চুলগুলো গুটিয়ে কদমছাঁটের মতো দেখাচ্ছে। অপ্রশস্ত ললাট দেশে নাক বরাবর দুটো শিরা ফুলে ফুলে উঠেছে। গোটা মুখশ্রীর এটাই বেমানান। লোকটি সম্পর্কে বিভীষণের কৌতূহল হঠাৎ বেড়ে গেল।

কুকুরটা ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। বিভীষণ অনেক বুঝিয়ে তাকে সংযত করল। বলল : তুমি কে ভাই? কোথা থেকে আসছ? আমার সঙ্গে কথা বলবে কি তুমি?

বিভীষণের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে আগন্তুক মুগ্ধ হয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটার পর বলল : আমি চন্দ্রগুপ্ত। এর অধিক পরিচয় জানতে চাইবেন না রাজন।

চমকাল বিভীষণ। মুহূর্তে মুখের রঙ বদলে গেল। মাল্যবানের ভগিনী অনিলার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত। রামের লঙ্কা আক্রমণে সাহায্য করার জন্য সুগ্রীবের উপর প্রতিশোধ নিতে দশবছর আগে তার কন্যা সিংহিকাকে হরণ করেছিল। তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। হঠাৎ এভাবে উদয় হওয়ার জন্য বিভীষণ একটু উদ্বিগ্ন হলো। পাছে তার ভাবান্তর দেখে ফেলে সে, তাই না চেনার ভান করে বলল: সবাই নিজেকে জাহির করতে ভালোবাসে। তুমি তাদের মতো নও কেন?

চটপট উত্তর দিল চন্দ্রগুপ্ত : আপনাকে দেখতে আমার মতো নয় কেন? এ প্রশ্নের জবাব হয় কি? হয় না। তাদের মতো না হওয়া তেমনি আমার দোষের নয়। আমি শুধু আমার মতো। আপনার ব্যক্তিসত্তা যেমন আমার, তেমনি আমারটা আমার। সেখানে অন্যের প্রবেশাধিকার নেই।

অপমানের মধ্যে বিভীষণের স্মিত হাসিতে সপ্রতিভ কৌতুক এবং অশেষ ক্ষমা মাখানো ছিল। বলল: তোমার কথাই ঠিক, বেশি জানতে নেই কখনও। জানতে চাওয়াটা কখনও বোকামি হয়ে যায়। কথাগুলো গভীর অপমান থেকে উৎসারিত হয়ে যন্ত্রণার মতো চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

সকালের রোদের সোনালী উষ্ণতা ঝুপ করে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাথার শিরা দপদপ করছিল। নেকড়ে কুকুরের মতো অসহিষ্ণু ক্রোধে তার বুকের ভেতরটা

গজরাচ্ছিল। শরীরের মধ্যে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় রক্ত শুকিয়ে গেছে।

চন্দ্রগুপ্ত অধরে স্মিত হাসি। বলল : আপনি চিরদিনই একটু বেশী বিনয়ী। অথবা, নিজেকে নিয়ে এক অদ্ভুত কৌতুক করার মতো মনের উদারতা আপনার আছে।

বিভীষণ বলল : যেতে যেতে কথা বলি।

পাশাপাশি গাছের ছায়া মারিয়ে ওরা দু'জন হাঁটতে লাগল। গা শির শির এক ভয়ের অনুভূতি হয় সেই সময় বিভীষণের।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রগুপ্তই বলল : খুব ভালো লাগল আপনার কথা শুনে কাল। মনে হলো, সোনার লঙ্কার উন্নতি ও সমৃদ্ধি আপনার আগে এত গভীরভাবে কেউ ভাবেনি। বাইরের সাজপোশাক দিয়ে ভেতরের মানুষকে চেনা যায় কি? আপনি সোনার লঙ্কার জন্য যা করেছেন তাতে দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়াবে, মানুষ পরিশ্রমী হবে, অর্থের পেছনে, অন্নের পেছনে দৌড়নোর জন্যই করেছে। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যার জয় হলো লোকে বলবে জিতল সেই।

এই অবধি বলে চন্দ্রগুপ্ত চুপ করে রইল। বিভীষণের দুই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল : তুমি চমৎকার কথা বল।

চন্দ্রগুপ্ত নিরাসক্তভাবে বলল : আসলে, আমার অসুবিধে হয়েছিল আপনি চলে যাওয়ার পর। স্বপ্নটা ভেঙে গেল। রাতেও ভালো ঘুম হলো না। কোথায় যেন কাঁদছে কে — খিদের কান্না, বুক চাপড়ানো হাহাকার করে লোকে বলছে, রাজাটা মিথ্যেবাদী। ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় সমালোচনায় ধুম পড়ে গেছে। কোতোয়ালের লোকজন লাঠি হাতে তেড়ে এসে পিটিয়ে জমায়েত ভাঙল, কর্কশ স্বরে কারা যেন তাদের ধমকাল। তেড়ে এল কুকুরের দল। ধুপধাপ মিলিয়ে যায় পায়ের শব্দ, কোলাহল, হইচই। তারপর সব নিঝুম হয়ে যায়। বিছানায় উঠে বসে থাকি চুপ করে। সূর্য ওঠার অপেক্ষায় বসে থাকি। নিজের মনেই ভাবি, ভুখা মানুষেরা কেউ চতুর নয়। বেঁচে থাকার মতো সম্বল পেলেই তারা খুশি। অর্থ, প্রতিপত্তি, আত্মসম্মানের প্রয়োজন নেই তাদের। লেখাপড়ার ধার ধারে না তারা, সংস্কৃতি কী বোঝে না। নগরের জন্য ভালোমন্দ বোধ নেই। দেশের উন্নতি নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তারা বোঝে কেবল নিজেকে। পেটের খিদের জন্য তারা রক্ত জল করে দিতে পারে, তবু এই নগরের প্রতি তাদের কোনো কর্তব্য বোধ জন্মাবে না। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ পাওয়াটা তাদের কাছে বড়। কেউ যদি বলে এই তিলোত্তমা নগর কিংবা সোনার লঙ্কা আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাকে এক নতুন ভূস্বর্গ দেব, তাতেই ওরা রাজি হয়ে যাবে। এজন্য ওদের কোন কষ্ট হবে না, কারণ ওদের কোন নীতিবোধ নেই। এও এক ধরনের অসুখ। যাদের আছে তাদের জন্য কোন ওষুধ নেই। সারা জীবন ধরে কাতরায়। গরিব মানুষগুলো জীবন্মৃত হয়ে বাঁচে। অভাবী

মানুষদের সেভাবে বাঁচাতে হয়। বলতে বলতে চন্দ্রগুপ্তর ঠোঁটে একধরনের হাসি ধরে রাখে কৌতুকে আনন্দে।

নরমে গরমে মেশানো চন্দ্রগুপ্তর তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষের তীরের মুখটা অবশেষে তার এবং পারিষদদের দিকে যে ঘুরিয়ে ধরেছে এটা বুঝতে বিভীষণের কষ্ট হলো না। তবু কষ্ট করে হেসে জিগ্যেস করে, তোমার মনের অসুখের জন্য বদ্যি দেখাওনি? জনপদের কোণে কোণে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। প্রজাদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবেই জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম।

চন্দ্রগুপ্ত ব্যঙ্গ করে বলল: আহ্ কী শান্তির কথা! অসুখের অর্ধেকটাই সেরে গেল। বদ্যি নেই, পথ্য নেই, ওষুধ নেই, রোগীদের দেখার লোক নেই। আছে শুধু কয়েকটা বাড়ি আর কতকগুলো ধূর্ত মানুষ। তাদেরই স্বর্গরাজ্য।

বিভীষণের শরীর ঘামতে থাকে। জেদী কুকুরটাকে অনবরত সামলাতে কালঘাম ছুটে গেল তার। এর উপর চন্দ্রগুপ্তর টানাটানা কথা তাকে বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলল। সমস্ত ব্যাপারটা হেসে হালকা করার জন্যই বলল: কুকুরটা বড় জ্বালাচ্ছে। তোমার সঙ্গে যে দুটো কথা বলব তার জো নেই। আসলে কী জান চন্দ্রগুপ্ত, মানুষ স্বাস্থ্য-সচেতন নয় বলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বৈদ্যদের কাজ নেই। ওষুধের ব্যবহার নেই।

তা ঠিক। কাল শোভিত সমৃদ্ধ নগরীর ভূরি ভূরি প্রশংসার পাশাপাশি আরো একটা পরিচিত ছবির কথা উল্লেখ করতে আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়।

বয়স হচ্ছে, সব কথা মনে রাখতে পারি না। ভাষণের সময় অনেক কথা বলব বলে ঠিক থাকলেও সময়ে মনে পড়ে না। প্রসঙ্গান্তরে হারিয়ে যায়।

হ্যাঁ, একজন আত্মসচেতন নাগরিক হয়ে আমি তো আর সেকথা ভুলতে পারি না। আমার বিবেক আপনাকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য আজ ভোরে এখানে টেনে এনেছে। স্বর্গের পাশাপাশি নরকও আছে। বনবীথি শোভিত প্রশস্ত রাজপথের পাশাপাশি অপ্রশস্ত এঁদো পড়া রাস্তা, ঘিঞ্জিমারা কুঠি আবর্জনার স্তূপ, মশার কামড়, সরু গলি, আলো বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় মানুষের বসতের উল্লেখ আপনার ভাষণে নেই। চারদিকে এত নোংরা যে দৃষ্টি মেলা যায় না। কাজেই চেনা মুখ অচেনা হয়ে গেলে তাই নিয়ে কেউ যদি অভিযোগ করে তবে তাকে ভণ্ড, শঠ বলতেই হবে। গ্রাম রিক্ত হচ্ছে বলেই শহরে ভিড় বাড়ছে। পরিশ্রমে এই সাধারণ মানুষগুলো বিমুখ নয় বলেই শহরে আশ্রয় খোঁজে কাজের প্রত্যাশায়। তাই তো নগরে এত আর্বজনা জমে ওঠে। আমার অবাক লাগে, এই মানুষগুলো এভাবে পালিয়ে কতদিন এই নগরে থাকতে পারবে? কতকাল চোখ বুজে এই বঞ্চনা সহ্য করবে? চোখ বুজে থাকলেই কি হয়? ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি, প্রতিবেশীর সঙ্গে মধুর আত্মিক সম্পর্ক এখানে তো প্রাণপণ চেষ্টায় মুছে ফেলতে হচ্ছে।

তুমি কী বলতে চাও। কিছুকাল আগে রামচন্দ্রের রাজ্যে শম্বুক নামে এক দুরাচারী ব্যাধ রামচন্দ্রকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে অকারণে প্রাণটা দিতে হলো। সব কাজের ভালো মন্দ দুটো দিক আছে।

চন্দ্রগুপ্ত কথার মধ্যে বলল : কাল সুন্দর শোভিত উদ্যানে যুবতীর ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ লাশ পড়েছিল। নগরের লোকেরা ভিড় করে দেখেছে সে লাশ। আমিও দেখেছি। পিঁপড়ে ধরেছিল লাশের গায়ে, মাছি ভনভন করছিল সারা অঙ্গে। লাশের চোখ উপড়ানো, স্তন কাটা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। মুখটা হাঁ করা, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া। একটু পরে কোতোয়ালের বাহিনী এসে তার পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। সোনার লঙ্কার স্বর্গরাজ্যে একোন অভিশপ্ত রমণী দশমবর্ষের পূর্তির দিনে বলি হলো ? মহারাজ, দেখে ভালো লাগল, এত বড় একটা বিশ্রী কাণ্ড দেখে ক্ষোভে রোষে গর্জে উঠল না কেউ। জনগণের রোষ স্পর্শ করল না কোতোয়ালদের অমানবিক কার্যকলাপ দেখে। মানুষ কী ভীষণ নির্লিপ্ত! মানুষের নির্বিকারত্বের ছোবলে গুঁড়িয়ে যায় সহায়হীন যুবতীর যৌবন, জীবন, সুখ স্বপ্ন। আশ্চর্য! যারা খুন করে, ধর্ষণ করে স্বর্গরাজ্যে তারা কেউ ধরা পড়ে না, তাদের কোনো বিচার হয় না। নগরের মানুষ তাদের পুজো করে, পুজো দেয়। তাদের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয় মহারাজের পরিষদবর্গ। এভাবেই নগরের মানুষ সোনার লঙ্কায় গর্বের সঙ্গে জীবন কাটায়।

বিভীষণের অনুভূতি গরম সীসার মতো পুড়ে যায়। ওর মন কুঁকড়ে যায়। আস্তে আস্তে বলল : তুমি অপ্রকৃতিস্থ যুবক। তোমার চোখ দুটো রক্তের মতো লাল, মুখে প্রলাপ, চুল উসকোখুসকো, দৃষ্টি বুনো পশুর মতো গোঁয়ার এবং একরোখা হয়ে উঠছে একটু একটু করে। তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভুল হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্তর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাঁকা হাসি হাসল। বলল : তিলোত্তমা নগরী সোনার লঙ্কায় কোনো মানুষের কি কখনো মরতে ইচ্ছে করে ?

বিভীষণের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। মুখে বিরক্তি ফোটে। ভুরু কুঁচকে যায়। বোঝা যায় উদ্ভট কথাটা তার পছন্দ হয়নি। কোন উত্তর না দিয়ে নেকড়ের মতো কুকুরটাকে নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে প্রাসাদের সিংহদরজা পার হয়ে যায়। পিছন ফিরে একবার চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকাল। মানুষটা সকলের থেকে একটু আলাদা। ওই মানুষটার বুকে ও-কিসের আগুন ? বিভীষণের মাথাটা কেমন করে উঠল। ওর বুকের যন্ত্রণা, গ্লানি, বিষাদ ভালো লাগে না তার। এ কোন উৎপাত ঢুকল সোনার লঙ্কায় ? দশবছর পরে মনে হলো তাকে অভিযোগ করার স্পর্ধা কোনো কোনো মানুষের আছে। এই দুর্ভাবনায় বিভীষণের বুক পুড়ে যায়। রাবণকে হারিয়ে সে বিজয়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হলো, নিজের অজান্তে চন্দ্রগুপ্তের কাছে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসেছে। লজ্জা, ক্ষোভ, ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা অনেক কিছু নিয়ে তার মনে এক বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি হলো। ইচ্ছে হলো, চন্দ্রগুপ্তকে কুকুর লেলিয়ে

দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে। কিন্তু — ওর দোষ কী? অভিযোগ, অনুযোগ তো থাকতে পারে। অমনি চন্দ্রগুপ্তর উপর সব রাগ তার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সোনার লঙ্কার সৌন্দর্য, সমৃদ্ধির কিছু বোঝে না। ও নিজেই একটা পোকা। ক্ষতিকারক কীট। সৌন্দর্যকে কেটে নষ্ট করবে হয়তো।

সে রাতে ঘুমুতে পারে না বিভীষণ। বার বার ঘুম ভেঙে যায়। ভোররাতের দিকে স্বপ্ন দেখে ও। সামান্য তন্দ্রা এসেছিল, সেই সময় ঐ স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখল চন্দ্রগুপ্ত দেবতা হয়ে গেছে। অভাবী মানুষেরা ওকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছে। তার পুজো দেওয়ার জন্য সোনার লঙ্কায় মানুষের ঢল নেমেছে। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই হতদরিদ্র, ব্যথিত, ভাগ্যহত মানুষের দল। চন্দ্রগুপ্তর পায়ের কাছে মানুষের মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে। ফুলে ফুলে ভরে গেছে সারা শরীর। মাথাটুকু ছাড়া আর সবই ফুলে ঢাকা পড়েছে। মহিষাসুর মর্দিনীর মতো ওর দশহাত দশদিকে প্রসারিত। বিভীষণ দেখল পায়ের নিচে তার মতো অনেক মানুষকে থেঁৎলে দিয়ে সে সর্বহারা মানুষের পুজো নিচ্ছে। দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করছে। ওর আশীর্বাদে তারা সব বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রগুপ্তর পায়ের তলায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। তার পোষা নেকড়ে কুকুরটা মহানন্দে তার রুধির চেটেপুটে খাচ্ছে। স্বপ্নের ভয়ে বিভীষণ নড়তে পারে না। শ্বাস ফেলতে পারে না। চিৎকার করে সরমাকে ডাকতেও ভয় করল তার। বিছানার সঙ্গে লেপ্টে পড়ে থাকে। কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। মুখ থেকে একটা গোঙানির মতো আওয়াজ হতে থাকে। পরিচারিকা ছুটে এসে জাগিয়ে দিল তাকে।

ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে বিভীষণের মাথার যন্ত্রণা কমতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শরীর জুড়ে এক অস্বাভাবিক শ্রান্তিকে বড় কাহিল লাগল।

স্থপতি শিল্পকান্ত এবং শিল্পপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চন্দ্রকান্তর প্রাসাদোপম বাসগৃহটি শ্বেতপাথরে মোড়া। বিশাল এলাকাজুড়ে বণিকভ্রাতাদ্বয়ের স্বপ্নের নীড়। সাজানো উদ্যানের মাঝখানে ছবির মতো দেখাচ্ছে বাড়িখানি। বাহারী দেবদারু আর ঝাউগাছের সারি রাস্তার দু'পাশে। গোটা উদ্যান জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মর্মরমূর্তি। কী অপরূপ তাদের দেহ ভঙ্গি! আঠার মতো চোখ দুটো আটকে থাকে। বিভীষণের প্রসাদও এমন নয়নমনোহর নয়।

বণিক ভ্রাতাদ্বয়ের উদ্যান সাজাতে একটি কানাকড়িও খরচ হয়নি লোকে বলে। লঙ্কা নগরীর শোভাবর্ধনের জন্য স্থপতিদের নির্মিত সেরা মূর্তিগুলিই নাকি তাদের উদ্যান শোভিত করেছে। ব্যয় হয়েছে নগরোন্নয়নের বরাদ্দ অর্থভাণ্ডার থেকে। এটা হলো তাদের লাভের লাভ।

শিল্পকান্তের পুত্রের বিবাহোপলক্ষে সেখানে বিভীষণ ও মন্দোদরীর প্রথম পদার্পণ

করল। রথ থেকে নেমেই চমকে গিয়েছিল তারা। রাতকে দিন বানিয়ে ফেলেছে বণিক ভ্রাতারা। মন্দোদরী সবিস্ময়ে জিগ্যেস করল : এতো রাজার বিত্তকে হার মানায়। লঙ্কেশের নির্মিত প্রাসাদও এই সৌন্দর্যের কাছে কিছু নয়। এত অর্থ কোত্থেকে পেল ?

বিভীষণ একটু চুপ করে থাকল। চট করে জবাব দিতে পারল না। বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল : আমারও একই প্রশ্ন। কানে শুনেছি, সোনার লঙ্কার দর্শনীয় যদি কিছু থাকে তা হলো এই মরকতকুঞ্জ। এখানে না এলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হতো না।

মন্দোদরী বলল : আমারও অবাক লাগছে খুব। পিতৃদেব ময়কে টেক্কা দেয়ার স্থপতি হতে পারে, আমার জানা ছিল না। মরকতকুঞ্জ বণিক ভ্রাতৃদ্বয়ের গৌরব ও মর্যাদা। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে তাক লাগিয়ে দিয়ে স্থাপত্য শিল্পের বাজারটাকে তারা দখল করে নিল। চারদিক থেকে এবার ধনাগম হতে থাকবে।

বিভীষণ বলল : হ্যাঁ। তাতে লঙ্কারই নাম যশ হবে। একি কম কথা! তাদের কর্মকুশলতা রাজার ঐশ্বর্যকেও হার মানিয়ে দেয়। যাদের হাতে অর্থ আছে, তারা শিল্পকান্তকে দিয়ে রাজঐশ্বর্যকে টেক্কা দেবে।

মন্দোদরী বেশ একটু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল : হাঁ, রাজার চেয়েও বিত্তে, বৈভবে, ঐশ্বর্যে তারাও যে কম নয় এই কথাটা বণিকভ্রাতাদ্বয় লঙ্কাবাসীকে বেশি করে বোঝাল। দেশের অর্থনীতির লাগামটা রাজার হাতে নেই, তাদের হাতে। বণিক ভ্রাতৃদ্বয়ের বিপুল অর্থের উৎস কোথায়, তার খোঁজ বিভীষণ কোনকালে করবে না। রাজকর ফাঁকি দিয়ে নগরোন্নয়নের ব্যয় বরাদ্দের টাকা পুকুরচুরি করছে, তোমার প্রশাসন তাকে দেখেও দেখে না। রাজার প্রশ্রয়ে এরা রাজাকে এবং দেশকে ঠকাচ্ছে। সত্যিই, তুমি ধনী ও বণিকদের হাতের পুতুল রাজা। একথাটা লঙ্কার সব নাগরিকই জেনে গেছে।

মিছে কথা। বিভীষণ জোর দিয়েই কথাগুলো বলল।

মন্দোদরীর অধরে স্মিত হাসি ফুটল। বলল : মিছে কথা দিয়ে তোমাকে যারা ভুলিয়ে রেখেছে তারা কেউ মিত্র নয়, দেশের শত্রু। সম্পাতি ছাড়া একজনও নেই যাকে শ্রদ্ধা করা যায়। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে এই একটা মানুষই।

বিভীষণ ভীষণ অপমানিত বোধ করল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি। একদিন তোমার কথা শুনেই ওই বিত্তবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম। তোমাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সে কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে ? ওরা ব্যবসাদার! সব কিছুর মধ্যে ব্যবসার লাভ-লোকসান হিসেব করে। দেশের ভালো, জাতির উন্নতি এসব বোঝে না। এসব নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই। ওদের সাহায্য নিয়ে বিপন্ন লঙ্কা উদ্ধার পেয়েছিল। আজ তো সুদ সমেত আসল আদায় করবে এবং আমাকে দিতে হবে। এনিয়ে অভিযোগ কিংবা

আপসোস করলে তো হবে না। যখন ভাবার দরকার ছিল তখন ভাবনি। এখন আমাকে বিপদে ফেলে ভাবছ। বড় দেরি হয়ে গেছে তোমার ভাবা। ফেরার আর পথ নেই।

বিভীষণের কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে মন্দোদরী বলল : এসব চিরকালই আছে। সম্ভ্রান্ত বণিকেরা, অভিজাতেরা চিরকালই রাজার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। কাছের মানুষ। রাজার সুদিনে দুর্দিনে তারা পাশে থাকে। লঙ্কেশের আমলেও ছিল। কিন্তু তারা কেউ রাজাকে টেক্কা দেয়ার সাহস দেখায়নি। রাজার গৌরব মর্যাদার সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িয়ে গেছে। এই প্রাসাদ তোমাকে ব্যঙ্গ করছে। রাজার উন্নতমস্তক যদি দূর থেকে কেউ দেখতে না পায়, রাজ যদি ঐশ্বর্যে, সম্পদে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয় তা-হলে তার গৌরবের ধারা কমে যায়। লঙ্কার মানুষের মনে রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে কোন বিস্ময় জাগে না, মরকুতকুঞ্জের প্রশংসা করে তারা মুখে ফেনা তুলে দিচ্ছে। মরকতকুঞ্জের শোভা সৌন্দর্য, বিশালতা তাদের নজর কেড়ে নেয় বলে, যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। পাঁচিলের পাশে দাড়িয়ে ডিঙি মেরে গলা উঁচিয়ে উদ্যানের শোভা সৌন্দর্য দেখে। বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে চেয়ে থাকে প্রাসাদের স্থাপত্য শিল্পের দিকে। রাজা নয়, বণিকের শ্রেষ্ঠত্বের স্মৃতি বুকে নিয়ে তারা ঘরে ফেরে। বণিক ভ্রাতাদ্বয়ের যশ যত ছড়াচ্ছে তোমার মহিমা তত ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

বিভীষণের মুখে কথা জোগাল না। মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল। বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : তোমার অভিযোগ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার জোর পাই না মনে। কিন্তু কী করব বল। রাজার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে রাজারা নতুন নতুন প্রাসাদে তৈরি করে। এক জীবনে এক রাজা কত প্রাসাদ গড়ে বাস করে। কেবল আমি কিছু করতে পারলাম না। শিল্পকান্তের প্রাসাদ টেক্কা দিতে গেলে আর একটা নতুন প্রাসাদ বানাতে হয়। চেষ্টা করলে আমিও পারি কিস্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের ঘনিষ্ঠবন্ধু ও শ্রেষ্ঠ স্থপতি বিশ্বকর্মার পুত্র নলকে দিয়ে নতুন প্রাসাদ বানাতে, কিন্তু তাতে রাজকোষই শূন্য হবে। রাজা তো আর উপার্জন করে না, জনগণের অর্জিত অর্থের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সে অর্থের উপর রাজার অধিকার সামান্য। বিলাসে সম্ভোগে সেই সম্পদ নষ্ট করার কোন অধিকার আমার নেই। শিল্পকান্ত যা পারে, রাজ হয়ে আমি তা পারি না। শিল্পকান্তের ব্যয়ের কোন হিসাব দিতে হয় না, কিন্তু আমাকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

মন্দোদরী বলল : ওরা কেউ টাকা তৈরি করে না। টাকা গাছেও ফলে না। রাজ্যের অর্থহীন কৌশলে আত্মসাৎ করছে। রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে, জনকল্যাণের অর্থ খামচে নিচ্ছে, শ্রমিক, মজুরকে তার ন্যায্য মজুরি দিচ্ছে না, যা ব্যয় করা উচিত তা না করে চুরি করছে, এসব ঘটনা সবাই জানে — রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত, তবু কারো মাথাব্যথা নেই। ধনের পাহাড় জমে উঠেছে ওদের। বিলাসে, ব্যভিচারে, আনন্দে, উৎসবে বাজে খরচ করে নষ্ট করছে। নিজেদের সুখের জন্য, সুরক্ষার জন্য তারা

দেশ, জাতি কারো দিকে ফিরে তাকায় না। তোমার ঔদাসীন্যে আরো গরিব হচ্ছে, এখনি তো লঙ্কার অর্ধেক মানুষ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। এর পরে সকলকে ক্রীতদাস বানাবে। তা-হলেই ওদের সুবিধা। কুবেরের সময়ে ফিরে যাচ্ছি আবার। দেশ এগোচ্ছে না, পিছচ্ছে কেবল।

তোমার ধারণা ভুল মন্দোদরী। এদেশ এগোচ্ছে বলেই ওদের হাতে অর্থের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমার করার কিছু নেই। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, প্রগতি তরান্বিত করতে, ভেঙে পড়া অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য সব নিয়ন্ত্রণ এবং রাজাদেশ তুলে দিয়ে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার যে উদার অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছি একদিন তুমিও সমর্থন করেছিলে। নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে, কৃষির উন্নতি হবে, রুগ্ন কুটিরশিল্পে জোয়ার আসবে-এরকম অনেক কিছুই অনুমান করে, ভবিষ্যৎ ভালো হবে ভেবেই অন্যান্য দেশের মতো আমারও ঝুঁকি নিয়েছি। অযোধ্যায় শ্রীরাম মুক্ত বাণিজ্যনীতি, অর্থনীতি গ্রহণ করে এক চমক সৃষ্টি করল। কিন্তু চমকের ঘোর কাটতেই নানারকম সংকট সমস্যায় অযোধ্যার অর্থনীতি জর্জরিত ও বিপর্যস্ত যে সাধারণ মানুষ খেপে গেছে। সমৃদ্ধ অযোধ্যাও বিপন্ন। বিদ্রোহ, অশান্তি, অসহিষ্ণু উত্তেজনা সর্বক্ষণ লেগে আছে। এসব নিয়ে শ্রীরাম নাজেহাল। মানুষ খেতে না পেয়ে মরছে, চাকরি না পেয়ে বিদ্রোহ করছে। আমার মতো শ্রীরামও বিপন্ন ও অসহায়। ধনশালী সমৃদ্ধ দেবরাজ্য থেকে ঋণ নিয়ে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে। ঋণের ফাঁসে অযোধ্যার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মানুষের নজর অন্যদিকে ফেরাতে রামচন্দ্র প্রিয়তম পত্নী সীতাকে নির্বাসন দিয়েছে।

মন্দোদরী বলল : তুমি ভাগ্যবান। লঙ্কার নাগরিক অনেক ভদ্র, ভালো শান্ত এবং সহিষ্ণু। তাই মুখ বুজে সব মেনে নিচ্ছে। দু'চোখে তাদের স্বপ্ন। একটা কিছু প্রত্যাশা করে এবং বিশ্বাস নিয়ে তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস গেলে তাদের বশে রাখতে পারবে না।

জানি, মন্দোদরী। কিন্তু লাগামটা আর আমার হাতে নেই। শিল্পকান্ত, চন্দ্রকান্তদের মতো ব্যবসায়ীদের হাতেই দেশের সব ভবিষ্যৎ। ওরা শুধু নিজেদের বোঝে। দেশের মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখতে চায়। অর্থনীতির হাল ওদের হাতে। ওরা কৌশলে নিজেদের ভাণ্ডার ভরে তুলছে। ওরা একা নয় অনেকে। অর্থ আদান প্রদানের বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লেনদেনের ভেতর দিয়ে অর্থ পাচারের কৌশল এরা চমৎকার রপ্ত করেছে। দেশের আইনের আওতাতেই দেশের স্বর্ণ, স্বর্ণজাত দ্রব্য ফলাও কারবার করছে। স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণ অলঙ্কারের প্রসিদ্ধি ওদের ব্যবসায়ের সুনামের মূলধন। এছাড়াও অন্য পণ্য সামগ্রী আমদানির জন্য নগর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ভিন দেশে নিয়ে যায়। এসব জিনিসের বেচা-কেনা হয় কাগজে। অর্থাৎ, শত

সহস্র মুদ্রার জিনিস কেনা হলো কিন্তু কাগজ তৈরি হলো দুশত সহস্র মুদ্রার। বাড়তি মুদ্রাটা তাদের কাছে থেকে যায়। সেটা জমতে থাকে। অথচ, কাগজে-কলমে হিসাব পরীক্ষা করে সেটা ধরার উপায় নেই। এ এক চমৎকার খেলা। দেশের জিনিস বিদেশে পাঠানো ক্ষেত্রে একই জারিজুরি চলে। এসবের বাইরেও ব্যবসার আরো কত কূটকৌশল আছে তার সব কিছু আমার মাথায় ঢোকে না। বিশাল স্থাপত্যশিল্পের বাণিজ্যকেন্দ্র শিল্পকাণ্ডের। তার শিল্পী, কর্মী, কারিগরি বিদ্যাবুদ্ধি ও উপকরণ রপ্তানি-আমদানির মতো বড় বড় ব্যাপার। এক জীবনে এরা যা করে, বিশাল রাজ্য জয় করেও রাজা তা করতে পারে না। একজন ব্যবসায়ীর স্বার্থ তার ব্যবসার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে। কিন্তু রাজার কর্তব্য অনেক বড়। একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে কোন রাজাকে ধরে না, দিন বদলাচ্ছে। রাজার ঐশ্বর্য, গরিমা, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধ্যান-ধারণাও বদলানো দরকার। রাজার সব সাফল্য এবং গৌরব প্রজার মঙ্গল, কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের উপরে নির্ভর করে। লোক-দেখানো রাজবাড়ির ঐশ্বর্যের মধ্যে রাজার কোনো মহিমা নেই।

শিল্পকান্তের বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল বিভীষণের। রাতের-পোশাক পরে মন্দোদরীর উপর মায়া বিস্তার করে বিভীষণ শুলো। অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষার তার শরীর উত্তপ্ত হতে থাকে। মন্দোদরীর সঙ্গসুখের জন্য ভেতরটা তার আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সাহস হয় না তাকে ছোঁয়ার। মন্দোদরীর ভেতর একটা বাঘিনী লুকিয়ে আছে। তাকে ভীষণ ভয় পায় বিভীষণ।

পাশের ঘরে মন্দোদরী শুয়ে পড়েছে। মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল বিভীষণ। কিন্তু মন্দোদরী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখ বুজে শুয়েছিল। বিভীষণ অন্যঘর থেকে কাঙালের মতো অপলক চেয়েছিল তার দিকে। আশ্চর্য! মন্দোদরীর শরীরে একটু নড়া-চড়ার লক্ষণ নেই। অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে যায়। নরম গলায় বিভীষণ জিগ্যেস করে: ঘুমোলে নাকি?

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো সাড়া শরীর কাঁপিয়ে মন্দোদরী পাশ ফিরে ভর্ৎসনা করে বলল: তোমাকে না কতদিন বলেছি দরজা এমন করে হাট করে খুলে রাখবে না।

বিভীষণ একটু অসহিষ্ণু হয়ে সপ্রতিভ ভাবে বলল: অত চেঁচিয়ে ধমকে বলার কী আছে? আমি তো আর দূরে নেই।

সেজন্যে তো ভয়ে মরি। বলে বিস্রস্ত কাপড়টা সামলে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের উপর এভাবে দরজা বন্ধ করায় বিভীষণ খুব অপমানবোধ করল। রাগে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। বুনো মহিষের মতো আস্ফালন করে তেড়ে গেল দরজার দিকে। থমকে দাঁড়াল দোড়গোড়ায়। গায়ের জোরে বন্ধ দরজাটা ভাঙতে পারে। মন্দোদরীর উপর বলপ্রয়োগ করতে পারে। মন্দোদরী

নারী বলেই তার সঙ্গে বলে পারবে না। হঠাৎ প্রবল আত্মগ্লানিতে ও পিছিয়ে যায়। আরাম কেদারার উপর ধপাস করে বসল। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল : দরজা খোলা রাখলে আমার ভালো লাগে। তোমাকে দেখলেও সুখ হয়। জীবনের সব দরজা বন্ধ বলেই তোমাকে এত করে চাই।

রূপসী মন্দোদরীর ভেতরে থেকে এক বিষধর সর্প ফণা তুলে ধরল। বলল : ঢং। নিজের সতী সাধ্বী স্ত্রী থাকতে ভ্রাতৃবধূকে কাঙালের মতো চাইতে তোমার লজ্জা করে না? লজ্জা-শরমের বালাই নেই বলে এত বেহায়া তুমি। আমি তো পাথর দিয়ে তৈরি নই, রক্ত-মাংসের মানুষ। গালমন্দ করে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে, মুখের ওপর না করতে আমারও কষ্ট হয়। আমার বুকে দয়া মায়া, ভালোবাসার পুকুর তো শুকিয়ে যায়নি। আমিও ভালো করে বুঝি না, সত্যি তোমায় ভালোবাসি কি না?

আবার বল মন্দোদরী। ভালোবাসার কথা শুনে বুক জুড়িয়ে যায়। আমার সব অবসাদ কেটে যায়। একাকিত্ব ঘুচে যায়। আমি নতুন মানুষ হয়ে উঠি।

সত্যি, তুমি একটা পাগল। কেন বোঝ না, একসঙ্গে পাশাপাশি একচত্বরে প্রতিদিন বাস করলে একধরনের মায়া তো জমায়। বাড়ির কুকুর, বেড়ালের প্রতিও একধরনের মমতা তো হয়। তুমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ। আমি স্বীকার না করলেও তুমি আমার স্বামীও বটে। আমার ওপর তোমার অধিকার আছে। জোর আছে। ইচ্ছে করলে তুমি জোর খাটিয়ে যদি কিছু কর আমি তো না করে ফেরাতে পারব না। বড় ভয়ে ভয়ে থাকি। কী করব আমার সংস্কার, স্মৃতি ভুলে তোমাকে মেনে নিতে পারছি না। আবার দিনের পর দিন কাঙালের মতো চেয়ে তুমি শুধু নিজেকে ছোট করছ। সত্যি তুমি খুব ভালো, ভীষণ ভালো তাই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনদিন জোর খাটাওনি। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন নিজেরই চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। ভিখিরির মতো এই সামান্য শরীরটাকে তুমি আর চেয়ো না। তোমার অধিকারকে না বলতে বুক ভেঙে যায়। সত্যি ভেঙে যায়। তোমাকে আমার কথা ঠিক বোঝাতে পারব না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

দরজার ওপাশ থেকে বিভীষণ কাতর কণ্ঠে বলল : শুধু তোমার কথাটাই ভাবছ। আমার জন্য অন্তত একটু ভাব।

যেখান থেকে শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয় সেখানে প্রত্যাশার কিছুমাত্র থাকে না। দেহে মনে না পেলেও তোমার মহত্ত্ব চিরদিন মনে থাকবে আমার। ভালোবাসায় শরীরে এসে পড়লে ভালোবাসা মরে যায়। এ আমার গভীর বিশ্বাস।

মন্দোদরী, কথাটা উচ্চারণ করার পরেই গভীর দুঃখে তার স্বরভঙ্গ হয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল : তোমাকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়ার সুখ আমার কাছে শারীরিক মিলনের চেয়ে বেশি আনন্দের।

আজ এমন করে মুগ্ধ করা মনগলানো স্বরে ডাকলে কেন? বসন্ত তো মরে

গেছে অনেকদিন। দোসরও নেই। তবু রাতের বেলায় মোহিনী গলায় পুলকভরে ডাকলে কেউ স্থির থাকতে পারে? মনের দরজা বন্ধ করে যে মুক্তি আমি চেয়েছিলাম, তোমার মনের দীপের আলো পড়তে দেখলাম আমার শরীরের দরজা হাট করে খোলা আছে। বিপদ ওৎ পেতে আছে। তাই বলছি, আমাকে তুমি চেয়ো না, সেই হবে আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মন্দোদরীর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, বিভীষণের সাহস হলো না দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে তাকে একটু সাহস দেওয়ার।

॥ এগারো ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষের বন্ধু রাজ্যগুলির নরপতিদের বৈঠকে যোগদান করতে লঙ্কা থেকে বিভীষণ পুষ্পকরথে মন্দোদরী এবং মালীর সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করল। আকাশপথে বহুকাল পরে লঙ্কা দর্শনের সুযোগ হলো মন্দোদরীর। কতকাল লঙ্কাকে দেখা হয়নি। লঙ্কার চোখ জুড়োনো সেই শ্যামল সবুজরূপ, অবারিত সবুজ প্রান্তর, দিগন্ত-জোড়া সবুজ বনানীর শূন্যতা তার চোখকে পীড়িত করল। চারদিকে বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, কোথাও কোথাও ছোট ছোট গৃহ, নানারকম কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। বড় বড় চিমনি আকাশের দিকে মুখ তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। বগ বগ করে কালো ধোঁয়ায় নীল আকাশ কালি হয়ে যাচ্ছে। বিশাল শহর ও শিল্প এলাকার পর সবুজ প্রান্তর এবং গাছগাছালি চোখে পড়ল। কৃষিক্ষেত্র সরতে সরতে এক কোনায় গিয়ে ঠেকেছে। বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে ভয়ে জড় সড় হয়ে থাকা ফাঁসির আসামীর মতো তার অবস্থা। দেখলে করুণা হয়। মমতার পাতাল ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো চোখের কোণ বেয়ে জলের নির্ঝর নামল। অনেক স্মৃতি অনেক ঘটনা মনে পড়ল তার।

বিমান চলছিল, না একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুই বুঝতে পারছিল না। মন্দোদরীর স্মৃতি নিঃশব্দে সুদূর অতীতে পাড়ি দিল। বেশিদিন আগের কথা নয়। সীতা হরণ নিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যখন বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছিল তখন মন্দোদরীও তাকে তিরস্কার করতে ছাড়েনি। কানের পর্দায় সেদিনের কথাগুলো ঝংকারে বাজে আজও। মন্দোদরী নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আর রাবণ তার আক্রমণের মুখে কেমন শান্ত, নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন। তাতেই তার রাগ চড়ে গেল। বলল : তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব, অহঙ্কারকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তুমি কী খুব সুখ পাও? তোমার নিন্দেতে কান পাততে পারছি না। আমার বিবেকও অসহিষ্ণু হয়ে প্রতিবাদ করছে তীব্র চিৎকারে; তুমি অপরাধী, পাপী।

রাবণ নির্বিকারভাবে বলল: সুযোগসন্ধানী, মিথ্যেবাদী, নিন্দুকদের কথায় কান দিয়ে তোমার মনের শান্তি নষ্ট কর না। তোমার গর্ব, অহঙ্কারের গায়ে এতটুকু আঁচড়

লাগবে এমন কাজ আমি করেনি।

তা হলে সীতাকে তুমি ছেড়ে দাও। সে তো কোনো দোষ করেনি।

সীতা তো অপহৃত হয়নি। তাকে ছেড়ে দেই কী করে? রামচন্দ্র আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। বোকা বানিয়েছে। তার চালাকি এবং কপটতার কাছে সত্যি আমার হার হয়েছে। সীতা বলে যাকে হরণ করলাম সে সীতা নয়। অথচ, রামচন্দ্র, শূর্পনখাকে লাঞ্ছনা করে প্রতিশোধ পরায়ণ রাবণকে উত্তেজিত করেছিল। শূর্পনখার প্রতিশোধের খড়্গ পাছে সীতার উপর নেমে আসে তাই আগেই অত্রিমুনির আশ্রমে তাকে সরিয়ে দিল। শূর্পনখার নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে সীতা ভ্রমে যাকে হরণ করলাম সে রামচন্দ্রের কেউ নয়। একজন অনুরাগিণী ভক্ত মাত্র।

মুখে চুক চুক শব্দ করে মন্দোদরী বলল: আহা, দুঃখে মরে যাই। বদলা নেওয়ার কী বুদ্ধি? আসল বাদ দিয়ে নকলের উপর প্রতিশোধ নিলে তাকে বদলা বলে কি? কার উপর বদলা নিচ্ছ? সে বেচারা তো কোন দোষ করেনি। তা-হলে তোমাদের ঝগড়ার ভেতর তাকে টেনে আনছ কেন?

রাবণ হাসল। বলল: শ্রীরামই তাকে মর্যাদার লড়াইয়ের কেন্দ্রে টেনে এনেছে। সে নির্দোষ, কিন্তু তার ভাগ্যই প্রতারণা করেছে তাকে। এখন সে আমাদের উভয়ের কাছে আসল সীতার চেয়ে বেশি সত্য এবং বাস্তব। তবু অপরাধী রামচন্দ্রের কপটতা নিয়ে তোমার কাছে কেউ নিন্দে-মন্দ করে না। এও এক কপাল।

মন্দোদরীর অধরে স্মিত হাসির আভা ফুটে উঠল। হাসলেই তার দুগালে টোল পড়ে। তখন সুন্দর লাগে দেখতে। রাবণ সেদিকে অপলক চেয়ে বলল: তোমার দু'গালের এই টোলটা যে, আমার কী ভালো লাগে! বয়স হয়েছে, তবু একটু বেঁকেনি। তেমনি নিটোল আছে।

মন্দোদরী বলল: তাই বুঝি। রাজনীতিতে রামের কাছে এখনও শিশু রয়ে গেলে। তোমার অনুমান সত্য হলে বলব সকলের গায়ে সীতা নামের ছাপ দিয়ে সে তোমার চরিত্র হনন করল। তোমার যা কিছু গৌরব, খ্যাতি, সুনাম-দীর্ঘকাল ধরে একার চেষ্টায় যা তুমি তৈরি করেছ রাম তার উপর কলঙ্ক লেপন করল। প্রচারে, কৌশলে তুমি রামচন্দ্র অপেক্ষা বহু পিছিয়ে।

তোমার অনুমান সত্য। সেজন্য আমার মনে কোন দুঃখ, অভিমান কিংবা অনুশোচনা নেই। রামের এ গৌরবের একজন অংশীদার হতে পেরে আমি খুশি। রামচন্দ্রকে নিয়ে আমার মনেও এক প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। আমার প্রশ্রয় না থাকলে রাবণের প্রকাশ্য নিন্দে করা কারো সাধ্যে কুলোয় না। সত্যি, ওই সব ঠুনকো কথায় আমার কিছু যায় আসে না। বর্তমানই আমার কাছে একমাত্র সত্য। আমার দুঃখ রামচন্দ্র সীতা নামটা নোংরা রাজনীতির ঘোলা আবর্তের মধ্যে টেনে এনে সীতা নামটাকে এবং নারীর মর্যাদা সম্মানকে নোংরা করে ফেলেছে। এযে আমার কী দুঃখ সে শুধু আমি

জানি। বিশ্বাস কর মন্দোদরী, সীতার সুরক্ষার জন্য তাকে আমার ঘরে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যে তা হলো না। উল্টে তাকে ও আমাকে নিয়ে অনেক নোংরা কথা বলছে রামচন্দ্রের লোকেরা। নকল সীতা বলেই গায়ে মেখেছি। একে যদি ভুল বল, আমি ভুল করছি । কিন্তু সচেতনভাবে কোন ভুল করিনি। পাপ, অন্যায়, অধর্ম সীতার সঙ্গে করেনি। আমি তা পারি না করতে। আমি পাথর দানব নই। রক্ত মাংসের মানুষ। স্নেহ, প্রেম মমতা, ভালোবাসার কাঙাল। শুধু সীতার প্রতি মমতায় আমি রামচন্দ্রের দন্ডকারণ্য বিহারের উপর কোন বাধা সৃষ্টি করিনি। আমি চাইলেই তাকে বন্দী করতে পারতাম। ত্রিভুবনজয়ী রাবণের কাছে ভিখারি রামচন্দ্র নস্য মাত্র। তাকে ভয় পেয়ে সরে থাকেনি। যুদ্ধ করতে গেলে পাছে মাথায় খুন চেপে যায়, রামের কিছু হয়ে যায়, তাহলে সীতা বাঁচবে না। শুধু ঐ মেয়েটার কথা ভেবেই আমি রামের সব স্পর্ধাকে ক্ষমা করেছি। তার সব দৌরাত্ম্য, ষড়যন্ত্রকে মেনে নিয়েছি। কাপুরুষতার অভিযোগ নীরবে হজম করেছি।

মন্দোদরী অবাক বিস্ময়ে বলল : তোমার কথা কেমন হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে। উত্তর ভারত বিদ্বেষী লঙ্কেশের মুখে এ কোন দুর্বলতার কথা শুনলাম ? শত্রুর প্রতি তোমার এত উদারতার কারণ কী ?

জানি না। ও প্রশ্ন কর না আমাকে। রাম অযোধ্যা থেকে যেদিন স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাওয়া স্থির করল সেদিন থেকে সীতাকে নিয়ে এক রাজনীতি সুরু হয়েছে। সীতার প্রতি তার একটু প্রেম, ভালোবাসা থাকলে এভাবে রাজনীতির ঘোলা আবর্তের মধ্যে তাকে টেনে আনত না। সীতাকে রাম কোনদিন ভালবাসেনি। ভালোবাসার খেলা করেছে। আর মেয়েটা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে রামকে ভালোবেসে গেছে। কী পেল তার হিসেব করেনি। শূর্পনখার সঙ্গে মাখামাখি করে সীতার মনে শুধু রাম ব্যথা দিল। ভ্রাতার ব্যভিচারকে লক্ষ্মণ সহ্য করতে পারেনি। ভাইয়ের ওপর রাগ করেই শূর্পনখাকে অপমান করল। কার্য কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল রাম। লক্ষ্মণ শুধু নিমিত্ত।

মন্দোদরী বলল : অদ্ভুত তোমার যুক্তি। আমার সব ধারণা তুমি গোলমাল করে দিলে। লক্ষ্মণের জঘন্য নারী নির্যাতনের নিন্দার কোন ভাষা নেই। বর্বর মানুষও নারীকে অমন করে বিকৃত করে না। তবু, তার অপরাধকে লঘু করে দেখছ। লোকচক্ষে তাকে ঘৃণার পাত্র করে তোলার পরিবর্তে ক্ষমা করছ।

রাবণ অন্যদিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল : মন্দোদরী, সীতার সত্যি করে বন্ধু বলে যদি কেউ থাকে সে লক্ষ্মণ। শুধু লক্ষ্মণের জন্য সীতা মেয়েটা এ যাত্রায় রেহাই পেল। তাই লক্ষ্মণের উপর আমার কোনো আক্রোশ নেই। রামকে শায়েস্তা করার আগে মেয়েটাকে কাছে এনে রাখলাম। কিন্তু যাকে মেয়ে বলে ঘরে আনলাম, সে অন্য এক মেয়ে। চতুর রাম আমার মনের কথাটা টের পেয়ে হতাশ

করেছে। মেয়েটাকে ফিরে না পাওয়ার দুঃখটা কী মর্মান্তিক তা তোমাকে বলে বোঝানোর নয়।

বিস্ময়ে মন্দোদরীর দুই চোখ নিবিড় বিহ্বলতা নামল। রাবণের প্রতিটি কথা তার মন ছুঁয়ে গেল। রাবণের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রাখল। মুখটা তার মুখের সামনে মেলে ধরল। চাপা বিস্ময়ে বলল : স্বামী! তোমার গলার স্বরে মমতার বারি ঝরে পড়ছে। দু'চোখের পাতা ভিজে। বুকে কান পাতলে হৃদয়ের কল্লোল শোনা যায়। কী হলো তোমার? সীতা না বলে, তাকে মেয়ে মেয়ে করছ কেন? তোমার বুকে তার প্রতি এত মমতা কেন?

রাবণের কথা আটকে যায়। কষ্টে ভেতরের আবেগটাকে সংবরণ করল। ধরা গলায় বলল : ওই মেয়ে কে জান? আমাদের প্রথম সন্তান। যাকে তুমি বিসর্জন দিয়েছিলে। আমার সেই হারানো মেয়ে সীতা।

মন্দোদরী অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। উদ্বেগ, দুর্ভাবনায় অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মুখখানা ছাই হয়ে গেল। রাবণের মতো কন্যার দাবিদার হতে না পারার দুঃখ তাকে বিহ্বল করল না। বুকের মধ্যে লুকোনো নিষ্ঠুরতার বোধ হয় কোন দাবিই থাকে না স্নেহ-মমতার। সম্মোহিতের মতো রাবণের বুকে মাথা রাখল। তার সব ব্যথাকে নিঃশেষে শুষে নেবার জন্য। তারপর, দু'হাতে তার মুখ খানা নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে বলল : আমার জন্মপত্রিকায় আছে প্রথম কন্যাসন্তান হবে তার পিতার মৃত্যুর কারণ। তার কুলধ্বংসের কারণ। তাই, মায়া, মমতা শিকড় গেড়ে বসার আগেই হৃদয় থেকে তাকে সমূলে উন্মুল করে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি। ওই মেয়ে যদি সীতা হয়। ও হলো তোমার নিয়তি, তোমার শত্রু। ওর নাম পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারব না। ওই রাক্ষুসীকে যে অগ্নিমুনি তার ঘরে নিয়ে রেখেছেন জেনে স্বস্তি পেলাম। স্বামী, রাম তাকে সরিয়ে দিয়ে তোমার মঙ্গল করেছে। ওর ছায়া পর্যন্ত বিভীষিকা। ওর নাম তুমি আমার কাছে কর না। তোমার বুকেও তার কোন জায়গা দিও না। ও সর্বনাশী, আমার সব সুখ কেড়ে নেওয়ার জন্য এসেছে। তোমার স্বপ্নের সাজানো লঙ্কা ধ্বংস করার জন্য এসেছে। স্বামী, তুমি জেনে বুঝে আগেই রামের সঙ্গে ওকেও নির্মূল করলে না কেন? তোমার একটা ভুলের জন্য কী মূল্য দিতে হবে কে জানে? আমার ভীষণ ভয় করছে। তোমার কথা ভেবে আমার শরীর কাঁপছে। বলতে বলতে তার বুক ভেঙে কান্না নামল। চোখ দুটি জলে ভরে গেল। কথা আটকে গেল। মনে হলো, গলার কাছে কী যেন সব দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল।

কতকাল আগের ঘটনা তবু সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল মন্দোদরী। শূন্যে মহাশূন্য দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসছে রাবণ। কী আশ্চর্য সেই অনুভূতি। রাবণ বিমানে কোথাও নেই তবু মন্দোদরী তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল লঙ্কার প্রাসাদে তার নিজের কক্ষে। রাবণের বুকের উপর মাথা রেখে কী কান্না কাঁদছে

সে। তার সমস্ত অনুভূতির ভেতর, চেতনার ভেতর সেদিনের কান্নাটা ফিরে এসেছিল।

দু'গালে হাত দিয়ে রাবণ তার সমস্ত উদ্বেগের উপর প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছিল যেন। গলায় দরদ ঢেলে বলল: সীতা তোমার কেউ নয় একথা ভাবলে কেমন করে? সে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। বাবা মায়ের কোন কর্তব্য আমরা করেনি; স্বার্থপরের মতো শুধু নিজেদের কথা ভেবে জন্মমুহূর্তে তাকে বিসর্জন দিয়েছি। আমরা সত্যি নির্বোধ ছিলাম। খিল এঁটে ঘরে বসে থাকলে যে নিয়তি কিংবা দৈবকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, এ বোধ ছিল না বলেই তাকে আমরা আমাদের শত্রু করেছি। মন্দোদরী, ভুলটা আমাদের হয়ে গেছে একেবোরে গোড়ায়। সেদিন এ ভুল না করলে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হতো না। তোমার আমার ভুলের রন্ধ্রপথ ধরে নিয়তি প্রবেশ করল আমাদের জীবনে।

স্বামী, মা হয়ে যে সন্তানের মৃত্যু কামনা করলাম, মরে গেছে বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে বেঁচে ফিরল কী করে? তুমিও বা জানলে কেমন করে; সীতা আমাদের সেই মেয়ে।

মহিষী; মায়া-মমতায় অসহায় শিশু সন্তানকে হত্যা করতে পারেনি। তাই, লঙ্কা থেকে অনেক দূরে সাগর-নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে মিথিলার এক চাষীর গৃহের কাছে রেখে এসেছিলাম। স্বয়ম্বরে সীতাকে প্রথম দেখলাম। বুকটা ভরে গেল এক আশ্চর্য বাৎসল্যভাবে। মনে হলো, এ মেয়ের সঙ্গে আমার অনেক কালের সম্পর্ক। আমার রক্তের কলধ্বনিতে তার প্রাণপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যেন। আর আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। সহসা বিশ্বামিত্রের কণ্ঠস্বরে আমার ভেতরটা চমকে উঠল। ঋষি স্বয়ম্বর সভায় কন্যার কুল-পরিচয় বর্ণনা করছেন: এ কন্যা অযোনিসম্ভবা। মা বসুন্ধরা এক গরিব চাষীকে এই কন্যারত্ন দান করেন। পাছে দেবকন্যার লালন পালনে ত্রুটি হয় তাই ঐ চাষী মহারাজ সীরধ্বজ জনককে অর্পণ করে। সীতা মহারাজের পালিতা কন্যা। হরধনু ভঙ্গ করতে যিনি সমর্থ হবেন, সীতা তাঁরই ভার্যা হবে। ঘোষণা শোনা মাত্র আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বুকে স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। সেই সঙ্গে এক দুরন্ত ভয় আমাকে গ্রাস করল। সকলের নজর এড়িয়ে সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আশ্চর্য, সর্বনাশের ভয়ে যে কন্যাকে ত্যাগ করলাম সেই কন্যাই নিয়তির রূপ ধরে আমাকে তার দিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করতে লাগল।

বিবর্ণ ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল মন্দোদরীর। অসহায়ের মতো শুকনো গলায় উচ্চারণ করল: স্বামী!

মহিষী, সীতাকে ভয় করে কোন লাভ নেই। হতভাগিনীকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার জন্য শূর্পনখার ওখানে যাওয়ার নাম করে দণ্ডকারণ্যে ছুটে গেছি। দূর থেকে ভালো করে দেখাও যায় না, তবু বুকটা এক আশ্চর্য সুখে, আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতাম, যাকে আদর করতে পারিনি কোনদিন আজ যদি সে দৌড়ে

বাবা বলে বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত তা-হলে কেমন লাগত?

মন্দোদরী কথা বলতে পারল না। তারও দু'চোখ ভরে জল নামল।

হঠাৎ তাকে চোখ মুছতে দেখে বিভীষণ প্রশ্ন করল : তুমি কাঁদছ মন্দোদরী!

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিয়ে বলল : কাঁদব কেন? মেয়েমানুষের মন তো, একটুতে চোখে জল আসে।

একটা কারণ তো থাকে তার।

কেন জানি না, শিবহীন দক্ষযজ্ঞের মতো একটা অশুভ চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সীতাহীন অশ্বমেধ যজ্ঞেও অনুরূপ কোন অনাসৃষ্টি হবে না'তো।

শাস্ত্রকাররা পরামর্শ দিয়েছেন, সীতার শূন্যস্থানে স্বর্ণসীতা রাখলে যজ্ঞকার্যে কোন বিঘ্ন হবে না। আমাদের সোনার লঙ্কার একশ'জন দক্ষ শিল্পী ঐ স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করেছে। লঙ্কাবাসীর সশ্রদ্ধ উপহারস্বরূপ তা পাঠানো হয়েছে।

মন্দোদরীর ভেতরটা হঠাৎ ভীষণ খুশি হয়ে উঠল। অভিভূত গলায় বলল : একটা কাজের মতো কাজ করেছ। কিন্তু জীবিত সীতার জায়গায় স্বর্ণ সীতা রাখা হচ্ছে কেন? শ্রীরামের এই নাটক করার কী দরকার ছিল। নিজের সঙ্গে তাঁর এ ছলনা কেন? এসব ভড়ং করে লাভ কী?

তুমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন? শ্রীরাম সম্পর্কে তোমার এই অদ্ভুত অভিযোগের কোন মানে হয় না।

আর সকলকে ফাঁকি দিলেও, নিজে তো তিনি ভালো করেই জানেন, সীতাকে কখনো ভালোবাসেননি। শ্রীরামের বুকে তার জন্য একটু প্রেম মমতা ছিল না। সারজীবন লোক দেখানো অভিনয় করেছেন। নিজের স্বার্থের জন্য সীতাকে তাঁর দরকার হয়েছিল। স্বার্থ-সিদ্ধি হওয়ার পর সীতাকে পদে পদে অপমান, অসম্মান করেছেন। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার নাটক করে তার নারীত্বকে উপহাস করেছে। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় তার সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। বেইজ্জত করার এক নতুন নাটক তৈরি হলো। প্রজাদের মনোরঞ্জনের নাম করে গর্ভবতী সীতাকে নির্জন অরণ্যে একাকী নির্বাসিত করলেন। রামের বুকে সীতার জন্য প্রেম, মমতা ভালোবাসা থাকলে কখনো এভাবে তাকে শাস্তি দিতে পারতেন না। সীতা সম্পর্কে শ্রীরাম শুধু উদাসীন নন, কোন মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য পর্যন্ত করেননি। অরণ্যে তার নিরাপত্তা সুরক্ষার যেমন ব্যবস্থা ছিল না, তেমনি সে জীবিত কী, মৃত, কিংবা কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কেমন আছে, তার সন্তান হয়েছে, কী হয়নি এই খোঁজটুকু পর্যন্ত করেননি। স্বামীর কর্তব্য, পিতার দায়িত্ব কিছুই শ্রীরাম করেননি। সীতা শুধু শ্রীরামের অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষাই পেয়েছে। ভালোবাসা, আদর যত্ন পাইনি।

কথাটা শুনে বিভীষণ যেন কেমন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করল। শ্রীরামের উপর তোমার অনেক রাগ, বিদ্বেষ জমে আছে ঠিক, কিন্তু কার

কোথায় দোষ, আর দোষ নয়, আমার তার সমালোচনা করার কে?

তোমার সঙ্গে তর্ক করার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। সীতা রামের কোনো ক্ষতি করেনি তবু রাম তাকে এত দুঃখ কষ্ট দিল কেন? রামের জন্য সীতা কত ত্যাগ করল কিন্তু রাম তার কী মূল্য দিল? এই প্রশ্ন নিজেকে কখনো করেছ দেবর? সীতা যদি কারো ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে সে হয়েছে আমার। সে আমার শত্রু। তবু, তার প্রতি এক অসীম মমতা অনুভব করি। রাবণের মৃত্যুতেও রামের রাবণ বিদ্বেষ একটুও কমেনি। বরং তীব্র হয়েছে। তার বিষ ছোবলে সীতার শরীর মন নীল হয়ে গেছে। রাবণের উপর ক্রোধ মেটাতেই আসন্ন প্রসবা সীতাকে শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে একা ছেড়ে দিতে রামের একটু কষ্ট হয়নি। কেন জান দেবর? রাবণের মেয়ে বলেই সীতার উপর রামের এত আক্রোশ। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলল।

বিস্ময়ে বিভীষণের দুই চোখ বিস্ফরিত হলো। গায়ের লোম সোজা হয়ে উঠল। সমস্ত জিনিসটার পেছনে কেমন যেন একটা রহস্য মেশানো আছে। অবাক চোখে মন্দোদরীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মন্দোদদীর মুখেও একটা চাপা উত্তেজনা ভেতরের অশান্ত অস্থিরতাকে চাপা দেবার জন্য ফিক করে হাসল। বলল: অবাক হয়ে গেলে তো? সীতা হলো শ্রীরামের কাছে রাবণের বীজ, তার ছায়া। তাই তার সম্পর্কে রামের কোনো কৌতূহল নেই। রাম তার মৃত্যু চায়। বাস্তবে সে মৃত হোক বা না হোক, স্বর্ণসীতা প্রতিষ্ঠা করে শ্রীরাম প্রমাণ করছে সীতা মৃত। মৃতরা আর ফেরে না। এর পরেও সন্তানের হাত ধরে যদি সীতা ফেরে কোনদিন তাহলে প্রেতাত্মা বলে ভূতের ওঝা দিয়ে পিটিয়ে মারবে তাকে।

বিভীষণের মস্তিষ্কে তখন নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসার ঝড়। সেই সময় বজ্রপাতের মতো একটা শব্দ করে আকাশে আলো ঝলকে উঠল। বিমানটা নিচের দিকে সবেগে মাটি ছোঁয়ার জন্য ধেয়ে এল। ধুলো ঝড়ে সব ঢাকা পড়ে গেল। পাছে মন্দোদরী পড়ে যায় এই ভেবে বিভীষণ মন্দোদরীকে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে বুকের খুব কাছে টেনে নিল। বিভীযণ অনুভব করল মন্দোদরীর সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে তার বাহুবেষ্টনে। এক আশ্চর্য ভালো লাগার অনুভূতি হয় বিভীষণের। অন্ধ শাবকের মুখ যেমন করে মাতৃস্তন স্পর্শ করে তেমনি ভাবে বিভীষণের ঠোঁট ঐ সময়টুকুতেই মন্দোদরীর ঠোঁটের খুব কাছে থর থর করে কাঁপে। মুহূর্তের দুর্বলতায় নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারে না। আলতো করে চুমু দেয় ধুলোঝড়ের মধ্যে।

মন্দোদরী রাগে ঘৃণায় তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। বিভীষণের আত্মসম্মানে লাগল। কিন্তু শরীর দিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নেওয়ার জন্য অনুশোচনা হলো তার। একটা তীব্র অপারাধবোধ তার গলাটা ধরে গেল। বলল: তুমি আমার

ওপর রাগ করেছ না?

মন্দোদরী কোন উত্তর করল না। ধুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জোর পায়ে হাঁটতে লাগল। বিভীষণ ও তার পাশে পাশে হাঁটে গভীর এক অপরাধবোধে।

সীতাকে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে মন্দোদরী অযোধ্যায় এসেছিল। একদিন যে সন্তানকে বিসর্জন দিতে একটুও কষ্ট হয়নি আজ তাকে দেখার জন্য বুকে বাৎসল্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বিধাতার এ এক আশ্চর্য কৌতুক। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে কেড়ে নিয়েছেন। দেয়া-নেয়ার হিসেব মিলিয়ে যখন পাওয়ার আর কিছু থাকল না তখন বুকে এ কোন ব্যাকুলতা জাগল? সীতার অভাব, তার জন্য দুঃখ বোধ, ব্যাকুলতা সবাই পুরোপুরি অন্যরকম। এটা মন থেকে তৈরি করা কোনো কৃত্রিম ভালোবাসা কি না জানা নেই তার। থাকার কথাও নয়। কারণ আগের অনুভূতিটাই কীরকম তাই জানে না। পুরনো উপলব্ধি বা মানসিকতা থাকবে কোথা থেকে? গর্ভে ধারণ করলে কি, মা হাওয়া যায়? মায়ের কোন কর্তব্যই করেনি। গর্ভধারিণী বলেই যে সীতার ক্ষমা ভালোবাসা পাবে তা আদৌ মনে হয় না মন্দোদরীর। সমস্ত সম্পর্কের উষ্ণতা ভালোবাসার ক্ষমতার প্রদীপ জ্বেলে পেতে হয়।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা প্রত্যাশা নিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যাশা সব সময়ে সুখের হয় তা নয়, তবু প্রত্যাশার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। পুরনোকে সে নতুন করে। করুক বা নাই করুক একটু নাড়াচাড়া তো হবে তাতে। পাওয়া তো অনেক হয়েছে। কিছু না করে যে পাওয়া হলো অন্তরের ভেতর অন্যের অনবধানে তার প্রকৃত মূল্য এককূল থেকে অন্যকূলে এসে মন্দোদরী নতুন করে অনুভব করে তাকে। অযোধ্যার অতিথিশালায় নিরিবিলি বসে একা একা সে সব কথা মনে করতে ভালো লাগে। বুকের কোথায় যেন একটা ব্যথা চিনচিন করে। নিজের স্বার্থ, সুখ, মঙ্গল, কল্যাণ এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে একদিন যাকে বিসর্জন দিয়ে কুল রক্ষা এবং নগর ধ্বংস এড়ানো যাবে ভেবেছিল, কার্যত হয়নি তা। দৈবকে এড়ানো বোধ হয় যায় না। দৈবই সীতকে জন্ম দুঃখিনী করেছে, রাজ রানী হয়েও রানীর মর্যাদা পেল না সে। রাজপ্রাসাদে স্থান হলো না। জীবনের বেশির ভাগটা কাটল বনবাসে।

জীবনে অনেক কিছু ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা থাকে না। যা গত হয়ে গেছে তাকে নিয়ে অনুশোচনা করে দুঃখ পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় না। তাদের দু'জনের ভোগ করা দুঃখের কাছে নতুন করে দুঃখ পাওয়ার আর কিছু আছে? নিজেই নিরুচ্চারে বলে, না। তবু প্রত্যেকেরই এমন এমন সম্পর্ক থাকে যেখানে তারা সারাজীবন কিছু না পেয়েই ধন্য হয়। মন্দোদরীর কাছে সীতাও তেমনি। সীতা নামটার ভেতর কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মন্দোদরীর আরো মনে হলো সীতার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের

সঙ্গে উষ্ণ রক্তের সব ঘ্রাণ মিশে আছে। সেজন্যই বোধ হয় তার কথা মনে হলে বুকের ভেতর অপত্য স্নেহের এক রূপকথার জগৎ তৈরি হয়ে যায়। সেই রহস্যময় অভিনব অনুভূতির ভেতর ডুবে গিয়ে সীতাকে নতুন করে পায় তার অনুভবের মধ্যে। একটা অন্য শিরশিরানি হয় সেই মুহূর্তে।

চড়া পড়া নদীর গতি যখন হারিয়ে যায় তখন শীর্ণ শান্ত স্রোতহীন জীবনের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিশাল আকাশখানা বুকে করে যেমন নিবিড় সুখে মগ্ন থাকে, মন্দোদরী সীতার ভাবনায় তেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

হৃদয় গুহার অভ্যন্তরে মন্দোদরী হঠাৎ বাৎসল্যের কলধ্বনি শুনতে পায়। কল্পনায় দেখে সীতাকে অপত্যস্নেহে জড়িয়ে ধরেছে বুকের মাঝখানে। পাথরে আটকে পড়া দীর্ঘকালের অবরুদ্ধ মাতৃস্নেহের নির্ঝর সব বাধা ঠেলে শতধারায় উৎসারিত হয়ে মন্দোদরীর বুক প্লাবিত করে গেল। ফুলের গর্ভে ছড়িয়ে থাকা পরাগের মতো কিংবা ফলের বুকে ঘুমিয়ে থাকা বীজের মতো সুপ্ততা থেকে জেগে উঠে প্রাণের হিল্লোলে। যেখানে পল্লবিত হয় কত নতুন সব কচিপাতা রঙা সীতা। এক পরম তৃপ্তিতে মন্দোদরীর দু'চোখের পাতা বুজে আসে। সেই পরমক্ষণে তার মনে হলো সীতাকে বুকে করে চিরন্তনী মাতৃস্নেহের মর্মর মূর্তি হয়ে ঘরে ঘরে শোভিত হচ্ছে যেন।

অযোধ্যায় তার কোন কাজ নেই। এখানে সীতার কথাটা তাই বেশি মনে হয়। সর্বক্ষণই তাকে ঘিরে কত কথা ও স্মৃতির মালা গাঁথে। একটু রূপকথার আদলে তাকে মুড়ে নিলে কত চমৎকার হয়ে উঠতে পারে একটা মানুষের জীবন। মানুষের জীবনটা যদি এরকম রূপকথার পৃথিবী হয়ে উঠত, এমন স্বপ্নময়, নীলাভ আলোর দ্যুতির মতো হতো তা হলে কী ভালোই না লাগতো! মানুষের পৃথিবীটা সুন্দর হতো।

আশ্চর্যের কথা, মানুষ বড় অবুঝ। কোনো মানুষই বোঝে না এ পৃথিবীতে কেউ কারো বোঝা বয় না। যার বোঝা তাকেই বইতে হয়। যে হাসিমুখে তার নিজের বোঝা বইতে পারে সে জেতে। ভগবান তার বোঝা নিজের হাতে তখন হাল্কা করে দেন। তিনি সব দেখতে পান। তাঁর চোখে কিছুই এড়ায় না। মন্দোদরী বিশ্বাস করে, ভগবান একটা কিছু করার জন্য তাকে অযোধ্যায় এনেছে। আর এখানে আসা থেকেই সীতার চিন্তায় বিভোর। সীতা তার জীবনে আর বোঝা নয়। বোঝা যে টুকু ছিল মনে সেটুকু একদিনে হালকা হয়ে গেছে। সে এখন ভারমুক্ত। মনের কোণে মেঘ জমে নেই আর। নির্মল আকাশ সূর্যকে বুকে করে হাসছে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে কেমন অদ্ভুত মায়াবী হয়ে উঠে সমস্ত পৃথিবীটা। এক অপরিসীম শুদ্ধতায় গাছ-পালা, নদী-নালা, ফুল-ফল, মানুষের মন ও শরীর জুড়ে কী এক অপরিসীম শুদ্ধতার পরশ মাখানো থাকে। তারপর পুবের আকাশে লাল রঙের এবং ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য উল্লাস হয়।

অযোধ্যায় আসা থেকে প্রতিদিনই মনে হয় ঐ বুঝি রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে লব-কুশের

সঙ্গে ফিরল। পুত্রদের হাতে বন্দী বাজী উদ্ধার করতে রামচন্দ্র স্বয়ং বাল্মীকি আশ্রমে গেছে যখন, একটা কিছু ঘটবেই। হাজার হোক সীতা তো মেয়ে। বড় নরম মনের মেয়ে। রামচন্দ্র একটু ভুল স্বীকার করলেই স্বামীর উপর সব রাগ অভিমান ত্যাগ করে তাকে ক্ষমা করে দেবে। তখন লবকুশের সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞে ফিরতে তার কোনো বাধা থাকবে না। ভরা সংসারের মঙ্গলঘট মাথায় নিয়ে অযোধ্যার কুললক্ষ্মী তার নিজের কুলায় ফিরবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে মন্দোদরী তার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আর একদিন বাকি। যে কোনো মুহূর্তে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। মন্দোদরী তারই প্রতীক্ষা করছিল।

মাথার উপর ধবধবে সূর্য জ্বল জ্বল করছে। প্রখর তাপে আগুনের হলকা। বাগানের মালি রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে গলদঘর্ম হয়ে জমিতে নিড়েন দিচ্ছে। ঘামে ভেজা পেটানো শরীর রোদের আলোয় চকচক করছে। মাঝে মাঝে নিড়েন ফেলে একটু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। তারপর একটু পরেই নিজের জায়গায় ফিরে এসে নিড়েন নিয়ে একা একা কাজে বসে।

দূরে লোকের কোলোহল শোনা গেল। মন্দোদরী চমকাল। সমস্ত মনটা বাইরের কড়া রোদের মতোই চনমন করে উঠল। তা-হলে, সীতা সত্যিই ফিরল! অমনি তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষা হাজার হাজার পাখা মেলে দিয়ে একঝাঁক পায়রার মতো উড়ে গেল যেদিক থেকে কোলাহল আসছে সেদিকে। মন্দোদরী কল্পনায় দেখছিল, রথে রামচন্দ্রের গা ঘেঁসে বসে আছে সীতা। মুখে তার স্নিগ্ধ ক্ষমাসুন্দর হাসি। অপাপবিদ্ধ দুচোখের চাহনিতে কী অপার করুণা! ভীষণ সুন্দর লাগছে সীতাকে। মনে হচ্ছিল, স্বর্গের দেবী নেমে এসেছে যেন মর্তধামে। দু'পাশে তাদের লব কুশ। সেতুর দু'পাড়ের শক্ত দুটি স্তম্ভের মতো বসে আছে। রামচন্দ্রের দুই চোখও প্রেমে নিবিড় হলো। অধরে টেপা হাসি। দৃষ্টিতে প্রসন্ন কৌতুক। লব কুশও সকৌতুকে পিতামাতার দিকে তাকিয়ে মিলনের মজা উপভোগ করছে।

পুত্রদের চোখে চোখ পড়তে হেসে ফেলল সীতা। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল। সব মেয়েরাই খুব লাজুক হয় ভেতরে ভেতরে। লজ্জা পাওয়ার কোন বয়স নেই। তবু কিছু কিছু ব্যাপার থাকে মেয়েদের লুকোবার। লুকোচুরির খেলায় ধরা পড়ে গেলে খেলার মজা থাকে না বলেই হয়তো, তাকে গোপন করে। মজাটাকে নবীকৃত এবং রহস্যময় করার ক্ষমতা শুধু মেয়েদেরই থাকে। সীতার লাজুক অপ্রতিভতা তেমনি জীবনের শিকড় অবধি পৌঁছয়। সলজ্জ কুণ্ঠিত প্রকাশে তা অর্থবহ হয়ে উঠল। ইংগিতেই রামচন্দ্রকে বলল যেন, জোর করে জীবনে লজ্জা পাওয়া যায়, গ্লানি পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো আনন্দ এবং কোন সুখ জোর করে পাওয়া যায় কি? দোষটা পুরোপুরি রামেরই। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। স্বার্থের প্রয়োজনে তাকে গভীর করে চিনেছে। তাই তো সীতার দুচোখের ভাষায় অনুকম্পার প্রার্থনা নেই, সমবেদনা

চাওয়ার কোনো চেষ্টা নেই, মুখ ভরা হাসি সব সময়। নিজেকে সে ছোট করলেও করতে পারে তা বলে রামচন্দ্রকে ছোট করবে কী করে? সব দোষ রামের তবু তাকে শত্রু বলে ভাবতে পারল না।

আরামে, তৃপ্তিতে মন্দোদরীর দু'চোখ বুজে এল। মনে হলো, ঈশ্বর রামের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাকে দিয়েই করেছে। সীতা কোনো ভুল করেনি, তাই জয় হলো তার। লব কুশ প্রসন্ন চোখ মেলে পিতা-মাতার নীরব তন্ময়তাকে দেখছে। আনন্দে, খুশিতে দু-ভায়ের চোখের পাতা কাঁপছে, মুহুর্মুহু তাদের মুখের ভাব পাল্টে যাচ্ছে।

হুড়মুড় করে রথটা প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। কল্পনায় দেখল, মন্দোদরী দৌড়ে যাচ্ছে। তার শরীর হাল্কা হয়ে গেছে, সে হাঁটছিল না। বাতাসে গা ভাসিয়ে । উড়ে যাচ্ছিল। বিস্রস্ত কেশভার, ডানার মতো হয়ে গেছে আর সে ডানা ঝাপ্টিয়ে যাচ্ছে।

সীতা অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চোখে ঘৃণা নয়, বিতৃষ্ণা নয়, রাগ অভিমান কিছু নেই। আছে শুধু জিজ্ঞাসা, জানার ইচ্ছে। মন্দোদরী থমকে দাঁড়াল না। বিহ্বল হলেই বিপদ। মন্দোদরী কথা না বলে হাত ধরে রথ থেকে তাকে নামাল। হাতের ছোঁয়ায় বুকের ভেতর কী যেন সব গলে গলে পড়তে লাগল। শূন্য বুকের মাঝখানে তাকে নিবিড় আবেগে পরম মমতায় চেপে ধরল। সারা শরীরে মন্দোদরীর গান গেয়ে উঠল। তার নরম মধুর স্পর্শে বুকখানা ভরে যেতে লাগল। বুকের গভীরে যে এত স্নেহ মমতা জমে ছিল তা জানা ছিল না মন্দোদরীর নিজেরই। হিমবাহ গলে যেতে লাগল দ্রুত, উষ্ণ মধুর পরশে। ভালো লাগায়, ভরন্ত কলসের মতো ভরে উঠতে লাগল মন্দোদরী। সীতাও রুক্ষ, শুষ্ক বুক দিয়ে শুষে নিতে লাগল জননীর স্নেহ-মমতা কোমলতার সমস্ত স্নিগ্ধ, সিক্ততা। সীতা কাঁদছিল। মন্দোদরীও কাঁদল তার সঙ্গে। লবকুশ অবাক। ছেলে মানুষের মতো হাপুস হুপুস নয়নে মাকে কাঁদতে দেখে তারা মজা পেল খুব। আনন্দে হাততালি দিল দু'ভাই একসঙ্গে। তাতেই সীতা ও মন্দোদরী চমকাল। বিচ্ছিন্ন হলো। লজ্জায় রাঙা হলো দুজন।

রামচন্দ্র মন্দোদরীর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বেজার মুখে বলল : অবশেষে মা মেয়ে মিলে গেল ; আমের আটির মতো আমি এখন গড়াগড়ি যাচ্ছি।

মন্দোদরী ভেজা চোখে হাসি ঝলকে উঠল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগ গাঢ় স্বরে বলল : মায়ের কাছে সন্তান কোনকালে ফেলনা হয় না। তবু মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা সব ওলোট পালোট করে দিয়ে জীবনের ভিত ভেঙে তছনছ করে দেয়। টুকরোগুলো জড়ো করে জোড়া দেয়া যায় কিন্তু ভাঙার দাগটা মিলিয়ে যায় না। সেই দাগটা জোড়া সম্পর্কের মধ্যবর্তী হয়ে সর্বক্ষণ পীড়া দেয়। বেঁচে থাকার জন্য, নিজের সুখ ও শান্তির জন্য ঐ দাগের কথাটা মনে রেখে কিংবা মধুর, পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনে তাকে নষ্ট করে দিও না। সত্যিই ঐ দাগগুলোর ভেতর কিছু নেই। সুন্দর সম্পর্কের ভেতর ঐ দাগগুলো নাগাল পায় না হাত বাড়িয়েও। বরং এই নতুন

সুখ, আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথায় ও দুঃখে ক্লিষ্ট মন অনুতাপের পায়ে উপুড় হয়ে কাঁদে ফুলে ফুলে। এমনই হয় জীবন ভোর। এটাই বাস্তব। আমরা কেউ ভগবান নই। মানুষ। বড় সাধারণ, বড় অসহায় এবং ভঙ্গুর। আমরা কাঙালের মতো শুধু শান্তি চাই।

রামচন্দ্র কথা বলতে পারে না। মন্দোদরীর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কী যেন হয়ে গেল তার। শান্ত, মন-খারাপ করা আর্তি বুকে নিয়ে হঠাৎই মাথা হেঁট করে মন্দোদরীর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

পিছন থেকে বিভীষণ ডাকল : মন্দোদরী!

সে ডাক শুনে মন্দোদরী চমকাল। কল্পনার মায়া আয়না থেকে যন্ত্রণাবিদ্ধ দু'চোখ মেলে ধরল বিভীষণের চোখের উপর। বুকের ভেতরটা তার ঝড়ের মুখে বিপন্ন কচিপাতার মতো ভয়ে কাঁপছিল থির থির করে।

বিভীষণ তার ভেজা উৎকণ্ঠিত দু'চোখের তারার দিকে কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : তুমি কাঁদছ?

আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল : রামচন্দ্র ফিরেছেন কি?

বিভীষণ ঘাড় নেড়ে বলল : দু'পুত্রের সঙ্গে ফিরেছেন। সীতা স্বেচ্ছায় পাতালে যাওয়া মনস্থির করেছে।

জানতাম, সীতা ফিরবে না। কোন মুখে ফিরবে? এরাজ্যে ফেরার মুখ রামচন্দ্র রাখেনি তার। ফেরা মানেই তো আবার নতুন কোন অপমানের শিকার হওয়া। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো নারী যেচে নিজের অপমান ডেকে আনে না। অপমানিত হওয়ার মতো কাজ করে না। সীতা তার প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছে যে, অযোধ্যার বেসামাল রাজনীতি সামলাতে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করছে। সেখানে সীতা ফিরলে, শত্রুদের বিরোধিতা এবং বিবিধ মূল সমস্যা থেকে জনতার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ার জন্য তাকে আবার কোনো কঠিন পরীক্ষার ভেতর টেনে এনে বেইজ্জত করতে পারে। তাই পাতালে সরমার সঙ্গে থাকার উচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

এ তোমার অনুমান। মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করল বিভীষণ।

কী জানি? তবে রাচন্দ্র এবং সীতা যে দু'জন দুমেরুর মানুষ এ আমি জানি। তাদের আর বনিবনা হবে না।

একদিন তো হয়েছিল।

সীতার প্রেরণায় একদিন রামচন্দ্র কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার দিকে মন দিয়েছিল। নতুন নতুন চাষযোগ্য জমি যেমন খুঁজে বার করতে লাগল, অনাবাদী জমিকেও তেমনি আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করল। দেশে দেশে সবুজে বিপ্লবের ফল ভালো হলো। দেশ কৃষিতে শুধু স্বনির্ভরশীল হলো তা নয়, সমৃদ্ধশালীও হলো দ্রুত। সমৃদ্ধির পর্ব ধরে এল নাগরিক জীবনের জাঁকজমক, চাকচিক্য আড়ম্বর, উত্তেজনার

প্রতি মোহ ও আকর্ষণ। ফলে শ্রেষ্ঠী, বণিক, ব্যবসায়ীদের হাতে নগর হয়ে উঠল শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র। আমোদ-প্রমোদের স্বপ্নের নগর। নিজের অগোচরে রামচন্দ্রও কৃষির আকর্ষণ থেকে সরে এল নগরের সভ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন, মার্জিত রুচির মানুষের দিকে। নগর সম্প্রসারণের ফলে চাষের জমির পরিমাণ কমল। উৎসাহের অভাবে চাষযোগ্য জমির এলাকা বাড়ানোর উপর ছেদ পড়ল। মানুষও রুজি-রোজগারের আশায় কৃষিকাজ ছেড়ে শহরমুখী হলো। নগর গ্রামকে দানবের মতো গিলতে লাগল। গ্রামীণ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভাঙন ধরল। সামাজিক, পারিবারিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে যেতে লাগল। সীতা এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি। রামের সঙ্গে সংঘাতের সেই সূত্রপাত। রামচন্দ্রের নগরমুখীনতা পাছে অরণ্যবাসীর শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনের অন্তরায় হয়, আরণ্যক সভ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই রামের কোনো নিষেধ না শুনে সীতা তার বনবাসের সঙ্গিনী হলো।

তাই নাকি? বিভীষণের প্রবল ব্যঙ্গ।

ভুরু কুঁচকে গেল মন্দোদরীর কয়েকমুহূর্তের জন্য গম্ভীরে হয়ে যায়। দুচোখের চাহনি বাঁকা তরোয়ালের মতো দেখায়। অসহিষ্ণু গলায় বলল : তুমি জান না? মানুষ সীতার চেয়ে স্বর্ণ-সীতা রামের বেশি প্রিয়। প্রাণহীন স্বর্ণ-সীতা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে সে একেবারেই বেমানান। তাই রামচন্দ্রের সঙ্গে ফেরেনি। ফিরবে না আমি জানতাম। আজ স্বর্ণলঙ্কারও সেই অবস্থা। সত্যিই তুমি রামভক্ত বিভীষণ। রামের আশীর্বাদে তুমি অমর হবে। আমিও জানি ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না তোমাকে। বিভীষণরা চিরদিনই আছে এবং থাকবে। তাদের অমরত্ব কেড়ে নেয়ার সাধ্য স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও নেই।

মন্দোদরী তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ?

রামচন্দ্রের আশীর্বাদকে তুমি বিদ্রূপ বলবে?

আমাকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, অপমান করে তুমি কি খুব সুখ পাও?

বিশ্বাস কর, তোমাকে কেউ অপমান করলে আমার কষ্ট হয়। শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসাও ভালোবাসা। মায়া, মমতা, করুণা, সমবেদনা তো থাকে তাতে।

মন্দোদোরী!

ও নামে আমায় ডেকো না তুমি। সম্রাজ্ঞী বলে ডাকবে।

॥ বারো ॥

গণপতি উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে রসাতলের মানুষ। একটা উৎসবই সাড়ম্বরে পালিত হয়। যার যা আছে দিয়ে থুয়ে, খরচ করে নিঃস্ব হয়ে যায়। এজন্য তাদের কোনো খেদ থাকে না অন্তরে। উৎসবের আনন্দটা বড়। অভাব তো সারা জীবন আছে। অন্তত একটা দিন দৈন্য ভুলে আনন্দ নিয়ে মেতে থাকে। সর্বত্র খুশির জোয়ার

বইছে। প্রতি মানুষের ভেতরে কী উৎসাহ, উদ্দীপনা।

গণপতি মূর্তি চলেছে আগে আগে। রথযাত্রার দড়ি ধরে টানছে হাজার হাজার লোক। কত লোক চলেছে মূর্তির পিছনে। চন্দ্রগুপ্তও সেই জনসমুদ্রে মিশে গেল। বিচিত্র ধ্বনি উঠছে বাতাস ভেদ করে। সে জয়ধ্বনি কানে প্রবেশ করে মন্ত্রের মতো অভিভূত করে দিল জনতাকে। তাদের সমস্ত মন টানছে ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। জীবনের অর্থটাই যেন বদলে গেছে। সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি বাইরের কোন বস্তু নয়, তা রয়েছে মানুষের অন্তরের ভেতর। অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ হলে বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হয় কেবল। মানুষের শোভাযাত্রা দেখে চন্দ্রগুপ্তর এই অনুভূতি হলো। সমস্ত প্রাণটাই তার গান গেয়ে উঠল। নিজের মনে উচ্চৈস্বরে স্তোত্রের মতো দৃপ্ত কণ্ঠে পাঠ শুরু করল : হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব-কহি দাও স্বামী, মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব।'' কথার চুম্বক আকর্ষণে কণ্ঠের মূর্ছনায় জনতা মোহাবিষ্ট হলো। স্তোত্রের মতো তারাও পুষ্পাচ্ছাদিত গণপতির দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল। শোভাযাত্রার প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে দৃপ্তস্বরে ঝঙ্কারে বাজতে লাগল।

নারী-পুরুষের ভিড়ের মধ্যে ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক রমণী চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরল। কানের কাছে মুখে এনে বলল : ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাই চল।

চন্দ্রগুপ্তর বেশ একটু অবাক লাগল। ঘোমটার আড়ালে রমণীর অসামান্য মুখশ্রী ভালো করে লক্ষ্য করল। বিষাদ মাখা মুখে একটা অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছে কখন, যা শুধু অনন্ত মমতাময়ী জননীদের থাকে। অনেককাল আগের একটা চেনা মুখ ভেসে উঠল চোখের তারায়। সে মুখ তরণীসেনের জননীর। বিভীষণ পত্নী সরমার।

ভিড়ের ভেতর গা ভাসিয়ে দিয়ে ওরা দু'জন বেরিয়ে এল স্বচ্ছন্দে। মন্দিরের চত্বর খালি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওখানে এসে দাঁড়াল তারা। চন্দ্রগুপ্তর ভিতরে তখন এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখ মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। বলল : মা, তুমি ? রসাতলের নরককুণ্ডে তোমায় মানায় না। তবু তোমার এ ভাবান্তর হল কেন ?

এরকম একটা অদ্ভুত কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় সরমা কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল চন্দ্রগুপ্তের মুখের উপর। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল : আমার সব কথা বুঝিয়ে বলার নয় বাবা। বুঝে নিতে হয়। তরণীসেন নেই। নীলাঞ্জনা নেই। স্বামীর কথা রাখতে তোমার গলায় মালা দিয়েছে। তাকে নিয়ে সেই গেলে, আর একবারটিও হতভাগিনীকে দেখতে এলে না।

সরমার এই আচমকা কথায় সামান্য নাড়া খেয়ে বলল : তুমি আমাকে ভালোবাস তা আমি গভীরভাবে টের পাই। তাই বহুকাল পরে হলেও তোমাকে চিনতে একটুও

কষ্ট হয়নি।

দু'চোখ ভরে জল এল সরমার। বলল : বড় একা হয়ে গেছি। ঘরে ভালো লাগে না। কাকে নিয়ে থাকব ? গর্ব করার মতো আমার কী আছে ? একা থাকলে সুকুমার বৃত্তিগুলো কুরে কুরে খায়।

চন্দ্রগুপ্তর আশ্চর্য লাগল। জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য ! বলল : মা তুমি কাঁদছ ?

কান্না মথিত স্বরে বলল : কাঁদব কেন ? একটুতেই মেয়ে মানুষের চোখে অমন জল আসে। সব মেয়েরা বড় অসহায়। স্বামী, সংসারের কাছে শান্তির জন্য অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করতে হয় বলে অনেক অন্যায় অধর্মকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেনে নিতে হয়। শুধু মানিয়ে নিতে গিয়ে লঙ্কাকে মহাশ্মশান করেছি। অনেক মানুষকে কাঁদিয়েছি। এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাবা।

প্রায়শ্চিত্ত বলছ কেন ?

আমার দোষে যাদের ঘর শূন্য হলো তাদের মধ্যে না থাকলে, তাদের দীর্ঘশ্বাস গায়ে না লাগলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

চন্দ্রগুপ্ত কেমন হয়ে যায়। কথা খুঁজে পায় না। আর্ত মন নিয়ে বলল : মা, তুমি ভীষণ বদলে গেছ।

অদ্ভুত হাসল সরমা। বলল : বাবা জীবনই মানুষকে বদলে দেয়। আমি নিজেও কি কখন ভেবেছি, স্বামী, পুত্র সংসার সব ছেড়ে সব হারাদের মাঝখানে এসে নিজে শান্তি খুঁজব। এখানে থাকলেই বোধ হয় অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে জীবনের মানেটাকে খুঁজে পাই।

মা, তোমার সব কথা কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হয়।

হবেও বা। একদিন স্বামী-সংসারের মধ্যে আমার সব নিজস্বতা হারিয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে সব তো আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। এদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছি। এখানে নতুনে আদর, নতুন ভালোবাসা, নতুন সম্মান। এখানে এসে মনে হলো এটাই আমার সবচেয়ে সম্মান আর নিজের জায়গা। এখানে আমি বিভীষণ পত্নী সরমা নই। এটাই হলো সুখের কথা। আমার আর কোন অভাব নেই, দৈন্য নেই।

মা, এ তোমার আবেগের কথা। অভিমান করে নিজের সঙ্গে নিজে লুকোচুরি খেলছ। মহারাজ বিভীষণ যদি একবার এসে বলেন, তোমায় নিয়ে যাব বলে এসেছি তা-হলে সব অভিমান গলে মিশে যাবে সাগরের জলে। চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তোমার মতো নরম মনের মানুষ মুখের উপর না বলে কিছুতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তোমার সব ঝগড়া নিজের সঙ্গে। মান-অভিমানের যখন কিছু থাকবে না তখন ভালোবাসা ভিক্ষে করতে আসা মানুষটাকেও অশেষ মমতায় ক্ষমা করে নেবে। না বলতে; কষ্টে দুঃখে বুক ভেঙে যাবে। মা, নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি

না খেলে; ফিরে যাও তোমার ঘরে।

সরমা মৃদু একটু হাসল। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল : আমার তরণী বেঁচে থাকলে হয়তো এই প্রশ্ন করত। আজ বলতে বাধা নেই, পিতৃভক্ত তরণীও পিতার পক্ষ নিয়ে দেশত্যাগী হয়নি। যখন বললাম পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমংতপঃ তখন ও কী বলল জান,পিতা-কে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু পিতা বলেই তাঁর সব কাজকে নির্বিচারে মেনে নিতে পারি না। দেশের প্রতি জন্মভূমির প্রতি আমার কিছু করণীয় আছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় জন্মভূমির মাটির পরশ গায়ে মেখে জননীর খুশি ভরা মুখের মধুর স্নেহ চুম্বনের সুখ-স্মৃতি আজও আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ দ্যুতি ছড়াচ্ছে। জননী এবং জন্মভূমি আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়। ওর কথাগুলো আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। এক্‌টা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। কথা বলতে পারছি না। গর্বে আনন্দে আমি অভিভূত। আমাকে নীরব দেখে তরণী আমার দু কাঁধে হাত রেখে বলল : মা হলো মানুষের জীবনের দীপ। চলার পথে তাঁর কল্যাণকামী মনের আলো পড়ে উজ্বল হয়ে উঠে। মা'র চোখ দিয়ে জন্মভূমিকে দেখি, পৃথিবীকে জানি। চন্দ্রগুপ্ত, আমার সব কথা হারিয়ে গেল। একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল। মনে হলো, এ কোন দেবতা স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার জননীত্বের গর্ব, সুখ, আনন্দকে স্বর্গীয় করে দিল? গভীর গাঢ় স্বরে কথাগুলো বলার সময় মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। কৃষ্ণবর্ণ মুখে গৌরবের প্রত্যয় তৃপ্তির মৃদুহাস্য মিলে এমন এক অব্যয় অভিব্যক্তিতে রূপায়িত হয়েছে যা দেখে চন্দ্রগুপ্ত বারবার শিউরে উঠল।

অদ্ভুত। অদ্ভুত। মনে মনে বারবার বলল চন্দ্রগুপ্ত। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না তার। এক পরিপুর্ণ আনন্দে, বেদনায় তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে।

নিজেকে সামলে নিয়ে সরমা বলল : তুমি তার বন্ধু। তার আদর্শের আলো পড়ে তুমিও অনেক বড় হয়ে গেছ ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোয়, দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করার মহান সাহসে বড় হওয়া। লোকের চোখে তুমি সার্থক পুরুষ।

কথাগুলো এমন শান্ত জোর দিয়ে সরমা উচ্চারণ করল; এমন কমনীয় নিরুত্তাপ প্রত্যয়ে-যে, চন্দ্রগুপ্ত রীতিমত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সরমা তাকে চুপ করে থাকতে দেখে পুনরায় বলল : পুত্র, মানুষের কিছু দোষ, ত্রুটি, অন্যায় স্খলন থাকেই। তোমার সেই ছোট্ট দুর্বলতাকে গুজব, কেচ্ছায় যারা বড় করে তুলেছিল, তাদের অপবাদ, কলঙ্কের উপর তোমার দেশপ্রেমের আলো পড়ে সব কালিমা ঢাকা পড়ে গেল। অগৌরবের কালিমায়, জীবন অন্ধকার করতে পারল না। দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা শুধু নয়-ত্যাগে, দুঃখে বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোয়, দেশের জন্য, দুঃখী জনগণের জন্য রাজরোষ তুচ্ছ করার মহান সাহসে

তুমি এত বড় হয়ে গেলে যে দেশ-জননী তোমার সব দোষ, স্খলন ক্ষমা করে কোলে তুলে নিল। অগৌরবের কালিমাময় জীবনকে বিভীষণের মতো অন্ধকারে ঢেকে রাখতে পারল না। দেশমাতৃকার আশীর্বাদে তোমার জীবনের মানচিত্রটাই বদলে গেল। বিভীষণ মহান জন-সঙ্কল্পে যোগদান করেও অগৌরবের কালিমা থেকে মুক্ত হতে পারল কই? অন্ধকার হয়ে রইল তার জীবন। কত স্বার্থবুদ্ধি, কত অন্যায়, দুর্বলের প্রতি কত অবিচার, সবলের প্রতি অক্ষম আনুগত্য, কত লোভ, লালসা, পাপ, কত জঞ্জালে ভরা তার জীবন। দেখে লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। পুত্র তুমি তরণীর মতো সার্থক পুরুষ, সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা, সহযোগিতা, আস্থা, আনুগত্য তোমার সার্থকতার সরঞ্জাম। তোমাকে দেখে আমার গর্ব হয়। আমার মনের কষ্ট, যন্ত্রণা তুমি ঠিক বুঝবে না, বাবা।

চন্দ্রগুপ্তর চোখে চোখ রাখতে পারল না সরমা। বড় গ্লানি বোধ করছিল। দুটো বড় বড় চোখ জলে টলটল করে উঠল।

চন্দ্রগুপ্তের বুকের ভেতর কেমন করে। এই বোবা কষ্টের ভাষা নেই। সরমার অভিযোগ এবং অভিনন্দনে মেশানো কথাগুলো তার সমস্ত স্নায়ুর ভেতর মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো বয়ে যাচ্ছিল। ভীষণ শূন্য লাগে। মনটা ভার বোধ হয়। বিহ্বল হতভম্ব হয়ে সে সরমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। দু'চোখের চাহনিতে যত বিস্ময় তার চেয়ে বেশি তীব্র তীক্ষ্ম সন্দেহ। তবু মনটা আর্ত হয়েছিল। বলল: আমাকে ক্ষমা করে দাও জননী।

সরমার মুখে কোন রাগ, অভিমান ছিল না। গভীর বিষাদ থমথম করছিল। মৃদু হেসে স্খলিত ভেজা গলায় বলল: পাগল ছেলে। তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। মাঝে মাঝে জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন কঠিন প্রশ্নের উত্তর তাকে একা একাই দিতে হয়। এখন আমি সব হারিয়ে, সব ভাসিয়ে তোমাকে পেলাম। আমার স্নেহ কাঙাল শূন্য মনের এক পিঠে আমার তরণী আর এক পিঠে তুমি ও নীলকণ্ঠের দেশের এই মানুষজন। এ কী আমার কম পাওয়া!

চন্দ্রগুপ্তর বুকটা ব্যথিয়ে উঠে, শ্বাস দ্রুত হয়। ভিতরের বাধাটা, সংশয়টা কেটে গেল তার। বলল: মা, আমার সব অবিশ্বাস, সন্দেহ নির্মূল করে দিয়ে তোমাকে নতুন করে চিনলাম। তুমি আমার ধরিত্রী।

সরমা চলে গেলে তরণীসেনের একটা কথা বারংবার মনে হতে লাগল তার। মানুষ এমনই যে, অন্যের ভালোতে তার হৃদয় পোড়ে। মানুষ কারো ভালো সইতে পারে না। তাই রাবণের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠায় এক শ্রেণীর মানুষের বুক জ্বলে যেত। বিত্তবান, ভাগ্যবান, বিশাল মাপের মানুষেরও বুক পোড়ে। সেরকম কোন অনুভূতি ঈর্ষায় বিভীষণের বিপক্ষে যায়নি তো সে? কথার মধ্যে সরমা বিভীষণের প্রসঙ্গ তুলে কী যেন বোঝাতে চাইল। ভিতরকার ক্ষত ও রক্তপাত তাকে স্মরণ করিয়ে

দিল বিষাদের ভেতরেও সরমার এমন একটা সহজ সরল অকপট এবং ধারাল জীব আছে যা অপ্রিয় কথাকে তরোয়ালের মতো ব্যবহার করতে পারে। কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই কিন্তু অনুযোগ : তিরস্কার ঝাঁঝালো।

মনটা যখনই অস্থির হয় তখনই যে কোন জায়গায় বসে একটু ধ্যান করে নেয় চন্দ্রগুপ্ত। রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় পদ্মাসন করে বসল। চোখের দৃষ্টি নাকের ডগায় স্থিরবদ্ধ করে বসে রইল। দুটি চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কেমন শূন্য। যা সাধকের থাকে। আস্তে আস্তে একটা মানসিক স্থিরতা আসে। বুকের পাষাণ-ভার নেমে যায়। নতুন করে আশা ভরসা জাগে। মনটা দৃঢ় হয়। যে মন একটু আগে নানা ঘটনার ওলোট-পালট স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দূরে ; ধ্যানে সমাহিত হয়ে গিয়ে তাকেই অন্তরে ফিরে পেল। জীবনে একটা স্থির প্রত্যয়ভূমি বরাবরই ছিল তার। ওই প্রত্যয়টুকু না থাকলে জীবনের সুখ-দুঃখগুলি, মান-অভিমান অহরহ সহ্য করা যায় না। বিক্ষিপ্ততা থেকে প্রত্যয়ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র উপায় হলো ধ্যান। ধ্যানই চন্দ্রগুপ্তর সাফল্যের মন্ত্র।

ধ্যান ভাঙলে চন্দ্রগুপ্ত প্রথম উপলব্ধি করল, রসাতলের মানুষকে বোঝাতে পেরেছে লঙ্কাবাসীর প্রিয়তম রাজা রাবণ মরেনি। তার চিতা নেভেনি। তার আগুন মানুষের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে। চিরকাল জ্বলতে থাকবে। কারণ রাবণদের মতো, মহান মানুষ ; যে মানুষ শত্রুর স্বার্থে নিজের মৃত্যু যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে, তার মতো ত্যাগী মৃত্যু নেই। রাবণেরা মরে গেলে এ পৃথিবী চলতো না। মানুষের ইতিহাস থেমে যেত। মহান মানুষ পৃথিবীতে কম জন্মে। আগামী প্রজন্মের চিত্তকাশে ধ্রুবতারার মতো তার মহত্ত্ব জ্বলজ্বল করবে। রাবণের জনরথের দড়ি ধরে টান দেবার জন্য, রাবণেরা কালচক্রে ঘুরে ঘুরে আসে। রাবণের বীজ থেকে যায় দু'একজন মানুষের অন্তরে। সেই বীজ থেকে সহস্ররাবণ জন্ম নেয়। সেই রাবণেরই একজন সে। সহস্ররাবণের বংশধর। তার উত্তরপুরুষ। কথাগুলো মনে হতে সারা শরীরে চন্দ্রগুপ্তর শিহরন বয়ে যায়।

কুবেরের সময়ের লঙ্কার ছবি দু'চোখের তারায় জ্বল জ্বল করতে লাগল তার। তখন জন্ম হয়নি। কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার মুখে সেই ভয়াবহ দিনগুলোর অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছে। তার ধমণীতেও লঙ্কার রাজবংশের ধারা বইছে। পারিবারিক ইতিহাসের পাতায় লেখা কাহিনী সে দেখেছে।

বিলাসিতার পঙ্কে ডুবে আছে কুবের। রাজ্যে কোথায় কী হচ্ছে, কীভাবে রাজ্য চলছে, রাজ্য কারা চালাচ্ছে, কিছুই জানতো না কুবের। ফলে, রাজকর্মচারীরা, ধনীরা, বণিকরা সাধারণ দুর্বল মানুগুলোকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে, তাদের নিরন্তর ঠকিয়ে বড় লোক হতে লাগল। জিনিসপপত্তর চড়া দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে লাগল। খেটে খাওয়া মানুষদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে তাদের ক্রীতদাসে

পরিণত করল। একরকম অবাধ লুণ্ঠনে দেশের গরিব মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়তে লাগল। যারা রাজ-কর্মচারী, যাদের হাতে প্রশাসনের ভার তারা সুরা, নারী, অর্থ ছাড়া অন্য কথা চিন্তা করে না। নৈতিকতার কোন মূল্য নেই। দুঃখী, অভাবী, উপোসী, মানুষের মনে চাপা অসন্তোষ ছড়াতে লাগল।

এরকম এক সংকট মুহূর্তে রাবণের আবির্ভাব। কুবেরের শোষণের নাগপাশে বন্দী রিক্ত, নিঃস্ব, হাড় জির জির করা ক্ষুধিত মানুষের পরম বন্ধু সে। একমাত্র আশ্রয়। তারাও রাবণের বল ভরসা। তারাই তার শক্তি। রাবণ তাদের ভেতর সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করেছিল। মানুষের মন থেকে ভয়ের ভূত সরাল। তারাও যে মানুষ, অবহেলার পাত্র নয় এই প্রত্যয়ে দৃঢ় হলো তাদের মনোবল। সব অনিয়ম, অবিচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের অন্তরের নিদ্রিত নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ করল। রাবণের নেতৃত্ব, আস্থা, নির্ভরতা বঞ্চিত, অপমানিত, নির্যাতিত মানুষদেরও একজন খুদে রাবণ করে সৃষ্টি করল। কুবেরের সুখের ঘুম কেড়ে নেয়ার শক্তি যে তাদের আছে, এই বাস্তব অনুভূতির পুলক শিহরণে তাদের সর্বাঙ্গ শিহরিত হলো। রাবণ তখন আর একজন নয়। সে হয়ে উঠল সহস্ররাবণ। সহস্ররাবণ তার সহস্র সহস্র হাত বিস্তার করে দুর্গত মানুষকে আগলাচ্ছে। কুবেরের শক্ত হাত দুটি নিশ্চল করে দিয়েছে। জনতার কাছে রাবণ তখন একটা নয়, সহস্ররাবণ। সে দুর্বার দুরতিক্রম। তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি কুবের কেন, স্বয়ং ইন্দ্রেরও নেই। রাবণ হলো জনগণের পরিত্রাতা, মঙ্গলের দূত। রাবণ অবতারী। সমগ্র লঙ্কার উজ্জ্বল প্রেরণা। লঙ্কার অনেক নাগরিক তাকে চোখে দেখেনিও, তবু অনুগামী তারা। রাবণ নামের নেশায় ডুবে আছে গোটা লঙ্কা।

মুগ্ধ আবেগে চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাবণ নামের দুরন্ত আকর্ষণ তার সমস্ত সত্তা ধরে নাড়া দেয়। তারও খুব ইচ্ছে হয় রাবণের মতো দুঃখী বঞ্চিত মানুষের একমাত্র অবলম্বন হয়ে তাদের আস্থার পাত্র হওয়াই তার লক্ষ্য। কারণ কুবেরের শাসনকালের সঙ্গে বিভীষণের শাসনের তফাত নেই। যারা ফসল ফলায়, তাঁত বোনে, কাপড় করে, বিভিন্ন দ্রব্য ঘরে বসে তৈরি করে তারা কেউই ন্যায্য পাওনা পায় না। দেশের উন্নতির জন্য কত রাস্তাঘাট তৈরি হলো, বড় বড় অট্টালিকা হলো, বড় বড় প্রাসাদে বাড়ি উঠলো তবু মানুষের অভাব গেল না। দারিদ্র্য ঘুচল না। অর্থের মুখ দেখল না অবস্থার উন্নতি হলো না। যাদের করার ক্ষমতা আছে রসাতলের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না। কর্মী ও শ্রমিকদের মজুরি না দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাদের। রাজকর্মচারী থেকে আরম্ভ করে বণিক, মুনাফাদার সবাই ঠকাচ্ছে তাদের। আরো গরিব হচ্ছে তারা। অথচ, যাদের হাতে আছে তারা সুরা নারী নিয়ে মজে আছে। উৎপন্ন শস্যের এবং রাজস্বের সিংহভাগ চলে যায় অযোধ্যায়, কিস্কিন্ধ্যায় উন্নয়নের ঋণ শোধ দিতে। কিন্তু রাজস্ব যাদের দেওর কথা তারা কর ফাঁকি দিয়ে অর্থের পাহাড় তৈরি করছে। তবু দেশের আইনে তাদের শাস্তি হয় না।

চন্দ্রগুপ্তও জানে, সব কিছু চরমে না পৌঁছলে নতুন করে আরম্ভ হয় না। সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। পাতা ঝরার দিনে কুসুম ফোটাতে চাইলে কি তা ফোটে ? তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

জীবনে সব কিছুর জন্য দাম দিতে হয়। রাবণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এই দাম দিতে হচ্ছে জাতিকে। এই কথাটা চন্দ্রগুপ্ত সকলকে বোঝাল। এভাবেই রসাতলে তার চারপাশে লোক জড়ো করতে লাগল। সব জায়গা থেকে লোক আসে। চাষী, তাঁতি, জেলে, জোলা, মুচি, দোকানি, খেতমজুর, কলু, স্বর্ণকার, কামার, কুমোর, শিকারী কেউ বাদ যায় না। চন্দ্রগুপ্তের বুক গর্বে ভরে উঠে। নিজেকে রাবণের একজন সার্থক উত্তরসূরি মনে হয়। নিজেকে রাবণি বলে পরিচয় দিতে তার গর্ব হয়। যারা তার অনুগামী রাবণি বলেই জানে তাকে। সবার জিভের ডগায় তার নাম নাচতে থাকে।

চন্দ্রগুপ্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। সীমাহীন প্রান্তর, আকাশ, জঙ্গল, পাহাড় ছুঁয়ে রইল তার দৃষ্টি। মুখে তার হাসি হাসি ভাব ফুটল। মুগ্ধ আবেগে তার শরীর শিহরিত হলো। ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখের দুটি তারা দূর আকাশের মেঘের একটুখানি নিচে জমকালো লঙ্কার মরকতকুঞ্জের গোল গম্বুজের চূড়ায় সোনালী ত্রিশূলের উপর স্থির হয়ে রইল। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, এই নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, ভোগ-বিলাসীদের আরাম, সুখ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন আর ক'দিন।

॥ তেরো ॥

ইদানীং নিজেকে অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় বিভীষণের। একটা কিছু ঘটতে চলেছে। হয়তো শীঘ্রই হবে। বাতাসে কান পাতলে বিভীষণ তার ফিসফিস শুনতে পায়। রাবণ বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে। তবু চিতা নিভবে না তার। অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে। রামের অদ্ভুত কথা শুনে বিভীষণ চমকে উঠেছিল। নিছক আবেগপ্রসূতে উক্তি ভেবে একদিন ভুলেও গেছিল। কিন্তু আজকাল মনে হয় কথাটার ভেতর কোথায় একটা সত্য লুকোনো আছে।

স্বদেশপ্রাণ চিরদিন দেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। তার নামটা যতকাল মনে থাকবে তাদের ততকাল সিংহাসন-লোভী বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলবে না তারা। বুকের মধ্যে তাদের তুষানলের মতো প্রতিহিংসার আগুন জ্বলবে। স্বাদেশিকতার যে দীপ মানুষের অন্তঃকরণে জ্বেলে দিয়েছে রাবণ, কোনদিন তা নিভবে না। বরং তার উজ্জ্বলিত আলো ধ্রুবতারার মতো পথ দেখাবে তাদের। যতদিন যার এই চিন্তাটা সর্বক্ষণ তার মস্তিষ্কের মধ্যে দপদপ করতে থাকে।

অযোধ্যা থেকে ফিরে আসার পরে বিভীষণের মনে হয়েছে লঙ্কা কোথায় যেন একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। যে কোন সময় গণবিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সেজন্যই

ভাবনা হয়। ভাবনার কারণ নানাবিধ। দেশের সব মানুষের স্বার্থ তো এক নয়। শাসন যারা চালায় আর শাসিত যারা হয় তাদের দুই শ্রেণীর সংঘর্ষ লেগে থাকে চিরকাল। কারণ, দুই শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় হয় না বলেই বোঝবার চেষ্টা নেই। হলে, অবশ্যই কিছুটা ভালো ফল পাওয়া যেত। যাচ্ছে না কারণ একটা দেয়াল আছে তাদের মধ্যে। যা উভয়পক্ষই ভাঙতে রাজি নয়। শাসকদের দেয়ালটাই অধিকতর সত্য, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব। সাধারণ মানুষ বড় ভীতু, কোনও বিষয়ে রুখে দাঁড়ায় না, তারা মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে, অবস্থার হের ফেরে বিপজ্জনক হতে পারে। এই ভাবনা এবং বিচারটা বিভীষণ ছাড়া অন্যদের নেই। এরাজ্যের অধিপতি বলেই তার ভেতরের অনেক আমি এক সঙ্গে জেরা করতে থাকে তাকে।

বিভীষণের ভাবতে খুব অবাক লাগল, একটা জীবন কত দ্রুত বদলে যায়। কটা দিন লঙ্কায় ছিল না, তার ভেতরেই রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে চন্দ্রগুপ্তর আর্বিভাব। তার অনিবার্য উত্থানকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে নিজের ভবিষ্যৎ অবস্থানকে একবার খতিয়ে দেখল। উঁচুতলা, ধনী, সম্পন্ন মানুষের ঔদাসীন্য, সামাজিক অবহেলো, অনাদায়, বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা, ঘৃণা, শোষণ, প্রতারণা, বঞ্চনা চন্দ্রগুপ্তর বিদ্রোহী অভ্যুত্থানকে সম্ভব করেছে। বিদ্রোহের ক্ষমতা সবার থাকে না, যার থাকে সে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় নিজের এবং অন্যের জন্য। তার কাছে কোনো মানুষই ছোট নয়, সবাই সমান। জন্ম পরিচয় কিংবা জাতি কৌলিন্যই যে মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, সে কথাটা জানান দেবার জন্য সমাজের সুবিধাভোগী উচুঁশ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে অভাবী মানুষদের নিজ নিজ দাবি ও অধিকার সচেতন করছে চন্দ্রগুপ্ত। চেঁচিয়ে কিছু বলেনি, রাগ করেও না। দুর্ভাগ্য এবং অভাবের প্রতিকার চাওয়ার ভেতর একপ্রচ্ছন্ন জেহাদ স্ফুরিত হয়। চাপচাপ বিদ্রোহের উত্তেজনা থাকে তার কথায়। মানুষের দরবারে তার একটামাত্রই প্রার্থনা, দুর্ভাগ্য এবং দুরবস্থার জন্য যারা দায়ী লঙ্কার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি যেন তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। চন্দ্রগুপ্তর এই সাহসী প্রার্থনা জনতার মনের কথা হয়েই তার এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলল। বিভীষণ বা আমাত্যেরা, শাসকেরা কী ভাবল, না ভাবল তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই তার। কোনো রক্ত চক্ষু পরোয়া না করে শিশুর মতো অকপটে কঠিন সত্য কথাটা উচ্চারণ করল : রাজা উলঙ্গ।

বিভীষণের সজাগ মনটি বুঝতে পারে জমানা বদলাচ্ছে। জমানা বদল ভালো কী মন্দ কেউ জানে না। তবে, বদলের প্রতি একটা মোহ আছে। আর কিছু না হলেও একঘেয়ে থেকে মুক্তি পাবে। চন্দ্রগুপ্ত কী পারবে লোকে বোঝে না। তবে অনাস্বাদিত জীবনের নীল আকাশের নিচে স্বপ্নের নীড় রচনার যে স্বপ্ন দেখত তা ভুলে গেছিল জমিদার, মহাজন, আড়কাঠির দলের দাপটে। চন্দ্রগুপ্ত তাদের বুকে সেই হারানো স্বপ্নের মালা গেঁথেছে। তাদের মধ্যে এই প্রথম একটা বড় বোধ জাগল যে, একজন

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা তার নিজেকে। অন্যের জন্যে না হলেও নিজের জন্য তার কিছু করার আছে। অন্ধকার গুহা থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য তার নড়ে চড়ে বসা প্রয়োজন। নিজের খিদে দূর করার জন্য যেমন নিজেকেই চেষ্টা করতে হয়, তেমনি নিজের মুক্তি চাইলেই তবে সে মুক্তি আসবে। মানুষের একটা বড় অংশ যে পিছনে রয়ে গেছে, সেটাই তাদের পশ্চাদপদতা। তাদের পিছুটান। তাদের ভীরুতা, দুর্বলতা। এগুলো কাটাতে পারলেই সে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠে।

একটা বড় কিছু দুর্ভাবনায় তার মন শঙ্কিত হয়। ভয়ঙ্কর হওয়ার আগে সাবধান হওয়া ভালো মনে করেই মন্ত্রিপরিষদের জরুরি সভা ডাকল। মানবকল্যাণের জন্য করণীয় কী সেই কথাটাই বেশি করে ভাবতে বলল সকলকে। কিন্তু প্রত্যেকেই বিভীষণের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই চিন্তাক্লিষ্ট, উদ্বিগ্ন। যে যার পদ নিয়ে আঁকড়ে থাকায় চিন্তায় নিমগ্ন। আগবাড়িয়ে তাই কথা বলল না কেউ। ঘর জুড়ে নীরবতা।

অবশেষে, বিভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল : উদাসীনতার রন্ধ্রপথ ধরে বহুবিধ সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছে। সাধারণ মানুষকে মানুষ মনে না করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই। বাহ্যত এদের কিছু নেই, এদের পাশে দাঁড়ানোর মানুষ নেই। এরা একা। এরা জানে না, বোঝে না এদের চাওয়াটা কী? এরা শীতল বরফের মতো। তাই তাদের কথা না ভেবে শুধু নিজেদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। তাদের কথা বারবার বলা সত্ত্বেও আপনারা জনতাকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু দেখতে পান না বলেই তাদের সম্পর্কে ভীষণ নীরব এবং উদাসীন। জনতা শান্তিপ্রিয়, তাদের আকাঙ্ক্ষাও সামান্য। তবু বেঁচে থাকার জন্য তাদের খাদ্যদ্রব্য চাই, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর, কেনার জন্য ন্যূনতম অর্থও চাই। কিন্তু আমরা তাদের সেই দাবি কতটা পূরণ করতে পেরেছি? তার হিসেব-নিকেশ করতেই আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছি। জনতাকে দুর্বল ভেবে উপেক্ষা করা উচিত নয়। জনরোষের আগুনে যে কোন সমৃদ্ধ নগরী পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তাদেরও সহ্যের সীমা আছে। সেই কথাটা মনে রেখে কৃষি বিভাগের এবং খাদ্যদপ্তরের মন্ত্রী ধুরন্ধর কী ভাবনা চিন্তা করছেন অনুগ্রহ করে বলুন।

বিভীষণের এরকম এক আকস্মিক প্রশ্নে ধুরন্ধর বিব্রতবোধ করল। রাগে, দুঃখে, অপমানে তার মুখখানা রাঙা হলো। রুক্ষ গলায় বলল : খাদ্য-সমস্যার ব্যাপারটা প্রধান হলেও এর সঙ্গে আরো অনেক ব্যাপার খাদ্য-সমস্যা লক্ষ্যে না পৌঁছনোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওতোপ্রোত যুক্ত। এক সমস্যার সঙ্গে আর এক সমস্যার গাঁটছড়া বাঁধা। এ অবস্থায়—

বিভীষণ ভুরু কুঁচকে গেল। মৃদু তিরস্কার করে বলল : বাগাড়ম্বর করাটা এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। লঙ্কার একজন মানুষও যাতে না খেয়ে মরে সেজন্য আপনাকেই

সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন দেশ থেকে চাল আনবেন, কাকে কোন দেশে পাঠালে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারে লাভবান হবো সেটাও ঠিক করতে হবে আপনাকে। দেশের মাটি কতখানি আবাদযোগ্য করা যায়, কীভাবে তার ফসল বাড়ানো সম্ভব, কৃষককে ভালো জাতের গরু মহিষ লাঙল দিলে, সেচ ব্যবস্থা ভালো করলে আমরা তো নিজের দেশের খাদ্যের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারি। একদিন পারতাম, এখন পারি না কেন ? — এসব কথা ভাবুন।

প্রধান আমাত্য মাতামহ মালির সম্ভ্রমে প্রবল ঘা পড়ল। অহঙ্কারের ঝঙ্কার বেজে উঠল গলায়। বলল : দিগন্ত জুড়ে নিরন্ন মানুষের ছবি। সত্যি, মানুষ কতদিন সহ্য করবে দেশের দৈন্য ? বাইরে থেকে সাহায্যের নামে এই দেশের মানুষের জন্য অর্থ ভিক্ষে করে আনি। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার হয় কোথায় ? আমাদের নিজেদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা কোথায় ? আমাদের এই পলিমাটি উর্বর জমিতে ফসলের অভাব হওয়ার কথা নয়। তবু ফসল তেমন হয় না কেন ?

ধুরন্ধরের চোখ দিয়ে আগুন ঝড়ে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল : আমাদেরও গোলাভরা ধান ছিল, খেতভরা সব্জি ছিল। কিন্তু আজ ভিন দেশের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। কেন পাততে হলো সে ইতিহাস তো কারো অজানা নয়। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকটাই চলে যায় অন্যদেশের ঋণ শোধ করতে। সেই পরিমাণ শস্যই তাদের কাছ থেকে চড়া দামে আমাদের কিনতে হয়। এখন ভিক্ষের অন্ন গলা দিয়ে নামে না বলে কুম্ভীরাশ্রু দেখালে হবে না। সারাক্ষণই আমি কৃষির উন্নতির কথা ভাবি। অনেক রাতেও ঘুমুতে পারি না। কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য এই চিন্তা আমাকে পাগল করে দেয়, ভূমিহীনদের চাষের জমি দেব বলে ভাবি, কিন্তু কোথায় পাব জমি ? সব তো নগর উন্নয়ন দপ্তর নগর সম্প্রসারণের জন্যই আগে থেকে দখল করে রেখেছে।

নগরপাল পনসের মুখটা বাংলার পাঁচ হয়ে যায়। ধুরন্ধরের দিকে এক অদ্ভুত হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের পাতা কাঁপে। বুকের ধুকধুকি বেড়ে যায়। ধুরন্ধর ইচ্ছে করেই তাকে ফ্যাসাদে ফেলে যেন। প্রবল অস্বস্তির মধ্যে মাথা নাড়ে। সাহস সঞ্চয় করে বলল : চাষ তো নগরে হয় না, পল্লীতে হয়। সেখানে তো পতিত জমির অভাব নেই। চাষের জমি নগরের পেটে চলে যাচ্ছে, চাষ-আবাদের জমি থাকছে না, এসব বাজে কথার মানে কী ?

ধুরন্ধরের চোখে মুখে ধূর্ত হাসি। বলল : চমৎকার কথা। জমি তো কেউ তৈরি করছে না। যা আছে তার ভেতর ভালো জমি নগরের জন্য অধিগ্রহণ করে রাখতে হবে। লোক দেখানো বাইরের সমৃদ্ধি কোনো কাজে লাগবে না। দেশে অন্নাভাব হলে রাজ্যের মানুষ বাঁচবে না, নগর তো আর মুখে অন্ন জোগাবে না। এমনিতে কৃষকেরা দরিদ্র। উদয় অস্ত পরিশ্রম করেও তাদের দারিদ্র্য এবং অভাব ঘুচছে না। দিন দিন আরো গরিব হচ্ছে। নগরের জন্য তাদের অভাব বাড়ছে।

পনমও ছাড়াবার পাত্র নয়। নগরে জমি বণ্টন থেকে গোপন পথে তার হাতে প্রচুর অর্থ আসে। সে অর্থটা তার একার। ধুরন্ধর তার রাঁধা ভাতে ছাই দিতে চেয়েছে। নিজের পদ ও দপ্তর পাছে বিভীষণের বিষ নজর পড়ে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই মরিয়া হয়ে ধুরন্ধরকে আক্রমণ করল। বলল : ধুরন্ধর ভাই মহারাজ বিভীষণের রাজ্যে চাষীদের অভাবটা অন্যরকম। এ এক অদ্ভুত ধরনের অভাব বোধ তাদের। এটা না পেলে পেট জ্বলে না, কিন্তু মন পোড়ে। পেটের আগুন দু মুঠো অন্ন জল পড়লে নেভে, কিন্তু মনের অভাবের নিবৃত্তি নেই ; সন্তুষ্টি নেই। এক অভাব আর এক অভাবকে ডেকে আনে। নগরের উন্নয়নের সাথে সাথে সে গ্রাম আর নেই। নগরের হাল-চাল, আদব-কায়দা সব গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলে, অভাবের নতুন নতুন উপসর্গ তাদের মনে জীবাণুর মতো ঢুকে পড়েছে। সমৃদ্ধি যত বাড়বে, দেশ যত ঐশ্বর্যশালী হবে এবং অর্থ যত হাতে আসবে, মানুষের মনের সুখ ও শান্তি তত নষ্ট হবে। কোনো কিছু পেয়ে তার তৃপ্তি নেই। অসন্তোষে ভেতরটা গজরাবে। সে শুধু কাঙালের মতো চাইবে। পেয়ে তার মন ভরে না। ভরবে কোথা থেকে? বিনোদনের প্রতি নিত্য নতুন আকর্ষণের টানে তাদের যদি কাঙালপনা বাড়ে, অভাবগ্রস্ত করে তা হলে সে দোষ রাজার নয়। নিজের অবস্থাতে সে সন্তুষ্ট নয়। তাই অসংখ্য চাহিদায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তার মন, আত্মা এ জীবনের মূল্যবোধ। এ হলো নগরোন্নয়নের ফলশ্রুতি। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। সুতরাং গেল গেল রব তুলে, অযথা দোষারোপ করলে তো শুনব না। সব ভালো কোথাও নেই। স্বর্গেও না।

পনমের সমর্থনে বিভীষণ অভিভূত গলায় বলল: পনম ঠিকই বলেছে সমৃদ্ধ, সুন্দর নগরই দেশের অর্থনীতির দর্পণ। বাইরের লোক নগর দেখে শুধু মুগ্ধ হবে না, এই ধারণা নিয়েই তারা ফিরবে নগরে কোথাও দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই। মানুষেরা না খেতে পেয়ে মরাটাও দেশের মানুষের কাছে পরিতাপের বিষয়। তাই চাষের উন্নতির জন্য অধিক ফলনশীল বীজ চাষীদের বিনামূল্যে সরবাহ করতে হবে।

প্রধান আমাত্য মালী বলল : নগরোন্নয়নের পাশাপাশি আর একটা সমৃদ্ধ জোয়ার কৃষিব্যবস্থা উন্নয়নেই হতে পারে। ভরতুকির বদলে রাজস্বের অর্থে ভরে যাবে রাজকোষ। ধুরন্ধর কিন্তু কৃষিতে জোয়ার আনতে পারেনি। বরং বীজের অভাবে অনেকে এ মরশুমে চাষ পর্যন্ত করতে পারেনি। যথেষ্ট ভালো উন্নতমানের ফলনশীল বীজ দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক চাষীর হাতে বীজ পৌঁছয় না কেন? উইতে এবং ইঁদুরে তা নষ্ট করে কীভাবে তার কারণ অন্বেষণ করতে হবে। আপনি একটু চাইলে এবং আরো একটু দায়িত্বশীল হলেই ভালো ফসল হবে।

ধুরন্ধর চোখ-মুখ, কান রাঙা হয়ে গেল। মালী প্রকারান্তরে তাকে অযোগ্য অসৎ বলে অভিহিত করল। বিমূঢ়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। অপমানের কাঁটাটা বিঁধে রইল বুকের মধ্যিখানে। মালির কথাটা কেবলই পাক খাচ্ছিল মস্তিষ্কের

মধ্যে। ধরা পড়ে গেছে সে। একশ্রেণী অসাধু ব্যবসায়ীর যোগসাজশে উন্নতমানের ফলনশীল বীজ দেশের কৃষকদের হাতে না নিয়ে বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে। এবং তা থেকে বিপুল অর্থের সিংহভাগ সে ভোগ করে। মালি কৌশলে সে কথাটা শোনাতে ভুলল না তাকে। এখন ধুরন্ধরের চুপ করে থাকা মানে তার ভদ্র অভিযোগকে মেনে নেওয়া, আবার প্রতিবাদ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। আস্তে আস্তে বলল : আমার উপর প্রধানমন্ত্রীর আস্থার অভাব নেই জেনে স্বস্তি অনুভব করছি। যে যাই বলুক, কৃষকরা গরীব, ভাগ্যহত। চিরদিন বঞ্চিত এবং অপাংক্তেয় হয়ে আছে। তাদের কাছে রাজ্যের কোনও প্রত্যাশা নেই। এদের বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় নাগরিককে নিয়ে নগরোন্নয়ন হয় না। তাতে অর্থনীতির শ্রী ফেরে না। সস্তার রাজনীতি করা সহজ কিন্তু চালাকি করে দেশের অর্থনীতির হাল ফেরানো যায় না। কৃষির জন্য যে অর্থ মঞ্জুর হয় তা সাগরে এক ঘটি জল ঢালার মতো। তবু আমি বিশ্বাস করি কৃষকদের উন্নতি ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি লাভ হয় না।

বিভীষণ তার অভিমান এবং ক্ষোভের উপর প্রলেপ দেওয়ার জন্য বলল : ঝগড়া করে কিংবা পরস্পরের উপর দোষারোপ করে কোনো বড় কাজ হয় না। এখন আমাদের কাজের সময়। কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সকলকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের উন্নয়নের একটাই লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু তার বদলে বৈষম্য বাড়ছে। একদল তলিয়ে যাচ্ছে, অন্যদল ভেসে উঠছে। দেশ কি, বেশিরভাগ মানুষ চেনে না। যারা শাসন করে আন্তরিকভাবে তারা দায়দায়িত্ব পালন করলে দেশজুড়ে এই অচল অবস্থা সৃষ্টি হতো না। কথা সর্বস্ব দেশসেবার মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতা যদি থাকতো তা-হলে উন্নয়নের পিছন পিছন অবনয়ন দেখা দিত না। দেশের শাসকদের প্রতি দেশের মানুষের ঘৃণা, অশ্রদ্ধা যে কত গভীর তার পরিমাপ যদি করতে পারি তা-হলে বিধাতা একদিন উপেক্ষার শোধ নেবে। ক'দিন আর হলো, এর ভেতর রাস্তাগুলো ভেঙেচুরে এমন অবস্থা হয়েছে যে রাস্তায় হাঁটতে পা মচকে যায়। এটুকু ভাবতেই আমার সব পেয়েছির দেশ সোনার লঙ্কা নিয়ে আমার গর্ব ও আনন্দ উবে যায়। প্রশ্ন করতে হয়, এই কি আমার সেই তিলোত্তমা নগরী? আমার অভিষেকের পনেরো বছরের মাথায় এসে ভাবতে হচ্ছে কোথা থেকে শুরু করব কাজ? সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত দেশ। জলের সমস্যা, পথে ঘাটে আবর্জনার স্তূপ, চলাচলের সমস্যা, ঘনঘন বাজারের দর চড়ে যাওয়া, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য, মানুষের নীতিহীনতা, উৎকোচ, অপহরণ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা— কত বলব? ভাবা যায়, কত? দেশের শাসক হিসেবে এসব ভাবতে ভাবতে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হতে থাকি। সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থ ও খাদ্যের। সোনার লঙ্কায় আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না — এ প্রশ্ন করব কাকে? আমরা সবাই দায়ী। আমাদের গাফিলতিতে

এই ভয়াবহ সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমার প্রিয় পারিষদবর্গ এত কিছুর পরও আমি সবচেয়ে ভালোবাসি হাজার হাজার মানুষের মুখ দেখতে। এবং সবচেয়ে বিব্রত হই নেংটিপরা মানুষ দেখে। আমার নিয়তির রূপ ধরে ওরা যেন নগরের চারদিকে আর্তচিৎকার জুড়ে দিয়েছে — নেই, নেই, নেই। বলতে বলতে উত্তেজনায় বিভীষণের চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অনেক অভিযোগ বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু কষ্টে দমন করে। মুখ ফুটে বলতে পারে না। বুকের কোথায় যেন একটা অপরাধবোধ পীড়িত করে তাকে।

বিভীষণের রথ বণিকসভার প্রবেশপথে এসে থামল। বিশাল সভাকক্ষ। অজস্র ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। রঙিন রেশমি কাপড়ে পতাকা রাস্তার দুধারে সোনালী রাঙ্‌তা মোড়া বাঁশের মাথায় পতপত করে উড়ছে।

উৎসুক দর্শকেরা তার গমন পথের দিকে চেয়ে আছে। ফুল-বিছানো পথ দিয়ে বিভীষণ হেঁটে যাচ্ছে। চন্দ্রকান্ত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আগে আগে চলেছে। সুন্দরী রমণীরা থালাভরা ফুল নিয়ে গমনপথের দুধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বিভীষণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করছে। আর বিভীষণ গভীর করে ফুলের সুবাস নেয় নাক ভরে। চোখ দুটি বুজে আসে তৃপ্তিতে, আনন্দে এবং গৌরবে। মানুষের সমাদরে ধন্য হয়ে যায়। এই স্বপ্নপুরীর আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে কেমন করে বিভীষণ?

জয় বিভীষণের জয়। প্রবল করতালি হতে লাগল চারদিকে। সমুদ্রের গর্জনের মতো তার ঢেউ গড়িয়ে এল চারদিক থেকে। এরই মধ্যে শয়ে শয়ে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হলো আকাশে। তাদের ঝটপট পাখার শব্দে এমনই মাদকতা যে তার বিষন্ন, অবসন্ন, হতাশ ভাবটা কেটে গেল। শরীরটা বেশ চাঙ্গা হলো। মনে হলো নরকের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে যায়। নিজের আসনে বসে। রাজা না হলে এই সম্মান কে দিত তাকে? সম্মান, গৌরব, মর্যাদা; মহার্ঘ হয়ে উঠে ধনীদের প্রসাদে। গরিবদের এসব দেবার সামর্থ্য কোথায়? সারাজীবন গরিবিয়ানাকে ঘেন্না করে এসেছে। এই ধনী মানুষদের জন্য পৃথিবীটা যা হোক একটু বাসযোগ্য হয়ে আছে। নইলে, জীবন্ত এক নরককুণ্ড হয়ে উঠত। এরাই স্বপ্নের ছবি আঁকে। এরা না থাকলে মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, বাসনা, কামনা সব মরে যেত। মানুষের পৃথিবীতে কোন উন্নতি, অগ্রগতি হতো না। ধনী ও বণিকরা সমাজের বিপদ নয়, সম্পদ। দেশের গর্ব ও ভরসারস্থল। চিরকাল একদল ব্যর্থ অলস মানুষ জীবনভোর কিছু করতে না পেরে এদের বিত্ত, বৈভব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, মর্যাদাকে ঈর্ষা করে। আভিজাত্যের গরিমাকে, বিলাসিতাকে, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যকে সহ্য করতে পারে না। সভামঞ্চের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে তার মনের রূপান্তর ঘটে যায়। বিভীষণের আশ্চর্য লাগে, মনের মধ্যে এ কোন

বিপ্লব ঘটে গেল? অবসন্ন, হতাশ মনটা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

অর্থনৈতিক সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনের আশীর্বাদ। সমস্ত সভাকক্ষ জুড়ে তারই এক আশ্চর্য অলঙ্করণ বিভীষণকে অনেকক্ষণ অবাক করে রাখল। চিত্রের সূচনা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যবাসী মানুষের জীবনযাত্রা থেকে। মানুষের জীবনযাত্রা থেমে নেই। সে নিরন্তর চলেছে। কোথায় যাচ্ছে তার ঠিকানা সে জানে না। কী চায় তাও ভালো করে বোঝে না। লক্ষ্যও স্পষ্ট নয়। তার জীবন মন্ত্র হলো এগিয়ে চল, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এ যাত্রার শেষ নেই, অনন্তকাল ধরে সে চলেছে, তবু ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েনি। চলার বেগে পায়ের তলায় তার রাস্তা জেগে উঠেছে। এ মানুষ প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহযুগ পেরিয়ে ক্রমে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য'র হাত ধরে কীভাবে ধাপে ধাপে সভ্য ও সমৃদ্ধশালী এক মানবসমাজ সৃষ্টি করেছে। সভাকক্ষের অভ্যন্তরে অলঙ্কৃত বিস্তৃত চিত্ররাশির দিকে বিভীষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। মানুষের এই বিরাট সাফল্য ও অগ্রগতির ভেতর কোথাও অভাবী, দরিদ্র, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের স্থান নেই। পরিত্যক্ত স্নানের মতোই তারা ছবির বাইরে।

কয়েকদিন আগেও এই অবাঞ্ছিত মানুষগুলোর দুর্দশা এবং তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। ভেতরে ভেতরে সেদিন ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে সে কথা ভেবে ওর হাসি পেল। মুগ্ধ স্বপ্নালু দুই চোখের বিভোর চাহনি মেলে মুক্ত দ্বার দিয়ে সাজানো উদ্যান এবং খোলা আকাশের নীলিমার দিকে চেয়ে আছে। এই সুন্দর শান্ত পৃথিবীটাই যেন ঘিরে রয়েছে দিগন্ত। বড় ভালো লাগে বিভীষণের। মনে হয় এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু সুন্দর মানুষরাই বেঁচে থাকুক। এইটেই সুন্দর হবে। তাই-ই, অসুন্দর জঞ্জালদের সরিয়ে দেওয়াটা রাজা হিসেবে তার মহৎ কর্তব্যবোধের মধ্যে পড়া উচিত বলে মনে হলো বিভীষণের। ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে শিল্পকান্ত ঢুকল। হাতে তার বিরাট একটা তৈলচিত্র। বিভীষণের হাতে ছবিটা উপহাররূপে দিল। বিশাল একটা মরাল ডানা মেলে দিয়েছে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত। একদিকে কোণ বরাবর তার লম্বা গ্রীবা এবং পিছন দিকে প্রসারিত সরু সরু পা, অন্যদিকে কোনাকুনিভাবে ডানা দুটো মেলে ধরা। শূন্যে ভাসমান অবস্থায় আছে। ছবির পটভূমি জুড়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশও, তুলোয় পেঁজা শুভ্র মেঘ, নানা রঙের বর্ণসমারোহে ফুটে উঠেছে ঋতুপরিবর্তনের দৃশ্য, মাটি-পৃথিবী, আকাশ, তরুলতা, উদ্ভিদ, চাষী প্রভৃতি এর পাশাপাশি নতুন নগরীর রূপান্তর, শ্রমিক মজুর মিলে কর্মযজ্ঞ, মানুষের ভিড় ইত্যাদি। এত সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে শূন্যে ভাসমান ঐ মরাল, যার পায়ের তলায় মাটি নেই, বিশ্রাম নেবার জায়গা নেই, যে কেবল জীবনস্রোতে শুধু ভাসছে। বিশাল পৃথিবীতে সে ভীষণ একা। সঙ্গীহীন। পেটের নিচে সবুজ পৃথিবী ভাঙাচোরা রেখা কাটাকুটি করা,

তেড়াবেঁকা যন্ত্রণাময়, কোনাকুনি রেখার বিচিত্র আঁচড়ে দৃশ্যময় এক নগ্ন নারীমূর্তি। সে হলো ভূমিকন্যা।

বিভীষণের দু'চোখ স্থির হয়ে থাকে চিত্রের উপর। মগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। একটা বিষাদ ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ছবির এক কোণে আকাশের বুকে কাটা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে নিরুচ্চারে নিজের কাছে বলে, আমিও তো কাটা ঘুড়ির মতো উড়ে উড়ে কোনো এক গাছে আটকে যেতে চাই। আমিও চাই বন্ধ হোক আমার এই দিনযাপনের রক্তক্ষরণ। এর একটু পরেই ওর ভাষণ দেবার পালা। কিন্তু চোখের সামনে থেকে ছবির দৃশ্যপট তাড়াতে পারে না। কাটা ঘুড়ির মতো ও যেন শুধু নিচে নামছে; এক অতলান্ত শূন্যতার মধ্যে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত কষ্ট হয়। চোখের সামনে হলুদ হয়ে গেছে পৃথিবীটা। কেবল ঐ মরালটাকে ভুলতে পারছিল না, হাত-পা ছড়ানো একটা মানুষের মতো লঙ্কার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওর নিষ্পাপ চেহারায় প্রাণের লাবণ্য আছে। সে লাবণ্যের রঙে রঙিন হবে এই নগরীর সোনালী ভবিষ্যৎ।

আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে উঠতে বিভীষণের কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল। ভাষণ দেবার আগে গলা সাফ করার জন্য বেশ কয়েকবার খেঁকারি দিল। চোখ, মুখ, নাক, কানের ঘাম মুছল। তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে ছবিটি তুলে ধরে বলল : এই ছবিটি হল আগামী দিনের লঙ্কার প্রতিচ্ছবি। ঐ মরাল আর কেউ নয় আমাদের স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। গোটা পৃথিবীর উপর সে আধিপত্য চায়। মানুষের উদ্যম, শক্তি, আকাঙ্ক্ষা, এমনই অমূল্য জিনিস যে মরালের মতো বিশাল ডানা মেলে দেয় আমাদের মনে। শিল্পীর এ এক মজার কৌতুক। —হৃদয় মরে যায়নি, যৌবনের মৃত্যু নেই, বাসনার শেষ নেই, মানুষের যাত্রাও থেমে নেই। মানুষ নিজেও জানে না তার পথের শেষ কোথায়! বিশাল পৃথিবী হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। জীবন মানে চলা। জীবনের অর্থ বোঝে শিল্পী। গতিশীলতা সবার উপর স্থান পেয়েছে চিত্রে। ঐ গতিই তো জীবন, প্রাণের লক্ষণ। তাই, ঐ মরাল আকাশে স্বচ্ছন্দ বিহার করে। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ডানা বিস্তৃতিকেই নির্দেশ করে। বিস্তার হলো সাফল্য, জয়যাত্রার চিহ্ন। জীবন যদি জীবন্ত, প্রাণবন্ত এবং ভরা যৌবনে ভরপুর না হয় তা-হলে প্রাণ-সর্বস্ব জীবন নিয়ে কী হবে? সে তো গরুরগাড়ির গাড়োয়ানের মতো বোঝা বয়ে বেড়াবে — সে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। মরালের মতো মানুষকে স্বপ্নের আকাশে ডানা মেলে দিয়ে রঙবাহারের নতুন পৃথিবীর দিকে তাকালে যে কোন মানুষই উপলব্ধি করবে দৃপ্ত প্রাণের হর্ষ, অফুরন্ত যৌবন আর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পী আমাদের নতুন স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। শিল্পীবর শিল্পকান্তর অপরূপ চিত্র লাভ করে ধন্য হলাম। মন আমার অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেছে। এই চিত্রের ভাষায় সঙ্গে আমার

আগামী দিনের চিন্তা-ভাবনা এক সরলরেখায় মিশেছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। লঙ্কার উন্নয়নের পাশে সব নাগরিককে স্বার্থ, অভিমান ত্যাগ করে সগর্বে দাঁড়ানো একান্ত কর্তব্য। অর্থনৈতিক মুক্তির পথ ধরেই একদিন সব নাগরিকই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

হাততালিতে সভাকক্ষ গমগম করতে লাগল। বিভীষণ সগর্বে তার ভাষণের প্রশংসা এবং অভিনন্দন মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ। সারা শরীরের ভেতর তার আনন্দের ঘুঙুর বাজছে। অধরে চেপা হাসি, দু'চোখে প্রসন্ন কৌতুক। এক আশ্চর্য-মুগ্ধতা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাত উঁচু করে সকলকে থামার আবেদন করল। তারপর বলল : বারোমাসের দুঃখের পাঁচালি শুনিয়ে অভাবী মানুষের সহানুভূতি পাওয়া যায়, কিন্তু একঘেয়ে দুঃখের পাঁচালি পাঠ করে সত্যি কোন লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। অভাব, দুঃখ, অভিযোগ দূর করার জন্য চাই অর্থ। পাহাড়প্রমাণ ধন চাই, যা দিয়ে গোটা দেশ জয় করা যায়। ধনের কোন জাত-ধর্ম নেই। ধন দিয়ে নীচ উত্তম হয়। ধনের সাহায্যে ঘুচে যায় মানুষে মানুষে বিভেদ, জাত-ধর্ম সব। আমি তো ধনোপার্জনের সেই দরজাটা খুলে দিচ্ছি সব মানুষের জন্য। অনাগত দিনের সুখের স্বপ্ন দেখতে ঘুম আসে না চোখে। লঙ্কার কথা ভেবে বুকটা আমার কীভাবে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে জানতে পারে না কেউ।

আবার হাততালি শুরু হল। একবার হাততালি আরম্ভ হলে থামতে চায় না আর। বিভীষণের চোখের সামনে অসংখ্য উদগ্রীব মুখ। অবাক হয়ে দেখে। কত স্তাবক তার চারপাশে। কারো দৃষ্টিতে মুগ্ধতা, কারো চকচকে দৃষ্টিতে লোভ, কামনা, স্বার্থ উদ্ধারের ছলনা। বুক ঠেলে বিভীষণের নিঃশ্বাস পড়ে। এই সভায় কি একজনও নেই যে, স্বার্থের ঊর্ধ্বে তাকে ভালোবাসে ? নিজের মনেই বলল : না, চারপাশের মানুষরা ভালোবাসে না তাকে। এমন কি মন্দোদরীও না। কেবল, একজনই ভালোবেসেছিল তাকে। প্রাণভরে ভালোবেসেছিল। তার কাছেই ফিরে যেতে হবে তাকে। অনেককাল পরে সরমার কথা মনে পড়ল বিভীষণের। লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাওয়ার পরে তার সঙ্গে দেখা হয়নি আর। কিন্তু তার সব সংবাদই রাখে। সরমার বুকে কোনো কষ্ট নেই। একা দিব্যি তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। সরমার ভাবনায় মনটা হঠাৎই খুশি হয়ে উঠে। মুহূর্তে ভেতরের অন্ধকার মুছে যায়।

প্রাসাদে ফিরেই সরমাকে খুঁজে বার করা হবে তার প্রথম কাজ। তাকে ফেরার কথা বলবে। কিন্তু যদি না ফেরে, তাহলে তার ডাক উপেক্ষা করার অপরাধে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তার বাকি জীবনটা। স্বামীত্বের অধিকারে ও অহঙ্কারে তার গ্রীবার শিরগুলো ফুলে ফুলে উঠল।

সরমার জন্য বিভীষণের মনটা বড় চঞ্চল হলো। ঘরেতে মন তিষ্টায় না। তার

জন্যে প্রায়ই এক গভীর কষ্টবোধ করে বিভীষণ। মাঝে মাঝে তীব্র অনুশোচনা হয়। এক ক্ষমাহীন অপরাধে ঘৃণা করে নিজেকে। সে সব অনুভূতি প্রকাশ করার নয়। ভাববারই শুধু, কোনো হঠাৎ আসা অবসর মুহূর্তে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই ভাবে নিয়ম ভাঙার সুখও সুখ। নিয়ম না ভাঙালে তা জীবনের বেড়ি হয়ে উঠে। শৃঙ্খলিত হয়ে মেয়েরা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু পুরুষ পারে না। বাধা জয় করে জয়ী হওয়ার সুখ একটু অন্যরকম। কিন্তু এসব কথা কাউকে বলে বোঝানোর নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেলে জীবন বোধহয় পূর্ণ হয়। অভিজ্ঞতাও হয় না। মানুষের অনেক সত্তা। এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তা প্রতিযোগিতা লেগেই আছে। সে কথা বোঝার ক্ষমতা হয়তো থাকে না সকলের। বাইরে থেকেও তা বোঝা যায় না। ব্যক্তি মানুষও টের পায় না, অদৃশ্য এক সত্তায় তাকে নিয়ে কোন খেলা খেলছে? সত্তায় সত্তায় নিরন্তর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি না হয়ে কারো পক্ষে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। প্রতিযোগিতা শুধু কর্ম জগতে নয়, মর্মজগতেও হয় প্রতিনিয়ত। পুরুষ বা নারী যে হোক, তাকেই সংগ্রাম করতে হয় নীরব, অদৃশ্য একসত্তার সঙ্গে। প্রতিমুহূর্তই হারজিত তার জীবনে। জীবনের শেষে এসে হিসেব-নিকেশ করে যার জিতের সংখ্যা বেশি হয়, সেই-ই জিতল। যার হলো না, সে হারল। বিভীষণের মনে হলো, প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সংগ্রামে সে হেরে গেছে। বাইরের জয়টা কিছু নয় ভেতরের হারটা তার কাছে দুঃসহ। সেখানে যে কতরকমের পরাজয়ের কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান তাকে ছিন্নভিন্ন করছে, তা অন্যে দেখতেও পায় না। তার অস্তিত্বের সঙ্গে সত্তার অবিরাম ঝগড়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খোঁজও রাখে না কেউ। কস্তুরী মৃগর মতোই সে গন্ধে তার সমস্ত সত্তা আকুল হয়ে উঠেছে। নিজের মনের এই আকুলতায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সে দেখছিল সরমার মুখ। চকিতবিদ্ধ একটা কষ্ট তার আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হয়েছিল। বঞ্চনার কষ্ট এবং একটা তীব্র আর্তিতে তার বুকটা টনটন করেছিল। এ লঙ্কায় সত্যিকারে তার আপনজন কেউ নেই। নেই কোনে ভালোবাসার মানুষ। জীবনটাকে তার ব্যর্থ মনে হলো।

বিভীষণের বুকে যেন সহসা বজ্রঘাত হয় এবং তার ঝলকে দিশহারা হয়ে পড়েন। সরমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সূত্রে এমন একটা কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো তাকে দাঁড়াতে হয় নি। এক অজ্ঞাত আকর্ষণেই সে সরমার অন্বেষণে রসাতলে নীলকণ্ঠ নগরে যাত্রা করল।

বিভীষণ পদব্রজে একজন সাধারণ বয়স্ক মানুষের ছদ্মবেশে নীলকণ্ঠ নগরে ঢুকল। সশস্ত্র দেহরক্ষীও দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করল। সরমার বাড়ির রাস্তায় একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ পড়ল। সেখানে গুটি কয়েক দোকান এবং বাজার বসেছে। বেশ কিছু মানুষের ভিড়। দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় নানা বয়সের লোক বসে গল্প

গুজবে মেতে আছে। ঘর্মাক্ত হয়ে বিভীষণ সেখানে তৃষ্ণার জল চাইল।

দোকানি জিজ্ঞেস করল : মহাশয়কে নতুন দেখছি।

বিভীষণ একটু চমকাল। ওভাবে চমকাতে দেখে কৌতূহলী হয়ে বলল : মহাশয়ের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি বোধহয় ভিন গাঁয়ের লোক। মহীরাবণের ব্যাটার কাছে এসেছেন।

জোরে জোরে মাথা নাড়ল বিভীষণ। কিন্তু মহীরাবণের ব্যাটা কে, না বোঝার ভাণ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল দোকানির দিকে।

দোকানী কী বুঝল কে জানে। আত্মতৃপ্তির হাসিতে বলল : তুমি ভাই গাঁইয়া রয়ে গেলে। নির্বোধের মতো চেয়ে আছে কেন? ভয় নেই। মানুষটা বড় ভালো। সবার মন জিতে নিয়েছে।

কী হবে জিতে? আমাদের মতো বোকা মানুষদের যা বোঝানো যায় তাই বোঝে? প্রজারঞ্জন, প্রজাপ্রিয়, শুধু গালভরা কথা। বিধাতার রাজ্যে সবাই সমান-এ সব বুলির কতটুকু বোঝে তারা? শিল্পপতি, ভূমিপতি, নরপতি হলো এ রাজ্যে ক্ষমতার আসল চেহারা। হ্যাঁ, এই চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে চন্দ্রগুপ্তের চেষ্টায়। কিন্তু তাতে আমাদের অবস্থা কতটুকু ফিরেছে? আমরা তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। চন্দ্রগুপ্তের আছে কী? সে বা কতটুকু করতে পারে? এ সমাজে আমরা সব সময় অন্যায় করছি। এবং মেনে নিচ্ছি, আবার গোপনে গুছিয়েও নিচ্ছি যে যার— তাহলে কী করে সে অন্য মানুষ তৈরি করবে? মহারাজ বিভীষণের থেকে ভালো কিছু করতে পারবে?

দোকানি এবং দোকানের সামনে অবস্থানরত মানুষজন গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে থাকে বিভীষণের দিকে। এ ধরণের বক্তৃতা অনাবশ্যক তার কাছে আশা করেনি। বিভীষণের কথাবার্তা তাদের ভালো লাগল না। কোথায় একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিল তাদের মনে। দোকানি একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল : আপনি ওখানে গেছিলেন বললেন তো। কেন গেলেন, কী জন্য গেলেন আপনি জানেন। কিন্তু আপনার কথা বার্তা এলোমেলো। আমাদের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আপনি মশাই গেঁয়ো লোক নন। আমাদের মতো আস্ত নিরেটও নন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চালাক। আমাদের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কথা বার্তায়, চিন্তায় ভাবনায়, বিচার বুদ্ধিতে।

বিভীষণ তার ভুল বুঝতে পেরে শোধরানোর জন্য বলল : বন্ধুরা মুহূর্তে আমার সঙ্গে একটা দূর ব্যবধান তৈরি করে ফেললে। তুমি ডাকটা আপনি হলো কোন অপরাধে? ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই মনের কথাটা বলে দোষ করেছি বল।

দোকানে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে এক অচেনা চাষী বলল : না, না তা কেন? এতদিনে আপনি একটা বড় কাজ করেছেন। সাহস দেখিয়েছেন। রুখে দাঁড়িয়েছেন আমাদের বোধ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে। সত্যিই তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আছে

কি ?

বিভীষণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, উঁহু, ও কথা বলো না। তোমারাই দেশ। তোমারাই দেশের বৃহত্তর অংশ। তোমাদের নিয়ে তো এই সোনার লঙ্কা। সকলে মিলে একসঙ্গে না থাকলে একে অন্যের হাতে হাত না রেখে ছোট খাটো অমিল, অসুবিধার কথা না ভুললে তো এক হয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। কিন্তু অভিমানে, রাগে, বিদ্বেষে সুবিধেবাদী মানুষ তোমাদের ছোট ছোট দ্বীপে আলাদা করে রাখছে। দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে একা একা বেঁচে থাকা যায় কি ? বাঁচা হয় তো যায় কিন্তু কারো পক্ষে সেটা সুখের কিংবা মঙ্গলের হয় না। বন্ধুরা, সমস্ত দেশ যখন এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে তখন কি একা একা তার জীবনটা নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত থেকে কাটিয়ে দেবে ? কখনো না। জঙ্গলের গাছেরা জড়াজড়ি করে, ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে এক জায়গায় সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যেমন বেঁচে থাকে তেমনি করে সকলের সঙ্গে সুখে দুঃখে, প্রেমে-অপ্রেমে, আনন্দে বিষাদে জীবন কাটানোর ভেতর কোন অপমান নেই।

বিভীষণের সুললিত ভাষণ সবাইকে মুগ্ধ করে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে শ্রোতৃবৃন্দ। বিভীষণের বন্ধু সম্বোধন শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে গেল। কেবল, দোকানির মনে সন্দেহ। সন্দিগ্ধ চোখে ছদ্মবেশী বিভীষণকে সে দেখতে লাগল। রসাতলের মানুষদের কথাই অন্যভাবে বলছে।

অনেক লোকের ভেতর আরো দুটো অচেনা মুখ খুঁজে পেল দোকানি। মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারা ভিনদেশী লোককে বাহবা দিয়ে উৎসাহিত করছে। তাদের মধ্যে একজন পাগড়ি পরা মানুষ খালি গায়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল : এই নগরে যা কিছু গর্বের, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সে তো আমাদের শ্রমেই হয়েছে। আমরাই এর স্রষ্টা। আমাদের সাহায্য না পেলে লঙ্কার রাজা বিভীষণের সাধ্য কি এই দেশকে সুন্দর করে সাজায়। আমরা দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্যবোধ আছে। পেটে ভাত না থাকলেও আমরা সুন্দরের পূজারী। আমরা দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু ঘরের দারিদ্র্য বাইরের লোকে দেখবে কেন ?

দোকানি ঘর থেকে বাইরে এসে বলল : কিন্তু বন্ধু তাতে আমাদের দারিদ্র্য ঢাকা পড়ে না। পেটের খিদেও মরে না। অন্নই আত্মা, অন্নই ব্রহ্মা। অন্নকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর-চিন্তাতেও মন বসে না। অন্নই সিদ্ধির সোপান। আমাদের হৃদয়ের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মানুষকে বোকা বানায় না। কিন্তু তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত করছ। তোমরা খারাপ লোক। ঝড়ে-ভাঙা নীড়টুকু উড়ে গেলে তোমরাও নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। চন্দ্রগুপ্ত আমাদের ভাঙা ঘরের ফুটো চাল। মাথার উপর ঐ চালটুকুও যদি যায় আমরা দাঁড়াব কোথায় ? তোমাদের যদি প্রাণের ভয় থাকে নীলকণ্ঠ নগর ছেড়ে চলে যাও। ভুলে যেও না আমাদের বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে। রাবণের চিতার আগুন ঝড় জলেও

নেভে না। ধিক ধিক জ্বলতে থাকবে সারা জীবন ধরে। তোমাদের বুকে সে আগুন কই? তোমরা আমাদের শত্রু। সময় থাকতে পালাও।

বিভীষণ মনে মনে বলল : বেয়াদব, পাজি। কথা না বাড়িয়ে ছদ্মবেশী বিভীষণ মানে মানে সরে পড়ল।

দু'দিন পর সরমার সঙ্গে দেখা করল গোপনে। গুটি গুটি পায়ে কুটিরে ঢুকল। সরমার দুচোখে বিস্ময়, বহুকাল পরে দেখা বলেই বুকটা উত্থাল-পাথাল করে উঠল। তবু নিজে গম্ভীর ও সংযত থাকল। কারণ : বিভীষণকে বিশ্বাস করে ঠকেছিল বলে, আর বিশ্বাস করে না। ধরে নিয়েছে বিভীষণ কোন মতলবে এবং স্বার্থে এসেছে। কিন্তু স্বার্থটা কী তা বুঝতে পারে না। বিভীষণ খুব সহজভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। উত্তেজনায় নয়, একধরনের চাপা অপ্রকাশ্য উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে সে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করছিল, নববধূর মতো হঠাৎ ভুরু নাচিয়ে হাসল। মুক্তি পাওয়ার জন্য মজা পেয়ে হাসল যেন। টেপা হাসি। তবু টোল পড়ল দু'গালে।

বিভীষণও শ্বাস ফেলে বলল : হাসলে যে।

হাসি পেল কী করি বল।

আমার মধ্যে হাসার মতো কী দেখলে? আমি জিতেও হেরে গেছি, ছোট হয়ে গেছি তোমার কাছে। আমাকে নিয়ে তোমার হাসবারই কথা। আমার জন্য তোমার করুণা হয় না।

সরমা উত্তর দিল না মুখ নিচু করে রইল অন্যমনস্ক হয়ে। অলস হাওয়ায় অলকচূর্ণ উড়ে পড়ছে কপালে। বলল : শরীর ভালো আছে তো।

মনের দরজাটা বন্ধ করে রাখলে কি আর ভালো থাকা যায়?

পুড়ে ছাই হতে যে চায়, সাধ মিটিয়ে পুড়ে মরাতেই তার সুখ।

বড় একটা ঢোক গিলল বিভীষণ। মুখ বিকৃত করল। বলল : দোহাই তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর সরমা। বিশ বছর আগের জীবনে আমরা ফিরতে পারি না। অনুনয়ে ভেঙে পড়ল বিভীষণ। চোখের কোণ জলে ভেজা।

সরমা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মৃদুকণ্ঠে বলল : চোখের জল দেখাতে কি এখানে এসেছ? আমি জানি, তুমি একদিন আসবে। ভালোবাসার টানে না এলেও নিজের প্রয়োজনে আসবে। আসতে তোমাকে হতোই।

বিভীষণ নিঃশ্বাস ফেলে বলল : এসেছি, তোমাকে নিতে। তোমাকে ছাড়া বড় একা লাগে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই বিশাল পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ আছে যে আমাকে ভালোবাসে। সে মানুষটি তুমি সরমা। অনেকদিন আমার মাথায় ঠিক ছিল না। তোমাকে অবহেলা করেছি। তোমার দিকে ঠিকমত নজর দিতে পারিনি। আমার উপর রাগ করে, অভিমান করে, আমাকে উপেক্ষা করে তুমি চলে এলে

কেন ? আমি তো তোমায় ভালোবাসি।

আমিও বোকার মতো তোমায় ভালোবাসতাম। স্বামীকে খুশি করার জন্য বোধ, বুদ্ধি, বিবেক ধর্ম সব ত্যাগ করেছিলাম। তোমার ভালোবাসার কথা, তোমার স্বপ্ন সংকল্প আমাকে রূপকথার জগতে নিয়ে যেত। আমি ঠিক করছি না জেনেও, নিজেকে ঠেকাতে পারতাম না। কোনো অনুশোচনা কিংবা পাপবোধ ছিল না আমার মধ্যে। তোমার অভিষেকের পর মনে হলো আমি তোমার প্রথমা প্রেমিকা নই। মন্দোদরী তোমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের বন্ধন মেনে নিয়ে একটা জোড়া তালি দেওয়া মিথ্যে, অবুঝ, এলোমেলো জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানোর ভেতর অপমান ছাড়া, সত্যি কিছু নেই। বিয়ের অধিকার নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে গেলে বিয়ের পবিত্রতার গায়ে দাগই ধরে। তাই তোমার জীবন তোমার থাক, আমার জীবন আমার হোক এবং আমাদের মিলিত জীবন ঈশ্বরের হোক এই মহৎবোধে একদিন গৃহত্যাগ করেছিলাম।

সত্যি আমি তোমাকে বুঝিনি। স্বপ্ন নিয়ে খেলতে চেয়েছিলাম শুধু। স্বপ্নের সুন্দর বীজ থেকে যে মাকাল ফল ফলবে, তা কি ভেবেছিলাম ? ভাবেনি বলেই ঐ দিনগুলোতে আমি কেমন পুড়ছিলাম, তা যদি জানতে আমার উপর কোনো অভিমান থাকত না। সরমা, ভুল তো মানুষ করে। আমার সব ভুল ক্ষমা করে দাও তুমি।

কিন্তু আমি যে তোমাকে ভুলতে চেয়েছি। তোমার কাছ থেকে সত্যিকারের মুক্তি চেয়েছি।

সরমা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি তোমাকে। বল দেবে ?

আমি সামান্য এক অধিকারহীনা নারী। তোমার মতো একটা মস্ত বড় মানুষকে ভিক্ষে দেবার মতো আমার আছে কি ? এই দেশের সব কিছুই তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলেই তুমি তা পেয়ে যাও। তা হলে কাঙালের মতো আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন ?

না, সরমা আমার সব পাওয়া হয়নি।

এমন করে কাঙালের মতো ভালোবাসা চাইতে নেই। ভালোবাসা কি ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস ?

বিভীষণ একটু থমকে থেকে বলল : স্ত্রীর কাছেই কেবল কাঙালের মতো চাওয়ার যায়। অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারির মতো ভিক্ষে চাইতে শিবের কোন লজ্জা ছিল না। নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করার মাধুর্যে শিবের সে চাওয়া গায়ে অগৌরবের কালিমা লাগেনি। যার হারানোর ভয় নেই কিছুতেই, একমাত্র সে শিবের মতো ভালোবাসা ভিক্ষে করতে পারে। অথবা, যা কিছুই সে পেয়েছিল বা তার ছিল, সেই সমস্ত কিছুকে পরিপূর্ণতা দিল তার গর্বের ভালোবাসা। ভালোবাসায় বড় কষ্ট। এই নগরীর কাউকে তো আমি আমার হৃদয় খুলে দেখাতে পারি না। তোমারও কি জানাতে

ইচ্ছে হয় না। বুকটা আমার কীভাবে ঝাঁঝরা হয়ে আছে?

দুঃখের দিন তো আর তোমার নেই। তবু কেন এমন করে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হচ্ছে? সতিকারে আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। এ হলো তোমার ভেতর ব্যর্থ একটি পুরুষ মানুষের ভালোবাসার খেলা। তুমি ফিরে যাও। তোমার জন্য সত্যি কিছু করতে পারি না, কিছু না। তোমাকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। তবু স্বামীর অধিকার নিয়ে আমাকে দাবি কর না তুমি।

সরমা, আমি বড় একা।

আমি আর একা নই। এখানে না এলে জানা হতো না, মানুষ নিজেকে নিজে একা করে তোলে এবং এক অন্ধকারের মধ্যে বাস করে। এখন তো বুঝেতে পারছ, মানুষ নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত। নিজেকে জানা নিয়ে তোমার অহংকার যে কত মূঢ়তা এখন তোমার চেয়ে বেশি কে জানে? নিজের কাছেই সব চেয়ে বেশি অসহায় তুমি। নিজের অজ্ঞাত হৃদয় যখন নিজের কাছে আবিষ্কৃত হয়, মানুষের সে মুহূর্তের বিস্ময়, যন্ত্রণা, আনন্দ, অসহায়তা তাতে এক সংকটে ফেলে। একদিন তো মন্দোদরীর প্রেমে ও মোহে উন্মাদ হয়ে তুমি কী করোনি বল? রামচন্দ্রের কাছে দাসখৎ দিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ কী আশ্চর্য, রামচন্দ্র তোমাকে একটুও বিশ্বাস করেনি। লঙ্কার উপকূলে বানর সৈন্য পৌঁছে দেওয়ার গুপ্ত পথ দেখিয়ে দেওয়ার পরেও তুমি তার নজরবন্দি। অস্ত্রভাণ্ডার নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ভিলায় লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কার গর্ব ইন্দ্রজিৎকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করতে তুমি একটুও কুণ্ঠিত হওনি। তোমার বুকে অনুশোচনার কোনো স্থান নেই। তুমি এমন পাষাণ এবং নিষ্ঠুর। শুধু একজন মেয়েমানুষের শরীরের উপর অধিকার পাওয়ার জন্যই আমাকে ত্যাগ করলে। অথচ, বিশ্বাসঘাতকের স্ত্রী হয়ে আমিও অমন দেবসুলভ ভাসুরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তোমার জন্য ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার দরকার। আমি তোমার কেউ নই। তোমার নিঃশ্বাস গায়ে লাগাও পাপ। আজ আমার পাপের, দোষের প্রায়শ্চিত্ত করার দিন।

চকিত যন্ত্রণার মতো শূন্যতা হাহাকার করে উঠে বিভীষণের বুকে। হৃদয় মথিত করে এক গভীরে নিঃশব্দ আর্তস্বর ধ্বনিত হলো তার কণ্ঠে। সরমা, আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

স্বামী, মায়া মোহের বন্ধন কাটিয়ে আবার মোহের টানে ফেরা যায়? এক নতুন জীবনের সূচনা করেছি এখানে। আমি তোমার কেউ নেই। একটা বিশ্বাস নিয়ে এসেছি। পারি না তোমার মতো স্বার্থপরের কথায় এতগুলো মানুষের স্বার্থকে ডুবিয়ে দিয়ে রাজসুখের প্রলোভনে ছুটে যেতে। রসাতলের মানুষজন, মাটি, আকাশ, জল, হাওয়া, ধুলোর গন্ধ আমি বড় ভালোবাসি। এদের প্রাণভরা মা ডাক আমার তরণীসেনের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। এরা আমার তরণীসেন। অসহায় সন্তানদের ছেড়ে আমি

কোথাও যেতে পারব না। এটাই আমার সাম্রাজ্য। সম্রাজ্ঞীর আসনে বসে আছি। এই শান্তি, সুখ লঙ্কার আনন্দপুরীতে নেই। তুমি ফিরে যাও স্বামী।

সরমা, নিষ্ঠুর হয়ো না। ফুরিয়ে যাওয়া আমাকে নবীকৃত কর ক্ষমায়, ভালোবাসায়।

আমরা কেউ কারো নই। স্বামী থাকতেও আমি স্বামীহীন। তোমার স্ত্রী থাকতেও পত্নীহীন। এখানেই আমাদের দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল।

দোহাই, তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না। আমাকে তো একটু দয়া করতে পার।

দয়ার কথা উঠছে কেন ?

সরমা, তোমাকে বোঝাই কেমন করে আমার সমূহ বিপদ। তুমি পাশে থাকলে আমার জোর বাড়ে। অনেক নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তোমাকে আমার দেওয়ার কিছু নেই। তোমাকে আমার বিবেক, মমতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা দিয়ে থুয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আর কি দিতে পারি তোমাকে ?

সরমা, আমি সুখে নেই। তোমাকে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। আর কোনো অশান্তি থাকবে না।

আমার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী ?

আমি সুখে নেই। চন্দ্রগুপ্তর জন্যই তোমাকে পাচ্ছি না। এই অপমান আমি ভুলতে পারছি না। আমার চেয়ে তোমার কাছে সে বড়। তাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। পথের কাঁটা উপড়ে ফেললে তুমি যাবে তো ?

পথ কষ্ট করে এই কথাটা বলতে এসেছ। আমার তরণীর দুঃখ সে ভুলিয়ে দিয়েছে। তার ভেতর আমার তরণীকে পাই। সে আমার তরণী হয়ে গেছে।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বিভীষণ বলল : জানি, জানি। সে আমার স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষার শত্রু। তাকে আমি নির্মূল করে ফেলব।

সরমা নির্ভয়ে হাসল। বলল : আবার ভুল করলে। রাবণের চিতার আগুন থেকে যারা উঠে আসে তারা তরণী হয়ে যায়। তরণীদের মৃত্যু নেই। তরণীরা মরে গেলে বিভীষণদের হাতে সুন্দর পৃথিবীটা শ্রীহীন হতো। চন্দ্রগুপ্তরাই ভাবে দশের কথা, দেশের কথা। সে তো দেশের শত্রু নয়, দেশের মানুষের ভালো চায়। তা-হলে তোমার শত্রু কিসে ? তোমার চাওয়া আর তার চাওয়ার পার্থক্য আছে বলেই সে তোমার শত্রু হতে পারে, কিন্তু দেশের শত্রু কখনোই নয়। তোমরা দু'জন দুই শিবিরের মানুষ। তোমাদের হাতে অঢেল টাকা আছে, সৈন্য আছে, ক্ষমতা আছে, তোমরা ভালোবাসা দেখানোর জন্য যা করছ, তাতে সাধারণ মানুষরা খুশি হচ্ছে না। চন্দ্রগুপ্ত সাধারণ মানুষের দলে। তার টাকা নেই, ক্ষমতা নেই, সৈন্য নেই, তার যা আছে অকপট ভালোবাসা। খুশিহীন দেশের মানুষরা তাকে পেয়েই খুশি। তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এটা তার দোষ না গুণ। তাকে শ্রদ্ধা কর রাজা। চন্দ্রগুপ্ত তোমার

শত্রু নয়। তোমাকে যারা ঘিরে আছে, যাদের ঘেরাটোপ থেকে তুমি বেরোতে পারছ না তাদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জেহাদ। তোমার গায়ে তার আঁচ লাগছে সেজন্য। যেদিন অমিল ভুলে চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে হাতে হাত রেখে সাধারণ মানষদের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পারবে সেদিন সব অভিমান ভুলে তোমার কাছে যাব।

হঠাৎ, মা মা ডাকে বিভীষণ চমকাল। ওই ডাক শোনা মাত্র সরমা মুখে চোখে লাবণ্য ফুটল। একটা খুশির দ্যুতি ফুটে বেরোচ্ছিল। স্নেহবৎসল মমতাময়ী মা তার বুকের ভেতর কথা কয়ে উঠল যেন। বলল : ওই আমার সেই পাগল ছেলে এসেছে। আর তো কথা বলার সময় পাব না তোমার সঙ্গে। এবার তোমাকে উঠতে হবে।

কথাগুলো বিভীষণের বুকে স্পন্দন তুলল। কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। কথা বলতে পারল না। বিরক্তিতে শুধু ভুরু কোঁচকালো। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। অনিচ্ছায় যাওয়ার জন্য উঠল। ওঠবার সময় মনে হলো সরমা ইচ্ছে করেই অপমান করল তাকে। ঘর থেকে বেরোনোর পথেই চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে দেখা হলো। দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। বিভীষণের দু'চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ বদমেজাজী মানুষটার দিকে চেয়ে রইল। ম্লান হেসে বলল: এখানেও তুমি!

চন্দ্রগুপ্ত হাসল। ছিপছিপে শরীর তারুণ্যে ছলমল করছে। চেহারায় এবং চোখের চাহনিতে একটা দুষ্টুমি খেলা করছিল। বলল : রোজ একবার মায়ের খোঁজখবর করতে আসি এখানে।

আমাকে দেখে তুমি অবাক হওনি।

অবাক হওয়ার কী আছে? মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো মিথ্যে নয়।

আমার অধিকারের উপর ভাগ বসিয়ে তাকে কেড়ে নিয়েছ তুমি।

একথা মা, আপনাকে বলেছে?

সব কথা বলতে হয় না। আমি জানি। আমার অধিকার তুমি ফিরিয়ে দাও।

মহারাজ অধিকার গায়ের জোরে জয় করা যায় না। অধিকার তো দখল করার জিনিস নয়। অবশ্য, সৈন্য-সামন্ত, কোতোয়াল দিয়ে রাজাদের অধিকার কব্জা করতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুকভরা ভালোবাসা, অসীম শ্রদ্ধা, আর অগাধ বিশ্বাস দিয়ে এই অধিকার কায়েম করে। এর জন্য গায়ের জোর দরকার হয় না। এক গভীর অনুরাগের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে থাকে এক গভীর তীব্র ভালোলাগা। যে ভালোলাগায় তার দাবি ও অধিকার জন্মে। যার ভাগ আর কাউকে সে দিতে রাজি নয়। অধিকার তখন মনের ব্যাপার হয়ে যায়। মনের আলোয় আভাসিত না হলে কোনো প্রাপ্যই অধিকার হয়ে উঠে না। বলতে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তর চোখের পাতা, কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়, মুখের ভাব পাল্টে যায়।

ঈর্ষায়, ক্রোধে, বিদ্বেষে বিভীষণের ভেতরটা হিংস্র হয়ে ওঠে। ভেতরের নিভন্ত

আগুনটা বাতাস পেয়ে দপ করে জ্বলে উঠল যেন। বলল: তোমার মা রসাতলে আমার একজন বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে এসেছেন। এখানকার সব খবর গোপনে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া তাঁর কাজ। নতুন করে তাঁকে পরামর্শ দিতে এসেছিলাম। তুমি সব দেখে ফেলেছ বলেই আমার ভয় সন্দেহ ও উদ্বেগ হচ্ছে; সরমার কাছ থেকে জোর করে কিছু জানতে চাইলে ফল ভালো হবে না। তোমার সঙ্গে এই রসাতলও শেষ হয়ে যাবে।

সরমা বিভীষণের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর কথাবার্তা শোনার জন্য দরজায় পাশে এসে দাঁড়াল। বিভীষণের অভিযোগ শুনে থ হয়ে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে নীরবে চেয়ে রইল তার দিকে। চোখ দুটোতে তার আতঙ্ক, উদ্বেগ, বিস্ময় এবং ক্রোধ ফুটে উঠেল। বিভীষণের এহেন অপ্রত্যাশিত আচরণ ও কথা তার ভেতরটা লজ্জায়, অপমানে কুঁকড়ে গেল। ঠকঠক করে কাঁপছিল সারা অঙ্গ। পর্দা সরিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল কিছু বলার জন্য। তার আগেই চন্দ্রগুপ্ত হাসি হাসি মুখে বলল : রাজন, পিতারা চিরদিন স্বার্থপর এবং দায়িত্বহীন। তাদের বুকে দরদ মমতা কম বলে ঔরসজাত বীরপুত্রকে পথের কাঁটা মনে করে হত্যা করতে তাদের কষ্ট হয় না। পৃথিবীতে সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কেবল পিতারাই। মায়েরা বড় ভালো। সৎ ও মমতাময়ী। সন্তানের জন্য ভাবনা চিন্তা কেবল মায়েদেরই থাকে। মায়ের মতো এমন নির্ভয় আশ্রয় এবং নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের জায়গা এই পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আপনার বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা এক্ষেত্রে সফল হলো না বলতে পারি। এ তো গেল বিশ্বাসের কথা। অবিশ্বাসের কথা হলো, কোনো চক্রান্তকারী নিরুপায় না হলে কখনো গোপন কার্যকলাপের কথা ফাঁস করে না। ক্রোধের বশে, আপনি একটা মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করে আমার কাছ থেকে মাকে কেড়ে নেওয়ার যে কূট কৌশল করেছেন তাও সফল হলো না। বিশ্বাসের রজ্জুতে আমরা পরস্পর বাঁধা।

বিভীষণ দাঁড়াল না। প্রতিকারহীন এক তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল যেন।

চন্দ্রগুপ্তর কথা শুনে বেশ হালকা ভারমুক্ত লাগে নিজেকে সরমার। জানলা দিয়ে হেমন্তের মধ্যাহ্ন রোদের উজ্জ্বল আলোয় নীল আকাশখানা অসামান্য হয়ে উঠেছে। গাছের পাতায় পাতায় হেমন্তের রোদের হিমেল আলো চুঁইয়ে পড়ছে অবিরত। পড়তে থাকবে সারা দিন। পেঁচারা হৈ-চৈ করে স্ফূর্তি করে গাছের ডালে। মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে যায়, আবার ফিরে এসে কিচির মিচির করে। ভীষণ ভালো লাগল সরমার।

চন্দ্রগুপ্ত ডাকল: মা, একটু জল দেবে। ঠাণ্ডা জল।

জীবনের অনেক গা শিউরানো ডাকের মতো সরমার সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। জীবনে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা ভালোবাসার, আর সামান্য একটু দৃশ্যমান নৈকট্যের। আর তাতেই বুকের ভেতর কী সব গলে যায়। চন্দ্রগুপ্তর আচমকা ডাকে তেমনি এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল সরমা।

মুখখানা আনন্দে মাখামাখি হয়ে গেল। উজ্জ্বল কালো দুই চোখ মেলে ধরল তার মুখের উপর। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললঃ আয় বাবা, ঘরে আয়।

॥ চোদ্দ ॥

বিভীষণের মন ভালো যাচ্ছিল না। এক বুক অশান্ত অস্থিরতা নিয়ে হাতের কাছে রাখা ভূর্জপত্রের উপর আঁকিবুকি কাটছিল। কোন কিছু মনে করে নয়, খেয়ালখুশিতে দাগ কাটছিল। দাগগুলো মিলিয়ে সরমার মুখ, মন্দোদরীর মুখ আঁকার চেষ্টা করল। কিন্তু কারো মুখ হলো না। একটা মুখ অবশ্য হলো কিন্তু তার চোখ নেই, মুখ নেই, ঠোঁট নেই নাক নেই। বিরক্ত হয়ে কলমটাই রেখে দিল। তবু ভালো লাগল না। বিছানায় টান টান হয়ে শুলো। চোখ বুজেল। নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে রইল।

সব কিছু যদি আবার প্রথম থেকে শুরু করা যেত তা-হলে মন্দ হতো না। কিন্তু তা হয় না বলেই যেটুকু পাওয়া হয়নি সেটুকুর জন্যই সরমার কাছে গিয়েছিল। গেলেই কি সব পাওয়া যায়? জীবনের অনেক চাওয়া, পাওয়ায় পর্যবসিত হয় না। পেয়ে যারা হারায় সত্যিই হতভাগা তারা। শুয়ে শুয়ে হাসল বিভীষণ। জীবনে কত কিছু তো চাওয়ার ছিল, কিন্তু তার কতটুকু পাওয়া হলো? যা পেল তা কি চেয়েছিল জীবনে? মন্দোদরীকে পাওয়ার জন্য কত কী করল, হাতের মুঠোয় পেল তাকে, তবু তার হলো কই? লঙ্কায় মানুষও তার কথা শুনল না। বরং তার প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, বিদ্বেষ নিয়ে লঙ্কাবাসী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল কী অবলীলায়। রাজা বলে পরোয়া করল না। এমন কি সরমাও তাকে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না। তার প্রতি মানবিক করুণাটুকুও নেই। তার দীর্ণ প্রার্থনাও সরমার কাছে সুখকর হয়নি। স্বামীকেন্দ্রিক সংস্কার, বিশ্বাসগুলিও তার মনকে নাড়া দিল না। সরমা পাষাণী অহল্যার মতো এক অন্য রমণী।

ঘৃণায় যন্ত্রণায় ঘুম আসে না বিভীষণের। এপাশ ওপাশ করে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। অন্ধকারে জোনাকি পোকা উড়ছে। হেমন্তের মিষ্টি, শীত শীত গন্ধ তাদের গায়ে। গাছের ডালে পাখিরা ভালোবাসার ঝাপ্টা ঝাপ্টি করছে। সপ্রেমে গভীর গাঢ় স্বরে ডাকছে রাতজাগা পাখি। তাতে বিভীষণের দুঃখ, যন্ত্রণাটা আরো গভীর হলো। জীবনে সে বাঘ হতে চেয়েছিল। বাঘের মতো দাপিয়ে বেড়াবে নির্ভয়ে। বাঘের কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, শুধু খিদে আছে। শুধু জৈবিক খিদে নিয়ে বাঁচা বাঘের মতো শক্তিশালী প্রাণীর পক্ষে সম্ভব। সমাজবদ্ধ মানুষের ছোট্ট পরিধির ছোট্ট জীবনে প্রেম ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, দয়া করুণা নিয়ে বাঘ হওয়া কখনো সম্ভব হয় না। একঘেয়ে গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একবস্তি ঐ সুখের রাজ্যে বিচরণ করা মানুষের অধিকারের সীমা। বড় দেরি করেই কথাগুলো বুঝল। সময়ের ভেতর ভুল না শোধরালে সে ভুল নিয়ে অনুশোচনা করা, মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। এসব জেনেও মন খারাপ

হলে মনের মন কী করবে ভেবে পায় না। মনের ভেতর ঝড় উঠে। সব এলোমেলো করে দেয়। ভবিতব্য একেই বলে।

নইলে, সরমা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে কেন? নীলকণ্ঠ নগরের মানুষেরা রাজার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে কার ভরসায়? তাদের ঔদ্ধত্য, স্পর্ধার কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা রাগে, অপমানে গরগর করে। মুখ বুজে এই অসম্মান এবং অবহেলা সহ্য করা কিংবা মেনে নেওয়াই হবে তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি অসম্মানজনক। রাজার পরিচয় তার রাজ-ক্ষমতায়। রাজা হলো দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় রাজা শক্তিশালী। জনতা রাজাকে ভয় করে না, তার প্রতাপ ও শক্তিকে সমীহ করে। রাজদণ্ডের ভয়ে মান্য করে তাকে,— যে পুজোর যে মন্ত্র।

বিভীষণের মনে হলো বেকুবের মতো চারপাশের মানুষের মঙ্গল চেয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল তার হৃদয়টা বিশাল। মহীরুহের মতো সে সকলকে ছায়া দেবে, আশ্রয় দেবে, খিদে মেটানোর আহার দেবে। সব ঝড়-ঝাপ্টা নিজে সহ্য করে বুক দিয়ে তাদের আগলাবে। কিন্তু পারল কি? রাজা হওয়া থেকে অনবরত পথ হাতড়ে বেড়াল, তবু মানুষের ভালো হলো কই? লঙ্কার মানুষ তো তার পাশে এসে দাঁড়াল না। তারা শুধু প্রতিকার চায়। কিন্তু না পেয়ে একদিন বিরক্ত হয়। তাদের বিরক্তি বিভীষণের প্রাপ্য মনে হয়। কারণ, যাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় শাসনকার্য চালাতে হয় তাদের উপর বেশি নির্ভর করার মূল্য একজন রাজাকে এভাবেই দিতে হয়। কারণ তারা তার দুর্বলতার সবটুকু জানে। নেপথ্য থেকে প্রতিক্ষণ তার দুর্বলতা নিয়ে খেলছে। ভাগ্যের স্রোত তাদের দিকে বইছে। সে চলেছে পরাজিত উচ্চাশার ভগ্নাবশেষ নিয়ে। মনের কোণে জমে থাকা এই বিষাদের সঙ্গে খানিক ক্লান্তি মনের বেশিরভাগ শক্তি অপচয় করছে।

জানলা দিয়ে নিস্তব্ধ রজনীর শান্ত আকাশ অসংখ্য তারায় ঝলমল করছে। মনে হলো দেবতারা লক্ষ চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি ঝট করে একটা তেলাপোকা ধরল; মুখে নিয়ে তাকে ঝাপ্টায় আর একটু করে মুখের মধ্যে ভরে ফেলতে লাগল। অনেকদূর থেকে কুকুরের আকুল কান্নার ডাক ভেসে এল। বুক কেঁপে উঠল বারবার। ভেতরটা কেমন ঝিমিয়ে এল। সে আর ভাবতে পারছিল না। এক বিপন্ন অসহায়তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে যে সত্যিই কত দুর্বল, একা এবং ক্ষমতাহীন মনে হতে বুকখানা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল যেন। কেমন একটা অবসন্নতায় তাব চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে। নিজের অজান্তে একসময় চোখের পাতা দুটো বুজে গেল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখল, সোনার লঙ্কার মানুষেরা সব কিম্ভূতাকার প্রাণী হয়ে গেছে। কেউ মানুষ নেই। নরকের দ্বার ভেঙে পঙ্গপালের মতো তারা লঙ্কার রাজপ্রাসাদের

দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। বিশাল দাঁত এবং নখ নিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। দেহরক্ষীরা কেউ নেই। প্রাণের ভয়ে তারা আগেই পালিয়েছে। বিভীষণের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে বিপন্ন হতে চায় না। অদ্ভুত আকৃতির মানুষগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। সে একা। তার পাশেও কেউ নেই। বড় বড় দাঁত বের করে, তীক্ষ্ণ নখ উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। বিভীষণ পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে তাকে ঘিরে একটা ঘেরাটোপ তৈরি হয়েছে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে দেহরক্ষী এবং প্রহরীদের ডাকল। কিন্তু ওরা তখন তবু কেউ দৌড়ে এল না। মরণভয়ে ভীত বিভীষণ আত্মরক্ষার জন্য ওদের করুণা চাইল। কিন্তু ওরা তখন অত্যন্ত হিংস্র ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। নগরের অদ্ভুত কিম্ভূতাকার কালো দানোরা একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাঁত এবং নখ বসাল শরীরে। মুহূর্তে তাদের হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল শরীরখানা। রক্তের উপর শুয়ে আছে সে। তীব্র যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে উঠল। তাতেই ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখল দানোরা নয়, সম্পাতি দাঁড়িয়ে আছে।

বিভীষণ কিছু বলার আগে সম্পাতি বলল : ভোর হয়ে গেছে। চারদিকে আলো ফুটেছে। তবু বিকট গলায় আপনি চিৎকারে করে উঠলেন। কী হয়েছে ? অমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে দেখছেন কী ? আপনার হয়েছে কী ?

ঘুমের ঘোর কাটতে বিভীষণের কিছুক্ষণ সময় লাগল। কিন্তু স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া চলেছে মনের ভেতর। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল : আমি একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

কী দেখেছেন ?

স্বপ্নে দেখলাম নগরের মানুষগুলো আর মানুষ নেই। সব দানো হয়ে গেছে। বিশাল নখ দিয়ে আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। উঃ সে কী ভয়ানক দৃশ্য।

স্বপ্ন সত্যি হয় না। মনের ভয়, ভূত হয়ে তাড়া করছে।

না, সম্পাতি। স্বপ্নের খোক্কস, দৈত্য, দানো আমাকে টেনে হিঁচড়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে নিমেষে একদলা মাংসপিণ্ড করে দিল। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারছি না। সম্পাতি, আমার বড় ভয় করছে।

সম্পাতি নিস্পৃহভাবে বলল : এ হলো আপনার মনের বিবিধ প্রতিক্রিয়া। এর কোনো চিকিৎসা নেই। মন থেকে আবোল-তাবোল চিন্তাগুলো তাড়াতে পারলে আপনি ফের সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ অসুখ যার হয় প্রবল আত্মক্ষয় মেনে নিতে হয় তাকে।

সম্পাতি বিষে বিষক্ষয় যদি হয় তবে আমি ভয় দিয়ে ভয় তাড়াবো। যারা দুশ্চিন্তার কারণ তাদের নিশ্চিহ্ন করলে আমার কোনো চিন্তাই থাকবে না। যতক্ষণ টিঁকে আছি ততক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে নিজের চারপাশে দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের বেড়া দেব। সম্পাতি তুমি চুপ করে আছ কেন ? কথাটা তোমার মনঃপুত হয়নি বোধ হয়। তুমি চুপ করে

থাকলে আমি ভয় পাই বেশি। আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয় তখন।

রাজন, আপনার মন ভালো নেই। প্রতিদিন বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেন। আপনার বিশ্রাম চাই। আমি থাকলে বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।

কথাগুলো বলে সম্পাতি হন হন করে চলে গেল।

সম্পাতি কিছু না বললেও বিভীষণ জানে, কীভাবে দেশের লোক ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। একা থাকলেই ওকে চিন্তা পেয়ে বসে। মনের মধ্যে সরমার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত তোমার চোখে একজন বিদ্রোহী। কিন্তু ওর দেশপ্রীতি, তোমার দেশপ্রীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ও শুধু ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। তোমার কাছে দেশের মানুষের ভালোর জন্য আবেদন নিবেদন করে কী অন্যায় করেছে? ওর অপরাধ কী? মানুষের ভালো চাওয়া, দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং মানুষের অবস্থার পরিবর্তন চেয়ে কী অন্যায় সে করেছে?

সে রাজদ্রোহী।

হাসল সরমা। বলল: নিদ্রিত রাজাকে ঘুম ভাঙানো তার অপরাধ। কিন্তু রাজা যা করতে চাইছেন, অথচ পারছেন না, সে কথাটা মুখে বললে রাজার সন্ত্রমহানি হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে বিদ্রোহ করা বলে না। সে রাজাদেশ অমান্য করেনি। বরং তোমার আদর্শ, বিশ্বাস এবং নীতির সফল রূপায়ণ করতে তোমার পাশে দাঁড়াতে চায়।

বিভীষণ একটু চুপ করে থেকে বলল: আমার পাশে দাঁড়ানোর মানুষের অভাব নেই। তাকে নতুন করে দরকার হবে না। বরং তাকে এই প্রশ্ন কর, মানুষের পরিবর্তন হলেই কি ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়? ঘাড় নাড়িয়ে বল: বোধ হয়, হয় না। কারণ এক রাজা যায়, আর এক রাজা আসে। চন্দ্রগুপ্ত নিজে রাজা হলেও তার চাওয়ার মতো সব পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। মুখে বলা আর কাজে করে দেখানো দুটো এক জিনিস নয়।

সরমা বলল: অনেক সময় পেয়েছ, তবু কী করলে? যা করলে, দেশের নব্বই জন লোকের তা কাজে লাগল না। তাকে উন্নতি না বলে অবনতি বলা ভালো। অর্থের বিত্তের অপচয়-কয়েকজন লোককে বড়লোক করেছে। তুমি তাদের কেনা হয়ে গেছ। এক অলিখিত দাসখৎ লিখে দিয়েছ তাদের হাতে। তাই, ব্যবস্থার পরিবর্তন এখন তোমার হাতে নেই। ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এখন রক্ত চাই।

সরমা তা-হলে এই ষড়যন্ত্রের মূলে তুমিও আছ?

সরমা বাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে হাসল। বলল: ষড়যন্ত্র কোথায়? রাজাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলাকে কেউ ষড়যন্ত্র বলে? দেশের মানুষ রাজাকে তাদের মধ্যে পেতে চায়। সেই চাওয়ার প্রতি আমার সমর্থন থাকলেও, আমি তোমার পক্ষে নেই।

রামচন্দ্রের রাজ্যে শম্বুকও ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিল। রাজরোষে তার জীবন হারাতে হয়েছে। আমিও শ্রীরামের পথ অনুসরণ করে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করব।

বিভীষণের কথা শুনে সরমা চমকায়নি। আতঙ্কে শিউরে ওঠেনি। কাঁদেনি, তিরস্কার করেনি, কিংবা তার জন্য কোনো প্রার্থনাও করেনি। এমন কি তার প্রাণভিক্ষাও চায়নি। সরমার মুখে কিংবা চোখের তারায় তার জন্য কোনো উদ্বেগ ফুটে উঠেনি। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটল অধর কোণে। বিভীষণই আশ্চর্য হলো। প্রিয়জনের হত্যার কথা ঘোষণার পরেও সরমা এমন নির্বিকার থাকল কী করে? সরমার অটল ধৈর্য ও স্থৈর্যর মধ্যে এ কোন সরমাকে দেখছে? চিরচেনা সরমার রূপই বদলে গেছে যেন।

নাও শরবৎ খাও-বলে, মন্দোদরী হঠাৎ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল বিভীষণের মুখের সামনে। তাতেই সে চমকে উঠল। আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। মন্দোদরীর চোখের ওপর বিষণ্ন দুটি চোখ পেতে রেখে হাত বাড়িয়ে শরবতের গ্লাস নিল। মৃদু হাসল মন্দোদরী। ঐ হাসি তাকে রহস্যময়ী নারী করে তোলে। বিভীষণ উপভোগ করল সেই মধুর মুহূর্তটি। ভাগ্যিস দুঃস্বপ্নটা দেখেছিল তাই মন্দোদরীর সঙ্গে দেখা হলো। মন দিয়ে অনুভব করল, মন্দোদরীও নিজের অজান্তে তার আপনজন হয়ে উঠেছে। নইলে যে কাজ পরিচারিকারা করত সেই কাজটা নিজের হাতে করল কেন?

বিভীষণ ইচ্ছে করেই শূন্য গ্লাসটা নিয়ে পরিচারিকাকে দিল। গভীর তৃপ্তিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মন্দোদরী কি এখন থেকে তার জীবনে তেমনি নারী হবে যেমনটা একজন পুরুষ চায়। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্য বাকি দিনগুলো এমনি করে তার কাছে থাকবে কি? হঠাৎ মন্দোদরীর মাথা জড়িয়ে ধরে চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে তার ঘ্রাণ নেয়। হাস্নাহানা ফুলের সৌরভ ভরে আছে কেশে। চুলের ভেতর মুখ ঘষে আর বলে, কী ভালো লাগছে! আমার সব অসুখ সেরে গেছে। এই ফুলের সুবাসের পথ ধরে দৈত্য-দানোর বদলে স্বপ্নের পরীরা নেমে আসবে আমার ঘুমের মধ্যে। পরীরা কথা বলে না শুধু হাসে তোমার মতো। রহস্যময় হাসি। একটুতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় ঠিক তোমার মতো। মন্দোদরী তোমার হাতখানা হাতে রাখ। আমার বড় ভয়। সব সময় মনে হয় কোথায় যেন ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। লঙ্কা-যুদ্ধের মতো এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে আর্তনাদ। পালাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। আমার শরীরে অবশ হয়ে গেছে যেন। হাজার হাজার লোক রাবণের চিতার আগুন থেকে মশাল ধরিয়ে নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। নগরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। হাজার হাজার মানুষ আমাকে ঘিরে ধরেছে, শতচ্ছিন্ন পোশাক তাদের, নগ্ন পা ফেটে রক্ত ঝরছে, দু'চোখে ওদের ক্রোধের আগুন, দেহ থেকেও রোদের মতো তাপ বেরোচ্ছে। উত্তোলিত হাতে ধরা আগুনের মশাল। মশালের আলোয় মানুষের ছায়াগুলো প্রেতের মতো নৃত্য করছে, উল্লাসের নৃত্য। এক সময়

মশালগুলো সব নিবে গেল। ভস্মাচ্ছাদিত আমার দেহের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লক্ষ মানুষ। তাদের পায়ের তলায় লেগে থাকে ছাই। সে ছাই পায়ে পায়ে ছড়িয়ে গেল গোটা লঙ্কায়।

মন্দোদরী ওর মাথাটা যত্ন করে বুকের উপর টেনে নিল। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল : মা-ঠাকুরমা গল্প বলতেন, তারপর রাজপুত্র খাপ থেকে তরবারি বার করে দৈত্য-দানোদের মেরে ফেলে দিয়ে কন্যাকে মুক্ত করল। তারপর ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল রাজপুত্র আর রাজকুমারীর। তোমার তা-হলে ভয় কিসে? ঘাবড়াবে না মোটে। বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। তোমার মনের গোলকধাঁধা তোমারই তৈরি। অথচ, তুমি জান না কী করে সেখান থেকে বেরোতে হয়।

ঠিক বলেছ। আমি এক গোলকধাঁধার মধ্যে বাস করছি। আমার পাপের আর অপারাধের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় এইভাবেই পরিশোধ করতে হবে। নিজেকে নিয়ে আমি এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছি।

মন্দোদরী ওর মুখের উপর মাথা রেখে বলল : আমি কিন্তু তা মনে করি না। অনুতপ্ত হৃদয়ের গ্লানির সঙ্গে তোমার অভিমান মিশে একটা কাল্পনিক ছবি তৈরি হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে তার আতঙ্কটা নানারকম মূর্তি নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ক'দিন বিশ্রামে থাকলে আবার ভালো হয়ে উঠবে।

মন্দোদরীর চোখে চোখে রেখে বলল : না। এভাবেই আমি রোজ নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছি। হারিয়ে যেতে থাকব তোমার চোখের উপর। তাতেই আমার সুখ।
তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললঃ ও! কী ভয়ানক একা! ধূ ধূ প্রস্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি যেন একা। রোদে দেহ পুড়ে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে— কোথাও যে বসে একটু জিরিয়ে নেব তার ছায়াটুকু নেই। শুধু পুড়ে যায় পায়ের নিচে মাটি!

মন্দোদরী একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিভীষণের দিকে। আস্তে আস্তে বলল : মানুষের মনটা তারের বাজনার মতো। ঢিলে হয়ে গেলে একবার, বেসুরো বাজে। তখন শক্ত হাতে কান মোড়া দিয়ে নতুন করে সুর বাঁধতে হয় তারে। তেমনি মনটাকে শক্ত করে সম-এ না আনতে পারলে এলোমেলো হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যায়ও। তবু এই ভেবেই অশান্ত মনকে শান্ত করে বলতে হয় রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। কিছুই হারায় না , জীবনে, পাওয়ার ঘরে থরে থরে সব সাজানো আছে। মাঝে মাঝে মনের ভুলে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হয়।

মন্দোদরী!

ভাবতে মজা লাগে, একজন না পসন্দ মানুষের সঙ্গে আমার পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা না-লাগা যে এমন করে হঠাৎ জড়িয়ে যাবে একটা বিশেষ ক্ষণে কখনও

ভাবিনি তা। তুমি সত্যিই ভীষণ খারাপ। নিজের জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি তো খেললেই, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিলে।

বিভীষণ চুপ করে মন্দোদরীর দু'চোখের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না। মন্দোদরীর চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল বিভীষণ যেন একটুও চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয়। চোখে চোখ রেখে বলল, চাঁদও তো থাকে আকাশে। কিন্তু আমার জীবনে চাঁদ থেকেও কবে যেন চুরি হয়ে গেছে। আমার স্বপ্নের চাঁদ মরে গেছে। কেবল তার কলঙ্কটা লেগে আছে আমার গায়। ছেলেবেলায় মার কোলে বসে শোনা চরকা বুড়ির সেই রহস্যময়ী চাঁদ নাগালের বাইরে আজও রয়ে গেল। স্বপ্নেও তার হাতে হাত রাখা হলো না। নিবিড় ঘুম পাওয়া স্বপ্নে চমকে চেয়ে দেখি নীল আকাশে চাঁদ অনেক পাহাড়, নদী, মাঠ পেরিয়ে ভালোবাসা মুখে করে মেঘের নায়ে ভেসে যাচ্ছে।

মন্দোদরী জবাব দিল না কোনো। ওর চোখে চোখ রেখে মনে মনে বলল : মানুষের যেহেতু মন বলে একটা জিনিস আছে তখন মনের রোগে তাকে ভুগতে হবে। নইলে, অন্যায়, অধর্ম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কী করে ?

॥ পনেরো ॥

সটান বসার ঘরে এসে বসল চন্দ্রকান্ত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ফুলদানিতে তাজা ফুলের গোছা। সকালবেলাতেই বাগান থেকে এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মিষ্টি সুবাসে ভরে আছে ঘরখানা। বুক ভরে শ্বাস নিল চন্দ্রকান্ত। তবু উদ্বেগ যায় না। মনের অশান্তি কাটে না। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবি চন্দ্রকান্তর নজর কেড়ে নিল।

মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা মানুষ। মাটিতে তার ছায়া পড়েছে বিশাল হয়ে। পথের এপাশ ওপাশ জুড়ে বিস্তৃত সে ছায়া। রাস্তার দুধারে গাছেরা চেয়ে আছে নীরব বিস্ময়ে। কৌতূহলী মানুষ রাস্তার দু'পাশে জড়ো হয়েছে বিশাল ছায়া দেখার জন্য। ভিড়ের মধ্যে মুখ উঁচু করে কেউ কেউ দেখার চেষ্টা করছে, শিল্পী তাকেও বাদ দেয়নি ছবি থেকে। মানুষের মাঝ দিয়ে পথ করে যে মানুষটা সূর্যোদয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তার চেয়েও বড় তার ছায়া। দর্শকদের গায়েও পড়েছে সে ছায়া। ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, বিরাট ছায়া দর্শকদের গায়ের উপর পড়েছে। ঐ ছায়া ছোঁয়ার জন্য সকলে হাত বাড়াচ্ছে। হাত কেবলই বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে।

চন্দ্রকান্ত ছবির মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল। ওই মানুষটি কে ? এক স্বপ্নের মানুষ শিল্পীর ভাবনায় বড় হয়ে উঠেছে। যে মানুষ অন্ধকার থেকে সূর্যের আলোকিত প্রান্তরের দিকে নিয়ে যায় সে। মনের আগুনে ধরানো মশাল হাতে নিয়ে সে মানুষ অনন্তকাল

ধরে ছুটছে। মশালের আলো পড়ে অন্ধকার শুধু আলোকিত হয়নি তার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে নগর। আগুনের সে শিখা গ্রাস করেছে তার অনুপম প্রসাদ 'শিল্পম'।

চুরির আওয়াজে তার মগ্নতা ভঙ্গ হলো। চিত্র থেকে দৃষ্টিটা সরমার দিকে ফেরাল। কোনো ভূমিকা না করে বলল : সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া গ্রামগুলিই দেখতে এসেছিলাম। এতদূর এসে আপনার খবর না নিয়ে ফেরাটা ভীষণ অন্যায় হতো। আমার বিবেকই আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলল।

সরমা নিরাবেগ চিত্তে নিস্পৃহভাবে জিগ্যেস করল : কী দেখলেন ?

অসংখ্য লাশ এবং বিধ্বস্ত জনপদ দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভাবতে পারিনি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে এমন করে সমৃদ্ধ লোক বহুল জনপদ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। মনেই হয় না এখানে কোনো দিন জনবসতি ছিল। গোটা অঞ্চলটা শ্মশান হয়ে গেল। আপনার সাজানো জনপদ সমুদ্রের জলে ভেসে গেল।

শেষ কথাটা সরমার দু'কান ভরে রইল। চন্দ্রকান্ত ইচ্ছে করেই তাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করল। এই কথাগুলোই কদিন ধরে শুনতে শুনতে তার সঙ্গে গেছে। খারাপ লাগলেও মন পীড়িত হয় না। হাঁসের ডানা থেকে ঝেড়ে ফেলা জলের মতো ঐ কষ্টটা ও দুঃখটা সরমা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। ক্রমাগত বিভিন্ন মানুষের শুকনো সহানুভূতি এবং সমবেদনা শুনতে শুনতে সে অহল্যার মতো পাথর হয়ে গেছে। এই মানুষগুলো সহানুভূতির সঙ্গে নিজের দুঃখের কথা উজাড় করে বলতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এসব কথা শুনতে ভালো ভালো লাগে না তার। চন্দ্রকান্তর কথাগুলো একটু অন্যরকম লাগল।

মনের বিরক্তির ভাবটা চট করে লুকোনোর জন্য বলল : মানুষের মৌখিক নীরস সহানুভূতি আর সমবেদনা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নতুন কোনো কথা থাকলে বলুন।

দেবি, একজন সামান্য বণিক এবং রাজকর্মচারী হয়ে যা করতে পারি তা হলো দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো। বিধ্বস্ত বাসস্থানগুলো নতুন করে তৈরি করে দিতে চাই। আপনার অনুমতি পেলেই আমার লোকেরা কাজ শুরু করতে পারে।

সরমা এরকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাবের জন্য তৈরি ছিল না। তাই চটজলদি কোনো জবাব দিতে পারল না। একটু সময় নিয়ে বলল : বাসস্থানের চেয়ে দরকার তাদের খাবার। শুনতে পাই মহারাজ বিভীষণ দেশের মজুত খাদ্য ভাণ্ডার থেকে বস্তা বস্তা খাদ্য পাঠাচ্ছেন। কিন্তু একটা বস্তাও দুর্গত এলাকার মানুষেরা পেল না। এ এক মজার ব্যাপার। দেশে ধেড়ে ইঁদুরের খুব উপদ্রব বেড়ে গেছে। তারা নিমেষে বস্তা বস্তা খাদ্য খেয়ে ফেলে। খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে ইঁদুরের উৎপাত।

চন্দ্রকান্ত হাসল। বিমর্ষের হাসি। বলল : সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে ওঝার বাপের

সাধ্য নেই ভূত ঝাড়াবার। সে যাই হোক, বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য পাওয়ার তদ্বির তদারক করছে শিল্পকান্ত। কী করলে লোক পটিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হয় শিল্পকান্ত ভালোই জানে। ওই পারবে দক্ষতার সঙ্গে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে। কিছু কিছু সাহায্য এসেছেও।

সরমা নীরবে শুনল। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আস্তে আস্তে বলল : প্রয়োজনের সময় সাহায্য এসে পৌঁছয় কই ? সাহায্যের নামে যা কিছু দুর্গত মানুষদের জন্য পাঠানো হলো তা এক শ্রেণীর মানুষ বিলি ব্যবস্থা করে বড়লোক হয়ে গেল। শুনতে পাই মোটা টাকার লেনদেন হচ্ছে। চোরাকারবারের ব্যবসা তো রমরমা। কেউ প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ কার কাছে করবে ? দেশের সব কিছু একশ্রেণীর মানুষের হাতের মুঠোয়। কারো কাছে প্রত্যাশার কিছু নেই।

কিন্তু জনগণ তো আপনার কাজে ভীষণ খুশি।

আমি কিছুই করিনি। দুর্গত এলাকাতে যাইনি। দেশের মানুষকে ভালোবেসে একা চন্দ্রগুপ্ত সব করছে। নিজ নিজ চেষ্টায় যে একটা দেশের হাল ফেরানো যায়, এ দেশের মানুষ আগে জানতো না। অল্প ক'দিনের ভেতর এ অঞ্চলের মানুষ তাদের জীবনের এত উন্নয়ন আগে দেখেনি। কী করেনি তারা! বাঁধ বেঁধেছে। রাস্তাঘাট মেরামত করে চলাচলের মতো করে নিয়েছে। নারকেল পাতা দিয়ে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইও করে নিয়েছে। কত বলব আর ? যাঁরা শাসক তাঁরা এই সময়ের ভেতর কতটা গুছিয়ে নিতে পারে তার ভাগ বাঁটোয়ারা ও বখরা নিয়ে কোন্দল করছে। কাজের কাজ তাদের দ্বারা কিছু হচ্ছে না। বরং, যা জনগণের শ্রমে তৈরি হলো, একশ্রেণীর ঠিকাদার কাজ না করেই সংস্কারের নাম করে ঐ টাকা আত্মসাৎ করল।

এরকম একটা অভিযোগ শুনে চন্দ্রকান্ত হাসল। অধরে তার চতুর হাসি। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল: আপনাদের উপর ভগবানের অশেষ কৃপা এবং করুণা। আপনার কোনো আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখবেন না তিনি।

বিরক্তিতে সরমার দুই ভুরুর মাঝখান কুঁচকে যায়। বলল: জনতার আকাঙ্ক্ষা জনতাই পূর্ণ করেছে। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। জনতাই ভগবান। ঈশ্বরের শক্তি তাদের। একই সঙ্গে শিব ও রুদ্র। গড়তেও পারে, ভাঙতেও পারে। ক্ষমতার উৎস এই জনগণ। তারা যা চায়, তা হবেই একদিন।

চন্দ্রকান্ত বিস্ফারিত চোখে সরমার দিকে তাকাল। মনে হলো সরমার ভেতর সে এক ডাইনী দেখছে। কী ভয়ঙ্কর তার চাহনি। গোল গোল দুই চোখের ধারাল দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। বুকের ভেতরটা কেমন অবশ হয়ে আসে। ভয়ে ভয়ে চন্দ্রকান্ত অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সরমা তার বিব্রত বিহ্বল অবস্থা দেখে স্মিত হাসল। বলল: ধনপতি সওদাগর এখনও সময় আছে। জীবনে তো অনেক টাকা করেছেন এবার একটু অন্যদের দিকে

চোখ খুলে তাকান। নিজের দিক থেকে সাধারণ মানুষের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন নগরের সাজানো গোছানো সৌন্দর্যের নিচে চাপা পড়ে গেছে শরীরের হাড়ের সঙ্গে চামড়া জড়ানো মানুষের কঙ্কাল। তাদের দরদে মরে যাচ্ছে বিত্তবানদের হৃদয়। তবু মানবিক মূল্যবোধে কেউ তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না নিঃস্বার্থভাবে। একটা স্বার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে মানবিক কর্তব্যবোধে পাশে দাঁড়ানোর এক নির্লজ্জ নাটক করে। এই নাটকের জন্য অভাবী মানুষদের ভিক্ষের হাত দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। এদের ভবিষ্যৎ কী ? জৌলুসের যোগান দিতে দিতে জনতার জীবন ওষ্ঠাগত হচ্ছে। পাওনা করের বোঝা বড় হচ্ছে। কাকে কর দিচ্ছে; দেশের মানুষ কেন কর দিচ্ছে — এপ্রশ্ন করে না তারা। সাহায্যের নামেও যা আসে তা তো কয়েকজন মানুষের গর্ভে চলে যায়। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে।

হাসল চন্দ্রগুপ্ত। রহস্যময় হাসি। বলল : দেবি, জনতার কিছু নেই। কোনো কালে ছিল না। তারা জানে না কী তারা চায়, কাকে চায়, কেন চায় ? এভাবেই তারা যুগ-যুগান্ত ধরে টিঁকে আছে। আরো আনন্তকাল ধরে থাকবেও। ওদের নিয়ে চিরকাল রাজনীতি হয়ে আসছে। রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে ওরা চিরকাল হার জিতের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। বিশ্বাস করে ঠকে। তবু ওদের অবস্থার হের ফের হয় না কোনো। চন্দ্রগুপ্তও পারবে না ওদের অবস্থা ফেরাতে। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে। ক্ষমতায় আসার আগে সকলেই দুর্নীতির কথাগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর নিজেই একদিন দুর্নীতির পাকে পাকে ফেরে ফেরে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে তখন মনে করে এটাই তার ঠিক কাজ।

সরমা বিরক্ত হলো চন্দ্রকান্তর কথায়। বলল : এখানে চন্দ্রগুপ্ত কেউ নয়। তাকে বোঝার শক্তি আপনাদের কোনোদিন হবে।

দেবি, আমি কিন্তু কারো গুণগান শুনতে আসিনি। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছি। নিরাশ্রয় গৃহহীন মানুষগুলোর একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য মনে হয়েছে।

আপনার ভাবনা খুব স্বচ্ছ। আপনার কাজের জন্য আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। আপনি বিবেচক। তাই উপলব্ধি করেছেন খাদ্যবস্তু খেয়ে ফেললে মনে রাখার মতো আর কিছু থাকে না। কিন্তু যে গৃহে সে রোজ থাকবে, সে গৃহ যে আপনার অর্থানুকুল্য দিয়ে তৈরি একথাটা সর্বক্ষণ আপনার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ করে রাখবে। আপনার ঋণ তাদের অপরিশোধ্য মনে হবে। সারা জীবন ধরে তাঁরা আপনার কথা মনে রাখবে। তাদের হৃদয় জয়ের এতবড় সুযোগ আপনি হাতছাড়া করতে রাজি নন। একসঙ্গে রাজা এবং জনতাকে কিনে নেওয়ার ক্ষমতা আপনারই শোভা পায়। এভাবেই কৌশলে জনতাকে বোকা বানিয়ে তাদের মনকে বদলে দিয়ে আপনারা নেপথ্য থেকে দেশ চালাচ্ছেন। দেশ শাসনের নেপথ্যে আপনাদের এই ভূমিকা তো

অন্যদের জানার কথা নয়। তারা শুধু আপনাদের উপকার পেয়ে ধন্য হয়ে যায়। দুর্দিনের এতবড় উপকারটা ভোলে কেমন করে? বলেই সরমা নিজের মনেই শব্দ করে কাষ্ঠ হাসল।

চন্দ্রকান্ত ক্ষুণ্ন চিত্তে বলল : আপনি আমাকে বিদ্রূপ করছেন?

একদম না। দুঃস্থ, গরিব মানুষ থাকা আর না থাকার জন্য কোনো মাথা ঘামায় না। ওদের কাছে যে কোনো উপায়ে বেঁচে থাকাটা খুব সহজ ব্যাপার। ভাবে আমার আপনার, মতো লোক। যত সব বাজে ভাবনা। ওরা যা চায় তা হলো দু'মুঠো ভাত আর কবে এদেশে সুদিন আসবে?

সরমা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল এই কথাগুলো বলার সময় চন্দ্রকান্ত ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নিজেকে সংযত করে বলল : আজ আমি উঠি। আপনার অনুমতি পেলেই কাজ শুরু করব।

আমি কে? এই রাজ্যে কোথায় কী হবে, তার অনুমতি দেবার কে আমি? অনুমতি দেবেন এদেশের রাজা বিভীষণ। আর যারা আপনার কৃপা নেবে তারা। আপনি মিছেই আমাকে জড়াচ্ছেন। আমাকে প্রাধান্য দিয়ে একসঙ্গে দেশের রাজা এবং আমাকে অপমান করছেন।

দেবী!

মাননীয় চন্দ্রকান্ত, এদেশের মানুষের সত্যি কোনো ঘর আছে? যে ঘর আছে তা বাসস্থান, সত্যিকারে ঘর হয়ে উঠেনি। ঘরে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; স্বস্তি কোথায়? গাছের তলায় বাস করা আর ঘরে বাস করা দুটোই সমান তাদের। জলোচ্ছ্বাসে যাদের ঘর বাড়ি মুছে গেল তাদের ভাগ্যে ঘর জোটেনি। তাই ওরা যা হারাল তার জন্য ওদের কোনো দুঃখবোধও নেই।

অপমানে চন্দ্রকান্তর মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। নিঃশব্দে প্রস্থানের জন্য উঠল। শুধু বলল : যাচ্ছি।

প্রস্থানের সময় তার মুখখানা ভীষণ নির্দয় হয়ে উঠেছিল। সরমার ভেরতটা অমঙ্গল আশঙ্কায় আঁৎকে উঠল। কিছুক্ষণ আগে চন্দ্রগুপ্তর বিশ্বস্ত এক কর্মীকে নির্দয়ভাবে ঠাণ্ডামাথায় খুন করে, খুনী তার স্ত্রীকে খবর দিয়েছিল। লাশ পড়েছিল মাঠের মাঝখানে। লাশের উপর গাছের ছায়া ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে খেয়েছে। শকুন খুবলে খেয়েছে তার চোখ, কলজে, নাড়ি-ভুঁড়ি। উৎকট পচা গন্ধ ছিল চারদিকে। উঃ কী ভীষণ বীভৎস সে দৃশ্য। কল্পনায় সরমা তা দেখতে পাচ্ছিল। ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করল। থর থর করে শরীর কেঁপে উঠল। এই দেশেই এত কিছু এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। একেই বলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া। পিছনের আর কোনো জায়গা নেই। চন্দ্রগুপ্তর ঐ সহকারীর অপরাধ দেশের গরিব মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মাথা ঘামাত। দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসত।

বিভীষণের শাসনের অবসান চেয়েছিল। এই অপরাধে তাকে মরতে হলো কী ? অন্যদের সাবধান করা এবং মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তোলাও এর আর এক উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ও সব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তার সাফ কথা হলো, কে, কীভাবে মরল, কেন মরল সেটা কোনো গবেষণার ব্যাপার নয়। এটা একটা খুন। আমরা আক্রান্ত। এ থেকে মনে হচ্ছে, আমরা ঠিক পথে চলেছি। শত্রুকে সঠিক জায়গায় আঘাত করেছি। অন্ধকারের পেঁচা দিনের আলো সইতে পারে কখনো ? ওই মৃত্যু আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিল। সঠিক পথের হদিস দিয়েছে। ওই খুনের বদলা আমরা নেব।

কথাগুলো স্মরণ করে সরমার শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। চন্দ্রগুপ্ত যাই বলুব, ওই বীভৎস মৃত্যু তার বিশ্বাসের ভিত নাড়া দিয়েছে। সবসময় ভয়ে তার গা ছমছম করে। চন্দ্রগুপ্তর জন্য সরমার দুর্ভাবনা হয়। অতর্কিতে কখন কী হয়, এই আতঙ্কে সর্বক্ষণ আধমরা হয়ে থাকে। একা থাকলে আরো ভয় করে। পাশের ঘরে চন্দ্রগুপ্তকে ঘুমুতে না দেখলে নিশ্চিন্তে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না।

সরমার ভয় দেখে চন্দ্রগুপ্ত বলে — অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, / যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি, আজ চোখে দ্যাখে তারা ; / যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই - প্রীতি নেই - করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। / যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি / এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় / মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা / শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।*

সরমা সেই মুহূর্তে তাকে থামিয়ে দেবার জন্য বলল : কী ভীষণ অন্ধকার বাইরে। এর মধ্যে তোর কথাগুলো আর্তনাদের মতো আমার কান ভরে থাকে। আমি সইতে পারি না। তুই চুপ কর বাবা।

হঠাৎ মা ডাকে চমকে তাকায় সরমা। ভৃত্য রামদীনকে দেখে বুকখানা তার ধড়াস করে ওঠে। অপরাধীর মতো হাতজোড় করে করুণ চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ চলে গেছে। বসার ঘরে সেই থেকে বসে আছে। নিজের চিন্তায় এত গভীর মগ্ন ছিল যে জানতে পারেনি একা একা নিজের মনের সঙ্গে কথা বলছে। উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে রামদীনকে ধমকে বলল : অমন করে ডাকার কী আছে ?

হাত কচলাতে কচলাতে রামদীন অপরাধীর মতো সবিনয়ে বলল : মা, দাদাবাবু চলে গেছেন।

তোকে বলল কে ?

* জীবনানন্দ দাশ — অদ্ভুত আঁধার।

একজন লোক এসে খবরটা দিয়েছে।

আর কিছু বলেছে ?

দাদাবাবু এখানে আর আসবে না।

সরমার বুক ফুঁড়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : লড়াই তা-হলে শুরু হলো। শাবাশ বেটা, শাবাশ !

রামদীন বলল : মা, তুমি খুশি হয়েছ। বুক ভেঙে যাচ্ছে না। কিসের লড়াই লাগল ?

মেরুদণ্ডের লড়াই

সে আবার কী রকম লড়াই ?

মেরুদণ্ড যাদের আছে, আর যাদের নেই — এ হলো তাদের মধ্যে লড়াই।

রামদীন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সরমার দিকে। কিছুক্ষণ পরে মুখ থেকে তার একটা আওয়াজ বেরোল — অঃ।

॥ ষোল ॥

অনেক রাত পর্যন্ত বসে মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নিল, চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে এবং সরমার প্রশ্রয়ে সোনার লঙ্কায় বিভীষণের শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস যারা দেখাচ্ছে, পিঁপড়ের মতো পায়ের নিচে পিষে ফেলে তাদের মারতে হবে। কোনো করুণা করা চলবে না। চন্দ্রকান্তর এই প্রস্তাব সকলে একবাক্যে সমর্থন করল।

শিল্পকান্ত পাল্টা প্রস্তাব করল, দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে ; তাতে আইন-শৃঙ্খলা, দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর ব্যয়বরাদ্দ চতুর্গুণ করা উচিত। সেই সঙ্গে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত পরিষদ গ্রহণ করল। আরো স্থির হলো চন্দ্রগুপ্তকে তার নিজের অস্ত্রে পরাজিত করা এবং তাকে অকেজো করার কূটকৌশল — এক বাক্যে সবাই মেনে নিল।

চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা এবং বিষাদে বিভীষণের মন ভারাক্রান্ত ছিল তা আস্তে আস্তে কেটে গেল। মনেতে প্রফুল্লভাব জাগল। শরীরও চাঙ্গা হলো। দু'চোখে কৌতুকময় হাসি। আসন্ন সংঘাতে বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতেই শিল্পকান্তর প্রস্তাবকে বাহবা দিতে বিভীষণ বলল : চমৎকার ! তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই তো কিছু ?

শিল্পকান্তর অধরে প্রত্যয় তৃপ্তি হাসি। বলল : না। রাজনীতিই পরম বল। যারা আমাদের সরাতে চাইছে তারা জানে না তাদের দুর্বল করার কত রকমের ছল আমাদের হাতে আছে। আমরা তাদের দুর্বলতা নিয়ে খেলব এবং তাদের উপর আমরণ রাজত্ব করব। এটাই তো আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। মুখে বলব তাদের ভালো করব, মঙ্গল করব। দেশের শাসক বলেই তাদের কুশলে রাজার কুশল। এসব কথা

বললে তারা বিভ্রান্ত হবে। তখন জনতা এবং চন্দ্রগুপ্ত দুজনকে দুজনের বিরুদ্ধে খেলিয়ে দুজনকেই দুর্বল করা হবে আমাদের রাজনীতি।

একটা মধুর আবেগের সুগন্ধে বিভীষণের বুক ভরে গেল। তাই দিলখুশ করা হাসি হাসল উচ্চকণ্ঠে। বলল : চমৎকার। লঙ্কার ইতিহাসে তুমি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু তুমি যেমন ভাবছ তেমনটা হবে তো? আসলে অনেক বাঁক আর বাঁধা পেরিয়ে ঝরনা সাগরে পৌঁছায়। সব ঝরনা সাগর পর্যন্ত পৌঁছয় না, পথেই হারিয়ে যায়। তাই আমার ভয়, কোথায় কোন অপূর্ণতার ফাঁক লুকানো আছে কে জানে? সব তো চোখে দেখা যায় না, আগে থেকে আন্দাজ করাও যায় না। তবু একটা ছক তৈরি করে এগোতে হয়। সেই পথটা যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় কোথাও ; তখন করবে কী?

চন্দ্রকান্ত বলল : কোনো কিছুর জন্য কোনো কিছু আটকে থাকে না। চলাটাই ধর্ম। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠে। ওসব নিয়ে অকারণ সংশয় পোষণ করে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না।

সব বুঝি। তবু মন মানে না। চন্দ্রগুপ্তই এখন আমার দিনের দুশ্চিন্তা, রাতের দুঃস্বপ্ন। এক ভয়ঙ্কর স্নায়যুদ্ধে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। রাতে ঘুমুতে পারি না। ঘুমের মধ্যে কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলে, চন্দ্রগুপ্ত একজন নয়। লক্ষ লক্ষ চন্দ্রগুপ্ত জন্মেছে এই দেশের মাটিতে। এক চন্দ্রগুপ্ত গেলে অন্য চন্দ্রগুপ্ত তার জায়গা নেবে। কটা চন্দ্রগুপ্ত বধ করবে তুমি? চন্দ্রগুপ্তর এক ফোঁটা রক্ত থেকে হাজার হাজার চন্দ্রগুপ্ত জন্ম নেবে। তুমি ক'জনকে মারবে? এই কারণে ভাবনা হয়। একটা বড় বিপদের আশঙ্কায় ভেতরটা পাগল পাগল লাগে। স্বস্তি পাই না। ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়। অযোধ্যায় বিদ্রোহী শম্বুক একদিন শ্রীরামের ঘুম, সুখ, শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। রাম ও ভীত হয়ে প্রশ্ন করত : এই বিদ্রোহের শেষ কোথায়? শম্বুকের উৎপাত শেষ হবে করে? বিধাতা তার গলায় আহ্বানের শক্তি দিয়েছে। তাই একজন সাধারণ অনুচরও রামের মুখের উপর অনায়াসে বলে* বিধাতার সুখের রাজ্য ভেঙে শ্মশান করে যারা রামরাজ্য গড়ল, তারা পেল অনেক। তাদের ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি উপছে পড়ল। তাতে আমাদের ঈর্ষা নেই। কিন্তু আমরা জায়গা, জমি, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করতে পারলাম না কেন? রামরাজ্য হলো বড়লোকদের রাজ্য, সুবিধাবাদীদের স্বর্গরাজ্য, তোষামোদকারীদের সোনার দেশ। যাদের শ্রমে এরাজ্যের সমৃদ্ধি ; তারা কেউ নয়। কুকুরের মতো দিন কাটে। এই অবস্থার জন্য মহারাজ নিজে দায়ী। আমাদের দুর্ভাগ্য মহারাজের তৈরি।

জানেন, পারিষদবর্গ রাগে অপমানে রামচন্দ্রর ভেতরটা অসহ্য উত্তাপে পুড়ে

* মৎ-লিখিত রাজা রাম দ্রষ্টব্য।

যাচ্ছিল। এক সময় অধৈর্য হয়ে গনগনে গলায় বলল : তোমার মতো একটা ইঁদুরকে বধ করতে পারলে বুকের জ্বালা জুড়াতো। শম্বুকের স্পর্ধার একটা জবাব দেওয়া হতো।

আশ্চর্য লোকটা হাসিহাসি মুখ করে বলল : মহারাজ মরেই তো আছি। নতুন করে আমার মরবার ভয় নেই। মরতে পারলে দেহধারণের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু আপনার গৌরব বাড়বে না বলেই হত্যা করতে পারবেন না। আপনার অপরাধ তাতে ঢাকা পড়বে না শম্বুকের গায়েও এই মৃত্যুর আঁচ লাগবে না। বরং মানুষের বুকে নতুন করে আগুন জ্বালানো হবে। অরণ্যকেশরী শম্বুক আজ জাগ্রত। দিকে দিকে তার কেশর ফোলানো হুংকার। বনের মানুষ তার পিছন পিছন দৌড়চ্ছে। কেউ আর ঘরে বসে নেই। মহারাজ, কালের ঘণ্টা বাজছে। আমার মতো সামান্য মানুষের মৃত্যুতে কালের ঘণ্টা বাজা বন্ধ হবে না। ঢোক গিলে বিভীষণ বলল : ঘুমের মধ্যে আমিও ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই। স্বপ্নে শম্বুক চন্দ্রগুপ্ত হয়ে খিল খিল করে হাসতে থাকে।

পারিষদবর্গ চুপ করে শুনল। সবাই নরদেহে এক পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ। কিন্তু কথাগুলো তাদের বুক তোলপাড় করল। হতবুদ্ধির মতো সবাই চেয়ে আছে বিভীষণের দিকে। মনে হচ্ছে, তাদের হৃৎপিণ্ড নেই, মন নেই, বোধ শক্তি নেই।

বিরক্তিতে চন্দ্রগুপ্তর ভুরু কুঁচকে গেল। তবু বলার মতো সেইমুহূর্তে কোনো কথা খুঁজে পেল না।

শিল্পকান্তকে সেনাবাহিনী ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব অর্পণ করল বিভীষণ। নগর রক্ষার ভারও তার উপর ন্যস্ত করা হলো। শিল্পকান্ত অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত দেহরক্ষী দেওয়া হলো। এরা যে কোন অতর্কিত আক্রমণ দ্রুত মোকাবিলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রত্যেক মন্ত্রীর বাসগৃহও সুরক্ষার জন্য রক্ষী নিযুক্ত করা হলো। নিরাপত্তাকে নিশ্ছিদ্র করার জন্য যা যা করা দরকার শিল্পকান্ত খুব দ্রুত অতি উত্তমরূপে তা সম্পন্ন করল।

নগরে কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। তবু গুপ্তচরেরা লোকের অসন্তোষের কথা তাদের ভাষাতে শিল্পাকান্তকে বলল। নিরাপত্তার নামে সর্বত্র সৈন্য মোতায়েন করে অহেতু সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির সার্থকতা কী? জনগণকে সন্ত্রস্ত রাখাই কি রাজনীতি? একটা স্নায়ুচাপের মধ্যে তাদের এভাবে রাখা হচ্ছে কেন? কোথাও যুদ্ধ নেই, তবু রাজ্য জুড়ে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চলেছে। এ প্রস্তুতি কার বিরুদ্ধে? সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপভূমির চারপাশ নিরাপদ। আশপাশে কোনো প্রতিবেশী রাজ্য নেই। দেশে বিদ্রোহ নেই, তবু বিদ্রোহ দমনের নামে, অশান্তির নামে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে

দেশের মানুষের উপর কড়া পাহারা রেখে প্রশাসন কার্যত গোটা দেশবাসীর বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। জনতার দেশপ্রেমের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। আগাম সতর্কতা হিসেবে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরার উপরেও নানারকম নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করে প্রকৃতপক্ষে জনগণের সম্মান ও মর্যাদাকে অপমান করছে। হঠাৎ এমন কী হলো যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ক্ষুণ্ণ করা একান্ত জরুরি হলো। এই অস্থিরতা কার সৃষ্টি? কী উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভয়ের শিকড় চাড়িয়ে যাচ্ছে। কার ভয়? কিসের ভয়? বাইরে এই ভয় ও আতঙ্কের কোনো পরিবেশ নেই। তবু প্রশাসন অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

শিল্পকান্ত সব শুনল। কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিল না। বরং, চন্দ্রগুপ্ত কিছু করার আগেই একটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরে সে খুশি। তাতে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একটু ব্যাহত হলেও জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার স্বার্থে এটুকু অসুবিধে তাদের মেনে নিতে হবে। অযোধ্যার মতো সোনার লঙ্কাতে আর একটা শম্বুক যাতে না হয় তার প্রতি শিল্পকান্তর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চন্দ্রগুপ্তর প্রতি জনগণকে বিরূপ করাই তার উদ্দেশ্য। জনগণের দুর্দশা এবং দুর্ভোগের জন্য তাকে দায়ী করাই শিল্পকান্তর উদ্দেশ্য।

নগরপাল সম্পাতি কিন্তু শিল্পকান্তের কার্যকলাপে মোটেই খুশি নয়। নাগরিকদের অসুবিধের সব ঝক্কি তাকেই সামলাতে হয়। চারদিকে নানারকম প্রতিবাদ হচ্ছে, মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বাধ্য হয়েই সম্পাতিকে কথাটা রাজসভায় উত্থাপন করতে হলো। ভাবলেশহীন গলায় শিল্পকান্তর দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল । বলল: নগরের নিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলার নামে যা করা হচ্ছে তাতে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। মানুষ মনে মনে গজরাচ্ছে। চাপা প্রতিবাদে ফুঁসছে। অবস্থা আয়ত্তে থাকতে থাকতে আমাদের নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। এভাবে চলতে থাকলে, জনগণ রাজশক্তির বিপক্ষে চলে যাবে। তাতে চন্দ্রগুপ্তের হাত শক্ত হবে। প্রশাসনের ভুল সিদ্ধান্তেই শম্বুক চন্দ্রগুপ্তদের মতো বিদ্রোহীদের বুকে সাহস ও শক্তি যোগায়। যে মানুষ বা রাজা নিজের ও সাম্রাজ্যের দুঃখ, দুর্দশা প্রতিকার করতে না শেখে তাকে সর্বনাশ থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। রাজন, আমরা মানুষের বুকে শুধু আগুন জ্বালাচ্ছি, চন্দ্রগুপ্ত হলো আগুন জ্বালানোর মশাল। সব মানুষের হাতে আমরা সেই মশাল তুলে দিচ্ছি।

বিভীষণ স্তম্ভিত। হতচকিত বিস্ময়ে শিল্পকান্তর মুখের দিকে অসহায়ের মতো তাকায়। ঘুমন্ত মানুষ যেমন ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ আশ্রয়হীন, অসহায় এবং বিপন্ন হয়ে পড়ে, আত্মরক্ষার জন্য পাগল হয়ে ওঠে, বিভীষণেরও অবস্থা তেমন হলো। সম্পাতির কথাগুলো তাকে উদ্বিগ্ন করল।

শিল্পকান্ত বিরক্ত হয়ে বলল: এসব কথা আপনি জানলেন কেমন করে?

জানার জন্যে চরেরা আছে। আমিও ছদ্মবেশে সাধরণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাচাই করে নিই ঘটনার সত্যাসত্য। নাগরিকদের মানসিক সংকটের রন্ধ্র পথ ধরে আক্রোশ বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিরক্তির যে কোনো দিন বিস্ফোরণ হতে পারে এই সোনার লঙ্কায়। একদিন রোষের আগুনে আপনার নিরাপত্তার বেষ্টনী ধসে পড়বে। এই নিরাপত্তা লঙ্কা বাঁচানোর পথ নয়। এ হলো লঙ্কা ধ্বংস হওয়ার পথ। রাজন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মহামান্য শিল্পকান্ত সেনা মোতায়েন করে রাজ্যের অভ্যন্তরে, মানুষের মনের অভ্যন্তরে সংকটের ও সংঘাতের যে বীজ বপন করে চলেছেন নিঃশব্দে তাতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। চন্দ্রগুপ্ত হয়তো সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। আমাদের ভুলেই একদিন অজ্ঞাতবাসের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে সে। সেদিন তার আত্মপ্রকাশ ঠেকানো যাবে না। অসংখ্যনক্ষত্র শোভিত নীল আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বীরোচিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কালপুরুষ হাতে ধনু, কটিতে অসি নিয়ে গোটা আকাশকে শাসন করছে, তেমনি আমাদের ভুলেই চন্দ্রগুপ্ত জনতার প্রতিনিধি হয়ে, হৃদয়ের রাজা হয়ে এই লঙ্কানগরী দাপিয়ে বেড়াবে। সুতরাং আমাদের স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য নীতির পুনর্বিবেচনা চাই। কোথাও একটা ফাঁক আছে; তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

ভিতরের এক অসহ্য উত্তেজনায় শিল্পকান্তকে ভীষণ অশান্ত এবং অস্থির দেখাল। ভুরু কুঁচকে গেলে বিরক্তিতে। উষ্মা প্রকাশ করে বলল : অভিযোগ দিয়ে একটা সামান্য ব্যাপারও মানুষকে আপ্লুত করতে পারে। রাজ্য চালাতে গেলে রাজকীয় মহিমাকে বড় করে তুলতে হবে। নাগরিকরা খুবই সাধারণ। রাজ্যশাসন এবং রাজনীতির কিছুই বোঝে না। তারা কী চায়, কাকে চায়, কেন চায় তাও ভালো করে বিচার করতে পারে না। তাদের যেমন বোঝানো হয়, তেমনি বোঝে। আপনার মনগড়া দুর্ভবনা, উদ্বেগ, কল্পনাবিলাসের সত্যি কোনো মানে হয় না। রামচন্দ্র শম্বুকের রাজদ্রোহ প্রশ্রয় দেয়নি। যখন সে রাজধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, তখনই তার মূলোৎপাটন করার জন্য অস্ত্র ধরছে। রাজদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু। জনতা চাক আর না চাক রাজা যে কোনো মূল্যে রাজত্ব করবেই। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর কোনো জায়গা নেই। রাজাও তাঁর কার্যের জন্য জনতার কাছে দায়বদ্ধ। কোনো কিছুর ভয়ে কিংবা আশঙ্কার তাঁর কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া শোভা পায় না।

সম্পাতি এক বুক অপমানের গ্লানি নিয়ে চুপ করে গেল। আর বিভীষণ অধরে হাসি, চোখে কৌতুক নিয়ে করুণাঘন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল। একটা অস্বস্তি সম্পাতিকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল : রাজন! আমরা জেগে ঘুমোচ্ছি। আমরা প্রজাদের অভিযোগ, অনুযোগ আছে জেনেও তার কথা শুনতে চাই না। এই দোষ এবং অপরাধের মূল্য একদিন আমাদের দিতে হবে। মহামান্য শিল্পকান্তর কথা শুনতে গেলে বলতে হয় রাজা মানুষ নয়, পাথর। তার

প্রাণ নেই, বিবেক নেই, মনুষ্যত্ব নেই, মানবিকতা নেই। সে কী একটি যন্ত্র। তীব্রও গভীর বিষণ্নতা সম্পাতির গলার স্বরে বেজে উঠল।

বিভীষণের হঠাৎ কী হলো কে জানে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সম্পাতি, এখন সবাইকে নিয়ে আমরা। একথাটা কেন বোঝ না; আজ আমি বড় ভগ্নহৃদয়, বড় যন্ত্রণাবিদ্ধ। আমার মতো রিক্ত কে আছে? তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। এখন আমরা কেউ একলা চলতে পারি না। সময়টা বড় খারাপ।

চন্দ্রকান্ত তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল, নাগরিকদের অসন্তোষের গায়ে কুলোর বাতাস দিয়ে বিভীষণের রাজশক্তির ওপর বড় ধরনের ধাক্কা দেওয়ার এটাই হলো শ্রেষ্ঠ সময়।

নৃপতি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করায় বিভীষণ সকলের কাছে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। জনতা যে তার উপর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ এবং তার প্রতি যে কোনো আনুগত্য নেই এটা জানান দেওয়ার জন্য তাদের ছোটখাট প্রতিক্রিয়া মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেলে রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন এক আভ্যন্তরীণ সংকটের সূচনা করবে। তখন দায়বদ্ধতার দোষ এড়ানোর জন্য একে অন্যের ওপর দোষারোপ করে এক অর্ন্তঘাতী অন্তর্ঘাতি অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হবে। লড়াই বাধবে সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর। এই আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ একবার শুরু হলে আর নিস্তার নেই। পালিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। এ এক নতুন লড়াই। এ লড়াই ক্ষমতার নয়, নিজের স্বার্থ এবং অস্তিত্বকে নিরাপদ করার।

বিভীষণ নিজেই ইতিহাসের হাতে বন্দী। ভয়ঙ্কর এক মানসিক সংকটের মধ্যে তার দিনগুলো কাটতে লাগল। রাজনৈতিক অস্থিরতা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। প্রতিমুহূর্ত মনে হয় শিল্পকান্তের জালে ধরা পড়েছে সে। এখন তার আর নিষ্ক্রমণের পথ খোলা নেই। নিজের হাতেই একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। একা থাকলেই মনের সঙ্গে তার কথা হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করে আর নিজেই তার উত্তর দেয়।

শিল্পকান্তকে তুমি কতটুকু চেন বিভীষণ? এতদিন তারা কোথায় ছিল?

কোনো মানুষকে কেউ পুরোপুরি চিনতে পারে না। আমি নিজেকেই কি ভালো করে চিনি? যে মানুষ নিজের কাছে অনাবিষ্কৃত সে অন্যাকে পুরোপুরি চেনে, একথা বলতে পারে কখনও? যতটুকু তাকে চিনি, তাতেই চলবে আমার কাজ। লোকটা রাজনীতির কেউ নয় ঠিক। কিন্তু রাজনীতি বোঝে। কারণ সে বুদ্ধিমান, চতুর বিচক্ষণ।

এবং অহঙ্কারী।

অহঙ্কার একটু থাকা ভালো। যোগ্যতা এবং কর্মের সাফল্য মানুষকে অহঙ্কারী করে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলেই ভয় হয়।

তাতে ক্ষতি কী?

তাতে তার পতন ঘটতে পারে। কতকগুলো শকুনের কাছে তোমার সোনার লঙ্কাকে জিম্মা রেখেছ। এ অচেনার মূল্য তো তোমাকে দিতে হবে বিভীষণ।

তাকে আমি দোষ দিই না। আসলে তাকে না হলে আমারও চলছিল না। ইতিহাসের কাছে তাকে দায়ী করাই আমার অভিপ্রায়।

হ্যাঁ, তোমার ঐ মুখোশের আড়ালে ধনতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র যে হাত ধরাধরি করে চলেছে; রাজশক্তির সঙ্গে বাণিজ্যিক শক্তির জটিল মৈত্রী সম্পর্ক যে রাজশক্তির হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ধনতন্ত্র যে নিজের স্বার্থে রাজশক্তি এবং জনশক্তিকে কব্জা করে এক বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছে, রাজনীতির যে মেরু বদল হচ্ছে নিঃশব্দে আগামী প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করার এই কৌশল প্রশংসার যোগ্য। নাগরিকরা বুঝতে পারছে না, বাণিজ্যিক শক্তি কী করে দেশটাকে গিলে খাচ্ছে। চটজলদি সাবধান না হলে একদিন সব যাবে প্লাবনে ভেসে। ছোট স্বার্থের পেছনে ছুটছে সবাই, ভয় পাচ্ছে সাহস নিয়ে বড় কিছু করতে। তাই তাদের আয়ু যাতে বাড়ে এবং তুমিও অমর হও তার ব্যবস্থা করতে শিল্পকান্তকে রাজনীতিতে এনে ভালো করেছ।

একথা কেন বললে।

আমি বহুকাল থেকে তোমাকে দেখে আসছি। আমার চেয়ে তোমাকে বেশি চেনে কে? হঠাৎই বিভীষণ নিজের মনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই নিরুচ্চারে বলল: যত সব আজে বাজে ভাবনা। মাথায় আসেও বটে!

শিল্পকান্ত সৈন্যের টহল আরো জোরদার করল। অশ্বারোহী নজরদার বাহিনীর দৃষ্টি সর্বত্র সজাগ। এত পাহারার ভেতরে চন্দ্রগুপ্তর অতর্কিত চোরা গোপ্তাহানা কিছুতে এড়াতে পারা গেল না। ঝটিকার মতো হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর। এত তীব্র ও ক্ষিপ্র আক্রমণ তাদের যে মোকাবিলার আগেই বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটিয়ে দ্রুত সরে পড়ে তারা। কখন কীভাবে কী ধরণের আক্রমণ হতে পারে নজরদার বাহিনী আগে থেকে আঁচ পর্যন্ত করতে পারে না। যতদিন যেতে লাগল সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ল। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তারা কাজ ছেড়ে পালাতে লাগল। বিত্তবান নাগরিকরা নিজেদের খুব অসহায় এবং বিপন্নবোধ করতে লাগল। শিল্পকান্ত তার ব্যর্থতা ঢাকতে আরো একগুঁয়ে হয়ে উঠল। চন্দ্রগুপ্তর প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধের ইন্ধন দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের উপর নানারকম নির্যাতন সুরু করল। কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা হয়ে চন্দ্রগুপ্ত একের পর এক অত্যাচারী কোতোয়াল এবং তাদের কর্মীদের বেছে বেছে হত্যা করতে লাগল। শিল্পকান্ত ভীষণ বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করতে লাগল। নিজেই মৃত্যুর আতঙ্কে ভুগতে লাগল। চন্দ্রগুপ্তর লোকজন কখন বুক ফুটো করে

দেবে বিষাক্ত তীর দিয়ে তার ভাবনায় নির্ঘুম রাত কাটাতে হয় তাকে। আজও বারান্দায় রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। শিল্পকান্তর স্ত্রী শিল্পা এসে দাঁড়াল তার পাশে। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে শিল্পকান্ত এই নাম দিয়েছিল তাকে। শিল্পার ভীত সন্ত্রস্ত মুখখানি তাকে বিচলিত করে। শিল্পা এইসব ঘটনায় পুরোপুরি বিপর্যস্ত। চোখে জল। চোখে জল দেখলে শিল্পকান্ত রেগে যায়। অসহিষ্ণু হয়ে বলল : তুমি এমন কান্নাকাটি করলে আমি কী করি বল তো ? তুমি আমাকে একা চলতে দাও। বাধা তৈরি কর না।

কাঁদ কাঁদ গলায় বলল : সাত রাজার ধন, ঐশ্বর্য তোমার। রাজক্ষমতা তোমার হাতে। তুমি চাইলে গোটা রাজ্যটাকে ধ্বংস করতে পার। এত ক্ষমতা সম্পদ নিয়ে আমরা কয়েকজন দুর্বৃত্তের হাতে অসহায়ের মতো খুন হয়ে যাব। ভুরু কুঁচকে গেল শিল্পকান্তর। বিস্মিত গলায় বলল : খুন ! খুন হয়ে মরবার জন্য আমি আসিনি। ইন্দ্রের অমরত্ব নিয়ে এই পৃথিবীকে ভোগ করব বলে এসেছি। তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

এত রাতে আমার সঙ্গে এই মিথ্যে কথাগুলো বলে তুমি কী একটু স্বস্তি বোধ করছ ?

তুমি ঘুমুতে যাও শিল্পা।

তোমার মতো আমারও ঘুম আসে না। তোমার বুকের ভয় আমার বুকে জমে বরফ হয়ে গেছে। তুমি বোঝ না ? তোমাকে ঘুমুতে না দেখলে, আমার ঘুম আসে না।

শিল্পা, এই নগরে আমার আর ঘুম আসবে না। সারা জীবন শুধু জয় করেছি। যা চেয়েছি হাত ভরে পেয়েছি। কিন্তু এভাবে হারিনি কখনও। আমি তো চন্দ্রগুপ্তকে হারাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে না হেরে গিয়েও বুঝিয়ে দিল আমাকে হারানো তার কত সহজ ! এমন করে নিজের হারের কথা আগে ভাবিনি। আমি যে হেরে যেতে পারি কিংবা আমাকে হারিয়ে দেওয়ার মানুষ আছে, এই বোধটাই আমার ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, আমার সব জানা অভ্রান্ত নয়। আমার অহঙ্কার নিয়ে আমাকে পস্তাতে হচ্ছে শিল্পা।

কান্না এবং সমবেদনার মাঝামাঝি একরকমের অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে শিল্পা মাথা রাখল শিল্পকান্তর বুকের উপর। শিল্পকান্তর এই স্পর্শ বড় ভালো লাগে। শিল্পা গাঢ় গলায় বলল : নিজের কাজের জন্য কোনোদিন অনুশোচনা করনি। আজ অনুশোচনা করবে কেন ? তুমি তো খারাপ কিছু করোনি। একজন মানুষ জেতার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য যা করে, রাজাদেশে তুমি তাই করেছ। এতে তোমার হার-জিতের কী আছে ? হার-জিত যাই হোক তার সব দোষ-কৃতিত্ব তো মহারাজ বিভীষণের। তুমি ভাববে কেন ? সত্যি যদি দুর্বৃত্তেরা জয়ী হয় তা হলে লোকে বলবে হারল বিভীষণ। কেউ

বলবে না আমার শিল্পকান্ত হেরেছে। তুমি অত ভাবছ কেন?

শিল্পা, এই হার-জিতের বোধটা সত্যিই গোলমেলে। আমি নিজে থেকে যেচে তাকে জব্দ করার দায়িত্ব নিয়েছি। তাই, এ আমার মর্যদার লড়াই। আমি হয়তো ওকে হারিয়ে দেব, হারিয়ে দিতে পারব। ওকে আমি জিততে দেব না। জয়টা তাস খেলার মতো। টেক্কা রয়েছে আমার হাতে। তুরুপের তাস ফেলে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে জয় ছিনিয়ে নেব। আনাচে-কানাচে মাদক দ্রব্যের দোকান করতে দিয়েছি। নামমাত্র মূল্যে মানুষকে তারা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন নেশাটা জমে উঠার অপেক্ষায় শুধু।

কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে শিল্পা বলল: নেশাটা বোধ হয় জমাতে পারলে না। মদের দোকানিদের ধরে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তেরা। পায়ে দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে শাস্তি দিয়েছে।

শিল্পকান্ত একটুও আশ্চর্য হলো না। কাঁদতে ইচ্ছে করে তার। বলল: একটা নেংটি ইঁদুরের এত ক্ষমতা! আমি ওকে হারিয়ে দিতে পারি না শিল্পা? হেরে যাওয়ার এই আত্মগ্লানিটা যে কী ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক তোমাকে বোঝাতে পারব না। একজন সফল মানুষের হেরে যাওয়াটা বড় কষ্ট গো। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

নির্জন অন্ধকারে এভাবে বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের যে অনেক বিপদ। শিল্পকান্ত সম্মোহিতের মতো শিল্পার কোমর জড়িয়ে ধরল। শিল্পাও তার কোমর পেঁচিয়ে ধরল। দুজনের দুটি হাত কোমর জড়িয়ে ধরে প্রকাশ করে তাদের গাঢ় নিরুচ্চার ভালোবাসা। সমর্পণের নীরব স্বীকৃতিতে তাদের দু'জনের ভেতরটা ভরে উঠল এক অপ্রাপ্ত সুখের আনন্দে।

ভোরের আলো ফুটেছে। আঁধারের ঘোর ঘোর ভাবটা দূর হয়েছে সবে। গোটা আকাশখানা লাল হয়ে উঠেছে। সূর্যোদয় হতে তখনও দেরি কিছু। কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে বকের পাল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গের যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল যেন আকাশখানা। বড় যন্ত্রণা। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড়ই যন্ত্রণার।

সেই সন্ধি মুহূর্তে ভূতের ছায়ার মতো কালো মানুষ জমা হতে লাগল শিল্পকান্তর মরকতকুঞ্জের চারধারে। দলে দলে আসতে লাগল মানুষ। কোথা থেকে কোন পথে এত লোক আসছে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছিল, কাতারে কাতারে মানুষ আসছে পঙ্গপালের মতো। রসাতলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে যেমন বিপুল জলরাশি দশ বারো হাত উঁচু হয়ে ছুটে এসেছিল জনপদের দিকে তেমনি দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের মতো শিল্পকান্তের স্বপ্নের পুরী মরকতকুঞ্জের দিকে নিঃশব্দে ধেয়ে গেল। এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে মুক্ত অসি, পিছনে যারা ছিল তারা তীর-ধনুতে সজ্জিত।

ক্ষিপ্ত জনতার বুকে জমে থাকা ক্রোধ, আক্রোশ; গর্জন মুখর সমুদ্রের মতো তাদের বুকে কল্লোলিত হতে লাগল। বহুদূর থেকে সমুদ্র নির্ঘোষের মতো সে শব্দ মরকতকুঞ্জের উপর আছড়ে পড়ে সকলকে জাগিয়ে দিল। জনতার মুখে একটাই কথা—দেশ কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। যা খুশি, যেভাবে খুশি ইচ্ছেমাফিক একে ব্যবহার করা যায় না। জনগণের ইচ্ছে-অনিচ্ছেরও একটা দাম আছে। একতরফা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শিল্পকান্ত, চন্দ্রকান্ত, কিংবা বিভীষণের মতো স্বেচ্ছাচারী, অযোগ্য, অপদার্থ শাসকের অপশাসন থেকে নিষ্কৃতি চাই। জনগণই দেশের শেষ কথা। একথা জানান দিতে আমরা মারব, না হলে মরব।

মরকতকুঞ্জ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এল তাদের দিকে। দু'একজনের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যন্ত্রণায় হাত-পা খিঁচতে থাকে। কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। অন্য একজন লাফিয়ে এসে তার জায়গা দখল করে নিল। অটল সংকল্পে তারা এগোতে লাগল। পশ্চাতের তীরন্দাজ বাহিনীর তীরে আকাশ ছেয়ে গেল। মাথার উপর মুহূর্তে তীরের ছাতা মেলে ধরল যেন। সব তীর পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে মরকতকুঞ্জের দিকে। অগ্রবর্তি বাহিনী দৌড়ে গিয়ে দখল নিল মরকতকুঞ্জের। প্রহরীদের সঙ্গে একটা লড়াই হলো। হাজার হাজার মানুষের ভেতর ওরা মাত্র কয়জন। ওদের সামনে তৈরি হলো মানব-দেয়াল। সেই দেয়াল ভেঙে শিল্পকান্ত চন্দ্রকান্তকে নিরাপদ করছিল। তাদের সাধ্যের বাইরে। তবু কিছু বিশ্বস্ত কর্তব্যপরায়ণ প্রহরী বাধা দিল। খুব অল্পেই ঘায়েল হয়ে তারা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো অন্যেরা অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করল। আক্রমণকারী জনতার মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলল: ওদের অস্ত্রগুলো ফেলে দিও না, সংগ্রহ করেও রেখ না। ওদের অস্ত্র দিয়ে ওদের মার।

অন্য একজন বলল: ঠিক বলেছ ভায়া। অস্ত্রের অপচয় বন্ধ হবে তাতে।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলল: ঐ অস্ত্র দিয়ে তো আমাদের সঙ্গে ওরা বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অস্ত্রত্যাগ করায় প্রহরীদের সঙ্গে আমাদের আর কোন বিবাদ এবং বিভেদ থাকল না। প্রহরীর হাতের অস্ত্র দিয়ে ওদের আমরা হত্যা করব। শিল্পকান্ত, চন্দ্রকান্ত মিলে জনগণ ও নগরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড চালিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। আমরা তার প্রতিকার চাই।

শত শত কণ্ঠে তখন বণিকভ্রাতা এবং বিভীষণ সম্পর্কে নানা কটূক্তি। কে কী বলছে কোলাহলের মধ্যে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সবাই বলতে ব্যস্ত, কেউ শুনছে না। বিশাল প্রাসাদের ভেতর জনতা ঢুকতে থাকে। ঢুকতেই থাকে। কোন বাধা নেই। বিলাসবহুল ঘর আর সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্তর দেখে তারা থ হয়ে যায়। সেগুলো ছুঁতেও ঘৃণা হলো। বঞ্চনার অপমান, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা দুর্জয় আক্রোশে মহাবল দানবের মতো তাদের ভয়ঙ্কর হিংস্র করে তুলল। ভেঙে তছনছ করল সব। দামী সুন্দর পর্দাগুলো

ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন করল।

নিশ্ছিদ্র গুপ্তকক্ষেও শত শত পদধ্বনি ভয়াবহ হতে পারে বণিক ভ্রাতাদ্বয়ের জানা ছিল না। এই প্রথম উপলব্ধি করল। মৃত্যুভয় কী দুঃসহ আতঙ্কজনক। শিল্পা শিল্পকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে : ও কীসের শব্দ ?

শিল্পকান্ত ফ্যাসফেসে গলায় বলল : মৃত্যুর ঘন্টা বাজছে।

শিল্পা আঁৎকে উঠে বলল : মৃত্যু এখানেও হানা দিতে পারে ?

চন্দ্রকান্ত বলল : আমরা তো ভাবিনি কোনদিন আমাদের মৃত্যু হবে।

চন্দ্রকান্তের কন্যা উপমা ভয়ে ভয়ে জিঞ্জেস করল : মৃত্যু কেমন বাবা ?

জানি না। বোধ হয় দুঃসহ কষ্টের আর যন্ত্রণার বলেই সব প্রাণী মরতে ভয় পায়।

শিল্পা হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল : আমি মরতে চাই না।

চন্দ্রকান্ত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : চাওয়া না চাওয়া এখন আর আমাদের হাতে নেই শিল্পা। তোমার স্বামী ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে এই দক্ষ যক্ষ বাঁধিয়েছে।

উপমা মরিয়া হয়ে হাসল হঠাৎ। বলল : আমি বলছি এ শব্দটি মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি নয়। ও হাজার মানুষের পদধ্বনি।

শিল্পকান্ত বলল : মানুষের পদধ্বনির রূপ ধরে কালপুরুষ এসেছে তার হিসেব বুঝে নিতে। তাকে ফেরাবে কী দিয়ে ?

উপমার গলাটা শুকিয়ে গেছে। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল : কালপুরুষ আবার কে ?

আমাদের নিয়তি। জনতার রূপ ধরে এসেছে।

আমরা কী করলাম, যে নির্দয় মৃত্যু এসে আমাদের সকলকে ছিনিয়ে নেবে ?

শিল্পা বলল : চল, আমরা সবাই একসাথে পালিয়ে যাই।

চন্দ্রকান্ত বলল : পালানোর সব পথ বন্ধ।

আমাদের তো প্রচুর অর্থ। সব ওদের দেব। তা-হলে তো আমরা ছাড়া পাব।

শিল্পকান্ত মুহূর্তে বদলে যায়। পাগলের মতো হাসতে লাগল। দরজাটা ভাঙতে যতক্ষণ সময়। তারপর মৃত্যু এসে বাজপাখির মতো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সকলকে।

দরজাটা হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে খুলে গেল। অমনি নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত কান্না এবং আর্তনাদ শোনা গেল। দরজার মুখ আগলে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্ত। মুহূর্তে পাল্টে যায় তার চেহারা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল : বন্ধুরা তোমরা সংযত হও। এবার আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। রাজনৈতিক শত্রুকে আতঙ্কিত করতে এসে আমাদের কেউ যেন হঠকারিতা না করি।

উত্তেজিত জনতার কোলাহলে, ঠেলাঠেলিতে চন্দ্রগুপ্তর কথা কেউ শুনতে পেল না। মাঝে মাঝে ভিড়ের চাপ এমন আসতে লাগল যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হলো। দেহরক্ষীরা জনতার ধাক্কা প্রাণপ্রণ চেষ্টা করে সামলাতে লাগল। ধাক্কাধাক্কির

মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত বলল : বন্ধুগণ, তোমরা শান্ত হও। ভুলে যেও না আমাদের শত্রু শুধু শিল্পকান্ত আর চন্দ্রকান্ত। এখানকার নারী ও শিশুদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। ক্রোধের বশে, উত্তেজনার মাথায় হঠকারিতা করে আমাদের উদ্দেশ্য মসীলিপ্ত করো না। প্রতিশোধমূলক কোনো ঘটনা হলে তোমরাই নিন্দিত হবে। জনতার গণরোষের একটা বিশাল মহিমা আছে। কিন্তু তা কখনও প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝার মতো ঝড়ের তাণ্ডব শক্তি নিয়ে বীভৎস প্রলয়ঙ্কর হতে পারে না। বন্ধুগণ আমরা যারা দেশকে, জাতিকে ভালোবাসি তাদের উচিত হবে অহেতু রক্তপাত না ঘটিয়ে মানুষের আদলতে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেওয়া। শত্রুকে নির্মূল করে তার প্রভাব প্রতিপত্তির চিহ্নটুকু মুছে ফেলার কাজে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। কোনো কারণে আমরা যদি অকৃতকার্য হই তাহলে রাজদ্রোহের অপরাধে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বন্ধুগণ মরকতকুঞ্জ কিংবা চন্দ্রকান্তের শিল্পম হলো অত্যাচারের বাইরের কাঠামো। মরকতকুঞ্জ আমরা জয় করেছি। কিন্তু এই অত্যাচারের মর্মকেন্দ্র স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ বিভীষণের মসনদ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জয় সম্পূর্ণ হবে না। সেকারণ কোনরূপ হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে আমরা যেন নিজেদের বিপন্ন না করি। কোনো অজ্ঞাত কারণে বিভীষণকে যদি পর্যুদস্ত করতে না পারি, অন্তত তার গতিবেগ তো হ্রাস করতে পারব। একটা চাপের ভেতর রেখে তো সুবিধে আদায় করে নিতে পারব।

জনতা ঠাণ্ডা হয়ে চন্দ্রগুপ্তের কথাগুলো শুনল। স্বচ্ছ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চন্দ্রগুপ্ত সংঘবদ্ধ সংগ্রামী জনতার আবেগ ও অনুভূতি পরিমাপ করে হাঁক পাড়ল মহামান্য শিল্পকান্ত, চন্দ্রকান্ত আপনারা গুপ্তকক্ষের অভ্যন্তর থেকে দু'হাত মাথার উপর তুলে একে একে বেরিয়ে আসুন। চন্দ্রগুপ্তের সেই ডাকে গুপ্তকক্ষ গম গম করে উঠল। চন্দ্রগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বলল : হঠকারিতা যদি না চান্; তাহলে ধরা দিন। আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

ভেতর থেকে তারা প্রশ্ন করল : কেন ? আমাদের অপরাধ কী ?

আপনারা দেশ ও জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করছেন। দেশের মানুষ আপনাদের বিচার করবে।

আমরা আমাদের কাজের জন্য রাজার কাছে দায়ী। দেশের মানুষ কে ? বিচারের তারা কী বোঝে ?

আপনার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনার ফলভোগ করতে হয়েছে দেশের মানুষকে। দেশের মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। তারা আপনাকে নিতে এসেছে।

শিল্পকান্ত বলল : আমার কাজের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের কাছে আমি দায়ী। ঈশ্বরের করুণায় আমি রাজার কাছ থেকে দেশেরক্ষার দায়িত্ব পেয়েছি। আমি এমন কোনো

কাজ করেনি যার জন্য আমাকে অনুতাপ করতে হয়।

মাননীয় শিল্পকান্ত, কথায় কথা বাড়ে। দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। রাজার বিচারক ঈশ্বর নয়, দেশের জনগণ। এই সত্যটা স্মরণ করে আপনি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসুন। জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে তাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। তাদের হাতে ছিন্নভিন্ন হওয়ার আগে আপনারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করুন।

কক্ষের অভ্যন্তর থেকে দৌড়ে শিল্পা চন্দ্রগুপ্তের সামনে এসে দাঁড়াল। দু'হাত জোড় করে বলল : এই গৃহ, ধন, সম্পদ সব তোমরা নাও। আমাদের প্রাণে মেরো না। তুমি আমাদের দয়া কর।

চন্দ্রকান্ত হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। তরপর বিনম্র কণ্ঠে চলল : মাগো, তোমাদের যা কিছু সম্পদ, সবই দেশের এবং জাতির সম্পদ। আমরা শুধু বণিক ভ্রাতাদ্বয়কে চাই। এর কোনো বিকল্প নেই।

শিল্পা করুণ চোখে চেয়ে রইল চন্দ্রগুপ্তের দিকে। মৃদু কণ্ঠে বলল : লঙ্কার জনগণ কোনোদিন হিংস্র নয়। তারা আমাদের জানে না বলেই আমাদের ঘৃণা করে। বোধ হয় ঘৃণাই উন্মত্তার রূপ নিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত বলল : শাসনকার্যের সঙ্গে যে দুজন যুক্ত শুধু তাদের প্রতি বিদ্বেষও ঘৃণা তাদের, আপনাদের ওপরে নয়। কোনো অনর্থ ঘটার আগে তাদের ধরা দিতে বলুন। জনতাকে তাঁদের অবিশ্বাস করাটা ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। সেজন্য তাঁদের শাস্তি আরো নির্মম হবে।

শিল্পা হঠাৎ মাগো বলে মুর্ছা গেল।

চন্দ্রকান্ত এবং শিল্পকান্তকে অগত্যা বেরিয়ে আসতে হলো গুপ্ত গহ্বর থেকে। চন্দ্রগুপ্তর নিরাপত্তার বলয় গড়ার আগেই অসংখ্য মানুষের থাবা এসে পড়ল তাদের মুখের উপর। বাজপাখির মতো ছোঁ দিয়ে জনতা তুলে নিয়ে গেল তাদের। তারপর তাদের দু'জনকে নিয়ে চলল জনতার টানা হ্যাঁচড়া, ছেঁড়াছিঁড়ি। উন্মত্ত জনতা শুনল না চন্দ্রগুপ্তের আবেদন ; মানল না তার আদেশ নির্দেশ।

এই উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে একদল জনতা চন্দ্রগুপ্তর নজর এড়িয়ে গুপ্তকক্ষের মধ্যে ঢুকে গেল। বণিক পরিবারের সকলকে খুন করে যখন বেরিয়ে এল তাদের শরীরে পোশাকে রক্তের দাগ। তাদের দেখে চন্দ্রগুপ্ত শিউরে উঠল। বলল : এ তোমরা করলে কী ?

শত্রুর শেষ রাখতে নেই শত্রুকে ভুলেও ক্ষমা করতে নেই— একথা তুমি শিখিয়েছ। বেঁচে থাকলে বিষধর সাপ হয়ে ছোবল মারবে একদিন। ওদের এই সন্তানেরা পরে নেকড়ের বাচ্চার মতো হত্যা করবে আমাদের।

তবু সমস্ত অন্তঃকরণ চন্দ্রগুপ্তের রাগে দুঃখে রি রি করে উঠল। বলল : ছিঃ, ছিঃ !

লোকটি নিরাবেগ চিত্তে অবিচলিত কণ্ঠে বলল : ধিক্কার দেবার মতো কাজ করিনি। তুমি আমাদের নির্মম কথা বলতে শিখিয়েছ। আনুগত্য কিংবা শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা যতই নিষ্ঠুর সত্য এবং বাস্তবকে লুকানোর চেষ্টা করি না কেন একদিন তার মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। তাকে অগ্রাহ্য করলেও সে আছে; না করলেও আছে। শত চেষ্টা করলেও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। নিদ্রায় ভুলে থাকতে চেষ্টা করবে, দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে সে। স্বপ্নের সে বিভীষিকা জাগরণের কঠোর বাস্তবতার রূপ ধরে দেখা দেবে।

তাদের কথোপোকথনের মাঝে স্তব্ধতা নেমে এল। উভয়ের মনের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে রইল সেই স্তব্ধতা।

চন্দ্রগুপ্তের অন্য একজন সঙ্গী বলল : বন্ধু বিষণ্ণ হওয়ার মতো কোন কারণ ঘটেনি। তুমি কি মনে কর আমি তোমার বেদনার পরিমাপ করতে পারি না ? তোমার দুঃখের গভীরতা উপলব্ধি করতে অক্ষম আমি ? দেশের মানুষের ভালোর জন্য, সুখের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তোমার যে সর্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প, সে তো সমবেদনারই রূপান্তর।

প্রথম ব্যক্তি বলল : চন্দ্রগুপ্ত ওদের অবহেলায় এই নগর রক্ত এবং লাশ দিয়ে কিছুকাল আগে ওরা দুর্গন্ধ করে রেখেছিল। পচা গন্ধে আমাদেরও নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতো। ওদের পরিবারের লোকজনের জানা উচিত এই রক্ত এবং মৃত্যুর মূল্য কি ? একজন অনুগত সাথী হিসাবে তোমাকে আর কোনো কথা বলব না। আমাকে ক্ষমা কর। নিজেকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি কী চাও আমি জানি না। আমার অন্তরে তোমার কণ্ঠস্বর সবসময়ে শুনতে পাই— সেই কণ্ঠে ভালোবাসার গান আমার মন মুগ্ধ করে দেয়। কিন্তু আর এক অশুভ কণ্ঠে দুঃখের কথা, দুর্ভোগ্যের কথা, প্রতিশোধের কথা, মৃত্যুর কথা। তোমার সেই সুধাকণ্ঠ তার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। আমায় ক্ষমা করে দাও চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত নির্বাক। তাকে নীরব দেখে অন্য সঙ্গী বলল : চন্দ্রগুপ্ত পাথরের মূর্তির মতো তোমার মৌনী স্তব্ধতা আমার কাছে দুর্বিষহ। ভীষণ অপমানকর। তোমার মন যদি এত নরম হয় তা-হলে এই কঠিন কঠোর জীবন সংগ্রামের পথে হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনলে কেন ? তুমি তো জানতে এই মানুষগুলোর জীবন জুড়ে আছে নানা অত্যাচার আর নিগ্রহের কাহিনী। বঞ্চনায় জীবনটা অভিশপ্ত। যুগ যুগ ধরে ঘৃণায় তারা জর্জরিত হয়েছে। রাজা অভিজাত, জমিদার এবং বিভিন্ন সুবিধাভোগী মানুষদের বিবিধ অত্যাচার,অবিচারের কাহিনী তারা বংশ পরম্পরায় তীব্র বিষের মতো ঢেলে দিয়েছে তাদের উত্তর পুরুষের কানে। এই সব অত্যাচার অভিসম্পাতের কাহিনী শুনতে শুনতে হঠাৎ যদি তারা প্রতিহিংসার মত্তাতায়, হত্যার নেশায় উন্মাদের মতো ধেয়ে যায় তাদের চিরন্তন শত্রুর দিকে তা হলে দোষ কী ?।

মাথা তুলে তাকাল চন্দ্রগুপ্ত। উত্তেজনায় তার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। ক্রোধে লজ্জায়

মুখখানা আগুনের মতো গনগন করে, বলল : ঐ বিপুল জনতা শিল্পকান্ত চন্দ্রগুপ্তকে বাজপাখির মতো ছোঁ দিয়ে নিয়ে গিয়ে মুহূর্তে তাদের দেহটাকে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছে-এ আমি সহ্য করেছি ; মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার অনুগত সাথীদের কাছে অনুরূপ বর্বর প্রতিহিংসোন্মত্ততা তো আশা করি না।

আমরা তো ঐ বিপুল জনতার একজন। তাদের থেকে আলাদা নই। তাই এই মৃত্যুর জন্য আমাদের কোনো অনুশোচনা নেই। কারণ যারা নিহত হলো তাদের মৃত্যু অসম্মানকর কিছু হয়নি। একটা বিরাট সংগ্রামের বলি হয়েছে তারা। আমরা ভাবিনি, আমাদের নেতা এত দুর্বল। একটা মৃত্যুর শোকে ভেঙে পড়বেন। হতাশায় কষ্ট পাবেন। হায় ! আজ এ দৃশ্য দেখার জন্য কি তোমার চারপাশে এতগুলো বিদ্রোহী সংগ্রামী মানুষ জড় হয়েছে ? তোমার যদি এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়ে থাকে আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তোমার আদেশ অমান্য করেছি তা হলে সেটা আমরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মনে করব। এবং সেজন্য শাস্তি প্রার্থনা করব।

অন্য সাথী বলল : হ্যাঁ, তুমি আমাদের প্রাণ নিতে পার। মনে রেখ আমরা তোমার গোঁড়া সমর্থক। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমর বিশ্বস্ত অনুগামী, তবু তোমার মতোই আমরা দেশকে ভালোবাসি। আমাদের ছোট্ট দু'হাত দিয়ে শত্রুর করাল গ্রাস থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করব। আমাদের রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিধাতার অভিশাপ হয়ে ভেঙে পড়ুক শত্রুর মাথায়। বন্ধু শুনতে পাচ্ছ, কালের ঘণ্টাধ্বনি বাজছে জনতার কোলাহলে। ঘনিয়ে আসছে শেষ মুহূর্ত। পৃথিবীর নিদারুণ অভিশাপের যূপকাষ্ঠে আমরা সমর্পণ করেছি নিজেদের।

অনুগত সহকর্মীদের বক্তব্যে এমন একটা আবেগ ছিল যে চন্দ্রগুপ্তর সব উত্তেজনা মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার বুক কাঁপছিল ভেতরের আবেগে। সত্যিই কি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটছে ?

বিশ্বস্ত সঙ্গী বিজয় বলল : এখনো হয়নি। আর সামান্য বাকি। জনতার ঐ জয়ধ্বনি শোন : বিভীষণ তুমি দূর হও। মহারাজ বিভীষণের পতন হলেই জনতা গর্বের সঙ্গে ভাবতে পারবে জয় হলো তাদের।